BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

কবিতা
সমগ্র
সুনীল
গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতাসমগ্র

৫

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৩

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-267-2

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নব মুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি৪ সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

KABITASAMAGRA V
[Poems]
by
Sunil Gangopadhyay
Published by Ananda Publishers Private Limited
45 Beniatola Lane, Calcutta 700 009

প্রকাশকের নিবেদন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতাসমগ্র পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হল। এই খণ্ডটির পরিকল্পনাও লেখক করে গিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী এই খণ্ডে সংযোজিত হল চারটি কাব্যগ্রন্থ— 'ভালোবাসা খণ্ডকাব্য', 'বাংলা চার অক্ষর', 'যার যা হারিয়ে গেছে', 'শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডা' এবং 'প্রাণের প্রহরী' কাব্যনাটকটি। তিনটি ছড়ার বই— 'মালঞ্চমালা', 'আ চৈ আ চৈ চৈ', 'মনে পড়ে সেই দিন'। এ ছাড়া কয়েকটি ছড়াও সংযোজিত হয়েছে।

গ্র ন্থ সূ চি

ভালোবাসা খণ্ডকাব্য ১১
বাংলা চার অক্ষর ৭৫
যার যা হারিয়ে গেছে ১৩১
শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডা ১৯৩
প্রাণের প্রহরী ২৫৫
মালঞ্চমালা ২৭৩
আ চৈ আ চৈ চৈ ৩০৩
মনে পড়ে সেই দিন ৩৩৫
সংযোজন: ছড়া ৩৫৩

কাব্যপরিচয় ৩৬৭
কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি ৩৭১

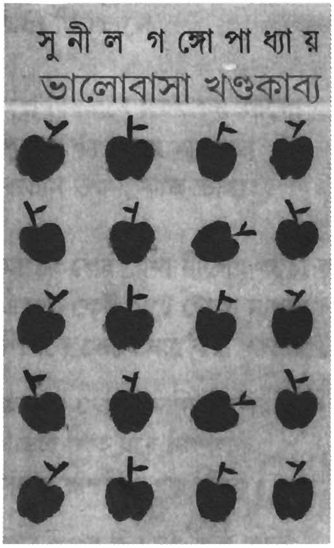

ভালোবাসা খণ্ডকাব্য

সূচি

মধ্য দিনমানে ১৩, সাত সকালে নীরা ১৪, কাঁচপোকার চোখের আয়নায় ১৫, শিল্প ও ছন্দপতন ১৬, আমাকে ধরো ধরো ১৭, জ্বর অতি চমৎকার, শুয়ে থাকো, নীরা ১৮, বাঁশির শব্দ ১৯, নিতান্তই একজন মানুষ ২০, এই অনিত্যে এমন মায়া ২৩, রাজকুমারী ও এক ভিখারি ২৪, বর্ষার গান ২৫, বিন্দু বিন্দু ২৫, বকুলতলায় ৩১, চিঠির উত্তর ৩২, খণ্ডকাব্য ৩৩, লেখা আর ঘুম ৩৪, স্থির মুহূর্ত ৩৪, অমৃত শিশুরা ৩৫, মন্দির-কাহিনী ৩৬, 'সারাদিন ছুটি আজ...' ৩৭, শুধু একটি ঝলক ৩৮, দুটি গাছ ৩৯, বড় মানুষের ঝি ৪০, নতুন লেখা ৪১, প্রেম বিষয়ক কিছু কথা ৪২, নীরার কৌতুক ৪৪, ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে ৪৫, মায়ের চিঠি ৪৫, সহসা ফিরে দেখা ৪৭, অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ৪৮, ওরা ৪৯, আয়নার মানুষ ৫০, এত প্রশ্ন, এত প্রশ্ন ৫১, চোখের এক পলক ৫৩, নীরব সংসার ৫৪, দাঁড়িয়ে রয়েছ একা, ঠিক একা নও ৫৫, সময় তখন খেলার সঙ্গী ৫৫, কাকে যে বলি ৫৭, ব্যর্থতার কথা ৫৮, কবির বাড়ি ৫৯, ভোরবেলার স্বপ্ন ৫৯, অকতাভিও পাজের কবিতা: কোচিন ৬৪, শেকসপিয়ারের অপ্রকাশিত প্রেমের কবিতা ৬৫

মধ্য দিনমানে

মধ্য দিনমানে ঈষৎ কম আলো
পুকুরে ঝাঁপ দেয় মাছরাঙা
বাতাস উন্মন, কাজ-ভাঙা!

মাঠের শেষ রেখা নীলের মতো কালো
একলা কেউ হাঁটে টোকা মাথায়
পিঁপড়ে ভেসে যায় ঝরা পাতায়

জানলা খোলা আমি কীসের ডাক শুনে
দাঁড়াই শিক ধরে নিষ্পলক
সহসা অশনির এক ঝলক!

দিনের পর দিন দণ্ড-পল গুনে
ভুলের পর ভুল প্রতীক্ষায়
ভেবেছি এ ভাবেই জীবন যায়।

দেশকে কোনো দিন জননী বলিনি তো
মাটির পৃথিবীটা নারীও নয়
ও সব মাঝে মাঝে বিকার হয়।

তবু এ দিবাভাগে বৃষ্টি বর্ণিত
ধুলোর সংসারে এ কী মায়া
চক্ষে লাগে যেন ধূপছায়া।

এই যে ধরণীর এমন চেয়ে থাকা
ইহার মাধুরীর নীরব ডাক
বুকটা কেঁপে ওঠে। রুদ্ধ বাক্

সুষমা খুঁটে খুঁটে দু'হাত ভরে রাখা
দিয়েছি কতটুকু ইহজীবন
কত যে ঋণী এই শরীর-মন!

সাত সকালে নীরা

শায়ার ওপর পুরুষ-জামা, সাত সকাল নীরা
চিরুনি-ভোলা খোলা চুলের চালচিত্রে মুখ
পেস্ট না ছোঁয়া ঠোঁটে এখন ঘুম ভাঙার গন্ধ
হাত দু'খানি নিরাভরণ, কানের লতি মুক্ত
জানলা খুলে এক ঝলক বাতাস মেখে নিলে...

প্রসাধনহীন নীরা হঠাৎ এ ভোর বেলা আমাকে সুদূরে নিয়ে গেল

তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা লক্ষ বছর আগে
নদীর নাম সরস্বতী, অথবা নামই ছিল না
বৃক্ষটিও শাল্মলী বা শিংশপার মতন
তার ছায়ায় আগুন মাখা সেই গোধূলি বেলা
গাছের ছাল ঘিরে রেখেছে অর্ধতনু, চুলে
ধুলো কিংবা ফুলের রেণু, একটি লোভী ভ্রমর
তোমার ওষ্ঠাধরের মধু পানের আশায় ঘুরছে
কালিদাসের উপমা চুরি, হয়তো মার্জনীয়
তুমি ঈষৎ ভ্রূভঙ্গিতে হানলে এক বিদ্যুৎ
ঠিক তখনই বৃষ্টি এল, তুমি বসন খুলে
নেমে পড়লে নদীর জলে, নদীটিও তো নগ্ন
দুলতে লাগল স্রোতের ধারায় তিনটি বুনো হংসী

আমাদের বনবাস, সেই স্মৃতি, একটুও মলিন হয়নি আজও দেখ

কয়েকখানা পাতায় ঢাকা কোমর, আমি কাছেই
লগুড় হাতে দাঁড়িয়েছিলাম, তখনো বাল্মীকি
ক্রৌঞ্চবধে উচ্চারণ করেননি তাঁর শ্লোক
আমার কোনো ভাষা ছিল না, তবু রূপের বিভায়
যেন ক্ষণেক অন্ধ হয়ে পড়ছি ভূমিতলে

অস্ত্র ফেলে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে প্রকৃতিকে
যেন তুমিই, তুমিই নীরা, করেছি কত আদর
হীরা পাথর, চুনী পাথর, মাটিতে সোনা রুপো...

এবার বাথরুমে যাবে, সারাদিন অন্য ছবি, সব প্রয়োজন অকারণ

কাঁচপোকার চোখের আয়নায়

প্রৌঢ়টির চোখের পর্দায় একটি অদৃশ্য নারীমুখ
কুয়াশা এগিয়ে আসছে, এক্ষুনি নদীর সঙ্গে শুরু হবে রতি
মানুষটির পায়ের নীচে যে ভূমি, সেখানে গুঁড়ো গুঁড়ো
নক্ষত্র-কণা
সে ক্রমশ দীর্ঘ হতে শুরু করে, তার মাথা ছাড়িয়ে যায়
রুদ্র পলাশের চূড়া
আর উঁচু হয়ো না অ্যারিস্টট্‌ল, আকাশে মাথা ঠুকে যাবে যে!

এর সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল তমসা নদীর তীরে
ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটির বধের সময় এ বলল,
বেশ করেছিস নিষাদ!
অন্যজন চোখের জলের সঙ্গে উচ্চারণ করল শ্লোক
সঙ্গে সঙ্গে দু' দিকের দুটো রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল
সাদা কালো মানুষ
ভেসে আসছে শরীরবাদীদের উদাস বিরহের গান
একটা ঘাসের ডগা কাঁপছে স্বপ্ন-দেখা চোখের পাতার মতন
ভোরের আলোয় ঝরে পড়ছে স্বর্গের বেহালা বাদকদের
লোকসঙ্গীতের সুর

দশই জানুয়ারি, ষোলোশো দশ, গ্যালিলিও গ্যালিলি
হাপিস করে দিলেন সেই স্বর্গ!

যারা স্বর্গ-বেশ্যাদের নাচের ঘূর্ণির পায়ে নিবেদন করেছিল
তপস্যার পুণ্য
তারা এখন সোনাগাছি খুঁজতে খুঁজতে হারিয়ে যাচ্ছে অনবরত
পিঁপড়েদের শোভাযাত্রায়
বস্তুবিশ্ব বহুরূপী গিরিগিটির মতন রূপ বদলাচ্ছে বারবার
আকাশে আকাশ নেই, সময়ের শুরু ও শেষ নেই, তুমি কেন
জন্মেছিলে মানুষ?
সামান্য এই প্রশ্নটিরও উত্তর পেলে না আজও
জানলার পর্দা, রোদ্দুরে সোনার ফ্রেম, কাঁচপোকার চোখের
আয়নায়
এ আমি কী দেখলাম?

শিল্প ও ছন্দপতন

একটা মেল ট্রেনের হঠাৎ ড্রাগন হবার ইচ্ছে হয়েছিল
আগুন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে যখন শূন্যে
লাফ দিতে উদ্যত
পাহাড়ের চূড়া থেকে এক জাদুকর বলল, দাস ফার
অ্যান্ড নো ফারদার!
অনেক দূরে মুচকি হেসেছিল সমুদ্র।

একটি রমণীকে উপহার দিতে গেলাম গুঞ্জাফুলের মালা
সে বলল, আমি টিশিয়ানকে ভালোবাসি, আমাকে
মুখ ফেরাতে বলো না

শিল্পের নারীরা কখনো মুখ ফেরায় না, মাটির প্রতিমাই
শুধু গলে গলে পড়ে
শিল্পের নারীরা মাকড়সানীদের মতন শিল্পীকেও খেয়ে
হজম করে ফেলে
মাটির প্রতিমা খিদেয় ফুঁপিয়ে কাঁদে, তার খুদে ছেলেমেয়েরা
হাপুস নয়নে ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়
তার বুকের আবরণী ছিঁড়ে গেলেও কেউ চেয়ে দেখে না
এত অন্ধকার, চাঁদের ওপিঠের মতন চির অন্ধকার তার
নাভি নিম্নে
বাসি ফুল আর বেলপাতায় দাপাদাপি করে ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর
শব্দে গাঁথা মালাটি কচমচিয়ে খেয়ে যায় ছাগলে...

এবার সমুদ্রের পালা
সে মেল ট্রেনকে বলল, ভাঙো, ভাঙো, ব্রিজটা ভেঙে
ঝাঁপ দাও খাঁড়িতে
ওসব জাদুকর-ফাদুকর, রাজা-গজা আমি ঢের দেখেছি
কোনো কবিকে কখনো দেখেছ, তোমার ছন্দপতন নিয়ে
চোখের জল ফেলতে
ঐ ওরা যাকে বলে কবিতা?

আমাকে ধরো ধরো

আমাকে ধরো ধরো, তলিয়ে যাচ্ছি যে
আমাকে তুলে ধরো
ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে, আমাকে ঠেলে দেয়
হিংসা পাংশুটে
আমাকে তুলে ধরো, অকূল কিনারায়

আঙুলে শুধু ভর
যেখানে ছিল নীলকমল কত শত
সেখানে এত ক্লেদ
হে দেশ, প্রিয় দেশ, কোথায় যাব আমি
বুক যে ভেঙে যায়
স্বপ্নে ছিলে তুমি, চক্ষু মেলে দেখি
সে দেশ তুমি নও
রক্তমাখা দিন, রক্তে ভরা নদী
সে দেশ তুমি নও
অকূল কিনারায় আঙুলে শুধু ভর
দ্বিধার এক পল
চরম চলে যাব, কাচের মতো মিহি
ধুলোয় মিশে যাব
বুক যে ভেঙে যায়, আমাকে ধরো ধরো
কেউ কি বলবে না
যেও না থাকো থাকো, দ্যাখো এ করতলে
তোমার নাম লেখা
এদিকে চোখ রাখো, কাঙাল, চেয়ে দেখো
ফিরেছে ভালোবাসা!

জ্বর অতি চমৎকার, শুয়ে থাকো, নীরা

তিনদিন শুয়ে আছো, নীরা, চোখের পাতায় ভাঙা ভাঙা ঘুম
জ্বরের বিছানা জুড়ে, সিলিং-এ, খাটের নীচে স্বচ্ছ প্রজাপতি
মশারির বাইরে শীত, বাথরুমে ঠিক ঝর্না পতনের ধ্বনি
মেরুন চাদরে মুড়িসুড়ি, শুধু পা দুটিতে রোদ আঁকিবুকি

জ্বর অতি চমৎকার, শুয়ে থাকো, নীরা, তুমি আপেল খেও না
আঙুর না, বেদানা না, হাসপাতাল নয় তো, নিজের শয্যায়
কিছুই খাবে না, বই পড়বে না, লক্ষ্মী সোনা, চোখ খোলা রাখো
ডাক্তারকে লঘু হাস্যে বলে দিও, ছুটি নিয়ে কাঠমাণ্ডু যাক!

বহুদিন দূরে ছিলে, আজ এত কাছে যেন মহাশূন্যে দেখা
মহাশূন্য? নীল রঙে ভেসে ওঠা নির্জনের এই সমারোহ
না-দেখা জাজ্জ্বল্যমান, শিল্পের সমূহ টান, এত ছবি লেখা
শরীরে পাও না টের, নীরা কারও নিশ্বাসের বিশল্যকরণী?

বাঁশির শব্দ

এই তো সেদিন তেজী, অস্থির, ব্যস্ত বাবা কোনওক্রমে সময়
বাঁচিয়ে
দায়সারা সময় দিত ছেলেকে
শোনাত মেঘনাদ বধ, টিনটিন ও কণিষ্কের মুন্ডু কাহিনী
এখন সেই বাবাই ছেলের পাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে
বারবার
কমপিউটারের ইঁদুর সরানো শিখতে ভুল করছে,
বাবার শিরা-উপশিরা থেকে যৌবন শুষে নিয়েছে ছেলে
জিনবাহিত উত্তরাধিকারের মধ্যে কোথাও শোনা যাচ্ছে
একটা বাঁশির সুর
ঝর্নার পাশে বল্কলের পোশাক পরে একজন কেউ
সুর সেধেছিল

ইন্টারনেটের মধ্যে যতই উঁকি মারছে সারা বিশ্ব
ততই বাবা ও ছেলের মধ্যে চওড়া হচ্ছে দূরত্ব

টুকরো টুকরো বাক্য ও নিস্তব্ধতা, তবু
কত কথা জমে আছে
ঝনঝনাচ্ছে টেলিফোন, রিসিভার তোলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত
আমার না তোমার?
খেলনা টেলিফোন ভেঙে ফেলে একদিন যে কেঁদেছিল
এখন সে বলছে, ই-মেল আসছে, বাবা, তুমি ধরো না
ক্যাসেটে আধা-পর্নোগ্রাফি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল
প্রৌঢ় মানুষটি
ছেলে টি ভি বন্ধ করে বাবার গায়ে বিছিয়ে দিল কম্বল
মা শখের রান্না ঘরে ছ্যাকছোঁক শব্দে, স্ত্রী জল-ফোয়ারার নীচে
ছেলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল
আবার নেমে এল নীচে
অনেক কথা বাকি আছে তাই বসল বাবার শিয়রের কাছে
বাবা যেন একটা শিশু, তার ইচ্ছে করল হাত বুলিয়ে দিতে
জন্মদাতার কাঁচা পাকা চুলে
দিল না, বাবার চেয়েও বড় হয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল
জিনবাহিত উত্তরাধিকারের মধ্যে শোনা যাচ্ছে একটা
বাঁশির শব্দ...

নিতান্তই একজন মানুষ

এসো, এবার সবাই নিজের নিজের দরজায় ঢুকে যাই
একজন রাত জেগে বসে রইল বাইরে
এসো, সকাল হয়েছে, কত রকম লাইনে দাঁড়াতে হবে
একজন সরে গেল আড়ালে
এসো, এবার একসঙ্গে হাত বজ্রমুষ্টি করি

শুধু একজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না
সেই একজনের জন্য এত ব্যাকুলতা, এত চোখ-ছোটাছুটি
সে কোথায়, সে কেন অদৃশ্য হয়ে গেল
যেন সব কিছু থেমে যাবে
তাকে আগে চাই, ধরে আনো, সবার সামনে দাঁড় করাও
অথবা কাঠগড়ায়
নইলে যে কারুর ঘুম আসছে না, সব লাইন শুনশান
একজন নেই, তাই কারুরই কাজে মন নেই
হঠাৎ বৃষ্টি নেমে পায়রার দঙ্গলের মতন সবকিছু ছত্রভঙ্গ
আকাশ-বাতাস, গলি-ঘুঁজি তাকে লুকোতে পারবে?
অথচ কোনও চেনা বাড়িতে সে নেই, সমস্ত অচেনা বাড়ির
জানলা খোলা
উল্টো-সোজা মানুষেরা হাত তুলে বলছে
আমি নই, আমি নই
কেউ তার মুখ মনে রাখেনি, এমনই মনে-না-রাখার মতন মুখ
কেউ তার নাম মনে রাখেনি, এমনই মনে-না-রাখার মতন নাম
যদিও সে ছিল চায়ের দোকানে, পার্কে, তোমার আমার
পাশে পাশে, কখনও একটু থেমে, জুতোর ফিতে বাঁধতে
দেরি করে
সে কোথায় পালাল, তাকে না পেলে যে সবকিছু ব্যর্থ!

সে এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে এক ধু ধু দিকশূন্যপুরের
দিকে
কোন্ দিক সে জানে না, তবু ওই দিকেই যেন তাকে যেতে
হবে
গাছের ছায়া হাতছানি দিচ্ছে তাকে
দু' একবার থমকে গিয়ে, নষ্টচন্দ্রের শৈশবের চোখে তাকিয়েও
সে থামছে না
তার ভয়বোধ নেই, তবু সে হারিয়ে যাচ্ছে
বিশ্বাসের সংঘাত নেই, তবু সে নিঃসঙ্গ

সে অনেকের হাত ধরেছে, কিন্তু পায়ে পা মেলাতে পারেনি
সে মিলিয়ে যাচ্ছে অনেক দূরে
খাল পেরুবার ছোট্ট একটা সাঁকো
তার নীচে খুব মায়াময় একটুকরো আকাশ
বাঁশঝাড়ের সরসর শব্দে আবহমানের বাল্যকাল
টনটনে দুঃখময় ভালোবাসার মতন
একটা নদীর বাঁক
বাতাস ওড়াচ্ছে কাশফুল, অথবা কাশফুল
উড়তে চাইছে বাতাসে
যেমন একদলা মাটি পুতুল হতে চেয়েছিল
পুতুলটাও হঠাৎ ফিরে যেতে চায় মাটি-জন্মে
ফল ফিরে যেতে চায় ফুলে, নর্তকী ফিরে যেতে চায়
মাতৃগর্ভে
ইস্কুলমাস্টাররা ছাত্রজীবনে, পিতার ছবি
তার সন্তানের মুখে
সে কোথায় ফিরে যেতে চায়, তালকানা, বর্ণকানা
জন্মান্ধের মতন?

যেখানেই যাক না, ছেড়ে দাও না ওকে
একজনই তো মোটে, এলেবেলে, কিছু না
ও তো আলাদা কণ্ঠস্বর তোলেনি
ফিসফিসিয়ে ও বলেনি কিছু
সন্ধে কিংবা রাত্রিভোর, কিছুতেই কিছু যায় আসে না
ওকে মন থেকে ছেঁটে ফেলে দাও
তলোয়ারের মতন বিদ্যুৎ অথবা যুঁই সমারোহের মতন
জ্যোৎস্না
এসো, আমরা এইসব দেখি, শুরু হোক কর্মযজ্ঞ
মাঠের মধ্য দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে একজন মানুষ
চরমতম একলা, তার পায়ে বোধহয় কাঁটা বিঁধেছে
সে হাঁটছে, একবারও পেছন ফিরে না তাকিয়ে

তবু কেন হাজার হাজার নারী-পুরুষ হ্যাংলার মতন
চেয়ে আছে তার দিকে
সুদূরে প্রায় মিলিয়ে যাওয়া বিন্দুটি থেকে ফেরাতে পারছে না,
দৃষ্টি
কেন বাতাস এত দীর্ঘশ্বাসময়
কেন আর সব কিছু থেমে আছে?

এই অনিত্যে এমন মায়া

তিন আঙুলের একটা জীবন, সাত শো মাইল অন্ধকার
সাত শো মাইল অন্ধকারে একটা বিন্দু, একটা জীবন
তিরিশটা হ্রদ ভরা বিষাদ, মধ্যে একটা শাপলা ফুল
আবার বলি, তিরিশটা হ্রদ ভরা বিষাদ, ভরা বিষাদ
মধ্যে একটা শাপলা ফুল
সেই ফুলটাই চক্ষু টানে, এই অনিত্যে এমন মায়া

ছদ্মবেশে ঘুরছি ফিরছি, ডুবে যাচ্ছি নিজের মধ্যে
গভীরতায় ডুব সাঁতার, কালের চেয়েও আরও অধিক
সবাই জানে সুসামাজিক, গ্রীবায় নেই ভুলের রেখা
ঠিক ছন্দে পা মেলাচ্ছি সবাই দেখে, কেউ জানে না
ভালোবাসার কাঙাল একটা ভিক্ষে করে দু'বেলা খায়
ভালোবাসার কাঙাল একটা ভিক্ষে করে দু'বেলা খায়
ভালোবাসার গোলকধাঁধায় ভালোবাসাকে খুঁজে বেড়ায়
ভালোবাসায় দু'হাত ভরা, ভালোবাসায় চক্ষে আঠা
বুকের পাশে ভালোবাসা, পায়ের নীচে ভালোবাসা
আবার বলি, তিরিশটা হ্রদ ভরা বিষাদ, ভরা বিষাদ
মধ্যে একটা শাপলা ফুল
সেই ফুলটাই চক্ষু টানে, এই অনিত্যে এমন মায়া!

রাজকুমারী ও এক ভিখারি

চাকরির দরখাস্ত হাতে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে সলজ্জ শরীরে
তাকে বসতেও বলা হয়নি
ক্ষমতার ধ্বজাধারী ব্যক্তিটি এমনই ব্যস্ত, চোখ ঘোরাচ্ছেন অনবরত
তাঁর আসলে পাঁচ সাতটা মাথা, বারো চোদ্দটা হাত
হৃদয় আধখানা
ঘর ভর্তি অনেক মানুষ, টাইপ রাইটারের শব্দ
বুক পকেটে টেলিফোন
টেবিলের ওপর বিমানের টিকিট, খালি পা, তাঁর জুতো পালিশ হচ্ছে
তিনি মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছেন না
ওর হাতের কাগজটা দেখারও দরকার নেই, তিনি জানেন—
চাকরি খোলামকুচি নয় যে যত ইচ্ছে বিলোনো যায়
তা ছাড়া রাশি রাশি সুপারিশের ধাক্কা
যাকে কিছু দিতে পারবেন না, তার সঙ্গে কথা বলারই বা দরকার কী
এমনিতেই মিথ্যে বলতে বলতে মুখে ফেনা উঠে যাচ্ছে
তিনি মাঝে মাঝে গোপনে কুঁচকি চুলকোচ্ছেন
আর লাল টেলিফোনে অনুবাদ করছেন হাসি ঠাট্টা

মেয়েটির ছিপছিপে তনুতে নীল শাড়ি, চুল খোলা
আভরণহীনা, চোখের কোণে শুকনো জলের দাগ
সে এক সময় বলল, আমি যাই?
কয়েক পলকের জন্য চোখাচোখি, তিনি চমকে উঠলেন
কে এই ছদ্মবেশিনী? যেন এক ঝলক যৌবনের দ্যুতি
চিরকালের মতন পরিত্যাগ করে যাচ্ছে তাঁকে
এই ব্যস্ততার পূতিগন্ধময় আবর্জনায় নির্বাসন দণ্ড আজীবন
তিনি হাঁটু গেড়ে আর্ত গলায় বলতে চাইলেন
যেও না, দাঁড়াও, আমি অকিঞ্চন, কৃপাজীবী
আমাকে দেবে তোমার করুণার এক কণা?
বলা হল না, পিছন ফিরে মেয়েটি চলে গেছে দরজার কাছে
বিপদ সঙ্কেতের মতন বেজে উঠল ঝনঝন শব্দে আবার টেলিফোন...

বর্ষার গান

বর্ষার ঝাপটে ঘুম ভাঙল কি কাঁচপোকাদের সংসারে
কাঁচপোকা তার প্রতিবেশীদের ডেকে বলল, হাহা-হাহা-হাহা
সাপেদের গর্ত ডুবু ডুবু, নদী ফুলে ফেঁপে ছুঁতে চায় মেঘলা আকাশ
আকাশ দেখেনি যারা তারা দেখল অশনি ঝলকে যেন খুলে যায় স্বর্গের জানালা
এ সময়ে তারা খসে পড়ে, বড় কোমল মায়ায় মিশে যায়
গ্রামবাংলায় আলো, যেখানে বিদ্যুৎ নেই সেখানেও বিদ্যুতের আলো
অকস্মাৎ এক ঝলক, এত তীব্র, দেখা যায় বাচ্চাদের খিদে মাখা মুখ
লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে ছুটে আসে ভিজে চুলে পুকুর-কিশোরী
বৃষ্টির চাদর গায় একজন মানুষ
দুনিয়া বিস্মৃত, লঘু পদচারণায় রত একজন মানুষ
স্পষ্ট দেখা যায় তাঁকে, শোনা যায় গুনগুনানি
শ্যামলীর বারান্দায় নির্জন রবীন্দ্রনাথ
গান বাঁধছেন।

বিন্দু বিন্দু

পাথর

এক যে ছিল পাথর, তাকে হঠাৎ কারা
বানিয়ে দিল দেবতা
পাথরটি তা চেয়েছিল কি চায়নি, কেউ
কখনো ভাবে সে কথা?

গুরু-শিষ্য

গুরু অ্যারিস্টট্‌ল, তাঁর পিঠে চেপেছে ছাত্র
গুরুর বয়েস অনেক, ছাত্র বছর দশেক মাত্র।
গুরু হলেন ঘোড়া, ছাত্র ছপটি মারছে বারবার
বিশ্বজয়ে যাবেই যাবে, নামটি আলেকজান্ডার।
পণ্ডিতে বই লিখছে শুধু, লাগে কলম-কাগজ
রক্ত ছড়ায় ছাত্রের দল, লাগে না কোনো মগজ!

সত্য

সত্য কাকে বলে?
হস্তী দর্শনের মতো কত ব্যাখ্যা নানান ছলেবলে
হস্তী আসলে কী?
গুলি চালাও, ছবিতে রাখো, জ্যান্তটাই মেকি!

নারী-স্বাধীনতা

এমনও তো হতে পারে, মেয়েরা বলতেই পারে
কিছুতেই ছেলেদের করব না বিয়ে!
অজাত শিশুরা সব বিমান ও রেলপথ
গাড়ি-ঘোড়া, রাস্তাঘাট দেবে আটকিয়ে?

এখন

রাখালরা আর বাজায় না বাঁশি
রাজপুতরাও চালায় না অসি
বাঘ গর্জায় চিড়িয়াখানায়
ভূতেরা এখন সিনেমা বানায়।

ভালোবাসা

ভালোবাসায় আছে একটা অতি গোপন আলো
কেউ দেখে না সেটা, কিংবা কেউ বা দেখে কালো
ভালোবাসার অন্ধকারেও জ্বলে সবুজ শিখা
কেউ পেয়ে যায় পথের দিশা, কেউ বা মরীচিকা।

প্রজাপতি

শ্রম ছাড়া ধনরত্নের স্বাদ পাবার উপায় কিছু নেই আর
গরিব কবিরা খাটো, খাটো, খুব শরীর ঘামাও কাজে দাও মতি
এই কথা লিখে গিয়েছেন কবি, মহান ফরাসি আপোলিনেয়ার
কত কবি মুখে রক্ত তুলছে, গুটিপোকা থেকে হবে প্রজাপতি।

কলম

কলম বলল, অনেক দিন তো থাকতে হল
অন্য হাতের অধীন
এবার নিজেই রচনার কথা ভাবব।
হাতটি বলল, ভালোই তো ভাই, খাটতে খাটতে
হয়েছি বিষম ক্লান্ত
স্বাধীন ভাবেই লেখো না অমর কাব্য!

কুমির

কুমিরেরা সত্যি যদি লোপ পায় নদী-খালে-বিলে
তাদের কান্নার কথা থাকবে না আর অভিধানে?

খরা ও বন্যায়, ভোটে, মন্দিরে-মসজিদে রক্ত ক্ষয়ে
কুম্ভীরাশ্রু বয়ে যাবে তবু জোয়ারের হু হু টানে।

কবিতা-গদ্য

একটা কবিতা কবুতর হয়ে রয়েছে বুকের মধ্যে
তবু মেঘহীন সন্ধ্যায় কবি ঝড়-ঝঞ্ঝাটে আটকা
কাজ-অকাজের দু'খানা কেল্লা গোলাগুলি ছোড়ে গদ্যে
কে জেতে কে হারে, ভুরুসন্ধিতে এই নিয়ে চলে ফাটকা!

দীর্ঘশ্বাস

পেয়ারা গাছের ডালে দোল খায় কৈশোরের স্বপ্নময় ছবি
জলের আয়নায় স্বর্ণ ভোরবেলা মাধুর্যের কণাগুলি ঝলসে ওঠে গুপ্ত ইশারায়
আলোকলতার মূল খোঁজে এক দার্শনিক, হেসে ওঠে অবিশ্বাসী কবি
আকাশের দেবতারা লোভীর মতন দেখে, কত দীর্ঘশ্বাস উড়ে যায়।

মাতৃভাষা

ঘুঁটে কুড়ুনির ছেলেটি দিব্যি পড়তে শিখেছে বই
গড়গড় করে ছড়াও সে বলে খাসা
মাকে সে শুধোয়, জননী বানান দীর্ঘ-ই নাকি হ্রস্ব-ই
হায়রে
কত না মায়েরা শেখে না মাতৃভাষা!

স্বাধীনতা

দেশটা হয়েছে স্বাধীন, এবার পূর্ণ অর্ধ শতক
তবু মনে মনে রয়ে গেছে এক ধন্ধ
কত হল সেতু, বাঁধ, কারখানা, আকাশচুম্বী সৌধ
শুধু ফুল থেকে চলে গেল কেন গন্ধ?

অমরত্ব

জানতেন কি রাজা অশোক ইতিহাসে তাঁর নাম থাকবে
ঠিক ক' পাতায় চিরকালের স্বত্ব?
শাজাহান কি তাজমহলটা বানিয়ে ছিলেন পাঠ্যবইয়ের
ছবির লোভে, তাতেই অমরত্ব?
তবু তাঁদের কীর্তি গরিমা যুগ যুগ সঞ্চিত
কত তলোয়ার ঘোরানো বীরেরা রয়ে গেল বঞ্চিত!

বনভোজন

সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে কেউ না
কী করে পশুরা জেনে গেল সেটা, হি হি করে হাসে হায়েনা।
মানুষের হাতে ভিক্ষের ঝুলি, মানুষের হাতে অস্ত্র
কেউ হাঁক ডাকে গগন কাঁপায়, কেউ ভয়ে গলবস্ত্র।
জন্তুরা এই গল্পে মেতেছে, পাখিরাও মাতে কূজনে
ভারী কৌতুকে মিলেছে সবাই, বসে গেছে বনভোজনে।

পরিত্যক্ত

সাহেবরা গেছে, রেখে গেছে কিছু
থুতু ও গয়ের, শ্লেষ্মা
তৈরি হয়েছে নকল নবীশ
স-টাই, বাঁদর, বেশ্যা!

হরি, হরি

সাপটি বলল, ওহে ব্যাঙ ভায়া, যথেষ্ট হল খেলা
এবারের মতো জপ করো হরিনাম
ব্যাঙটি বলল, হরি তো নিজেই দূরদর্শনে আটক
কী আর করব, পুরাও মনস্কাম!

মা ও মাটি

মায়ের কথা শুনতে গেলাম ধানের ক্ষেতে, বিদ্যুৎ চমকাল
মা-মাটি সব পিতৃহীনের মতন মিশকালো
রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য, সেই রক্তে ছিল জল
অন্ন নেই, ভোটের কাগজ, কাগজই সম্বল!

খাওয়া-দাওয়া

একটা সময় পাথর চিবিয়ে খেতুম, কিংবা লোহা
বললেন এক অম্বুলে রুগি হাত পা ছড়িয়ে চাতালে
আজকেও যারা পাথর মিশিয়ে আঙুল ফুলিয়ে কলাগাছ
তারাও যখন তখন ছুটছে, পেট রোগা, হাসপাতালে!

কেউ জানে না

দেশ হয়েছে স্বাধীন
একটা, দুটো, তিন পেয়ালা চা দিন।
বোমা ফাটাল ফুটুস মোটে পাঁচটা
ফিকফিকিয়ে হাসে অশোক গাছটা।
দেশ বিদেশে কত কি লোকে ভাববে
কেউ জানে না কী লেখা হল উপন্যাসে, কাব্যে।

নদী ও খাল

খাল বলে নদীটিকে, কী যে তোর চেহারাটা
এত আঁকাবাঁকা
সভ্য সমাজে আর মান রাখা দায় হয়
আজ থেকে আত্মীয় বলে ডাকা মানা।
নদী বলে বেশ কথা, আমি আর কত দিন,
ঠিক নেই থাকা বা না থাকা
তুমি ভাই বেঁচে থাকো, জলে যদি টান পড়ে
পাহাড় বা সাগরের জানো তো ঠিকানা?

বকুলতলায়

বিকেল পাঁচটায় তুমি দাঁড়িয়ো বকুল গাছটার নীচে
আমি ঠিক যাব, দেখা হবে
যদি না যাই, যদি না যেতে পারি?
পাতাল থেকে হাত বাড়িয়ে যদি পা ধরে টানে শয়তান

বকুল শাখা থেকে ঝরে পড়ছে এক একটি মুহূর্তের ফুল
আমার চুলের মুঠি ধরে কে পেছন থেকে টানছে?
কারা ঠিক এই সময়ে আগুন দিল ট্রাম-বাসে?
বকুল গন্ধে উন্মন বাতাস, বকুল গন্ধে ফিসফিসানি
প্রত্যেকটি পাতা উদগ্রীব হয়ে দেখছে তোমাকে
তুমি দাঁড়িয়ে রইলে একলা
তোমার ফর্সা ডান হাতে কালো ব্যান্ডের ছোট ঘড়ি
আর কিছু নেই, সমস্ত দৃশ্যের মাঝখানে তোমার নিঃসঙ্গতা
পৃথিবীর কোনো বকুল গাছ আমাকে আর কোনোদিনও
ক্ষমা করবে না।

চিঠির উত্তর

উত্তর দেব ভেবে চিঠিখানা রাখলাম একটা বইয়ের ভাঁজে
তারপর কখন টেবিল থেকে সরে গেল বইটি
তারপর দিনের পিঠে লাফিয়ে পড়ল আর একটি দিন
পরদিন আকাশ চিরে বিদ্যুৎ ঝলকের পর নামল
সতেরো কোটি বৃষ্টির ফোঁটা
মাঝপথে একটা ট্রেন থেমে গিয়ে হুইস্‌ল দিতে লাগল ঘন ঘন
বিদ্যুৎ উধাও হয়ে সন্ধেবেলাটি হল আদিমকালের মতন
সকালবেলার খবরের কাগজ রক্তে মাখামাখি
ক্যাস্ট্রো কি ক্লিন্টনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন,
না মেলান নি?

তাতে আমার কিছু যায় আসে?

কী বই ছিল সেটা, কিছুতেই মনে পড়ছে না

ঢাকনা-খোলা ড্রেনের মতন মনের মধ্যে অনবরত জমা হচ্ছে
ইতিহাসের বহু অমীমাংসিত বঞ্চনার কাহিনী
প্রত্যেক দিন যত সিঁড়ি দিয়ে উঠি, তার চেয়েও বেশি সিঁড়ি দিয়ে নামি
কত বই নিজেরাই হারিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল
একটা চিঠির উত্তর প্রস্তুত হয়ে আছে বর্ণে বর্ণে
লেখা হবে না কোনোদিন।

খণ্ডকাব্য

যাকে ভালোবাসি তার ঘুম, তার ঘুম ছাওয়া মুখখানি এমন অচেনা!
পাশে যে রয়েছে শুয়ে, সে কে? সে কোথায়?
শরীর আলাদা কথা, এমনকি খোলা চুল, ভ্রূসন্ধিতে ঘাম
সেও তো শরীর, পায়ে স্তব্ধ অস্থিরতা, আর ঊরুর উত্তাপ
তবু যেই পাশ ফেরা, আধো মুঠি, ওষ্ঠে কোন্ মায়া
অসমাপ্ত এ জীবন, ভালোবাসা অলীক ভ্রমর
অথবা উপমাহীন, বাথরুমে মৃদু আলো, কেউ তো জাগে নি
বন্ধ জানলার কাচে রাত পোকা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, শব্দ হয়
সে শুয়ে রয়েছে খোলা চুলে, ক্ষীণ শায়ার দড়িতে
ঘুম বিহারিণী, তুমি কোন্ রাজ্যে, কোন্ পথিকের সহচরী
যেমন আমার স্বপ্নে তুমি নেই, সে কথাটা বলেছি কখনো?
জাগরণ দিয়ে ঘেরা যতটুকু, তার বাইরে নিষিদ্ধ সীমানা
জাগরণ দিয়ে ঘেরা যতটুকু তাই বাইরে আমরা কেউ নই
ভালোবাসা খণ্ডকাব্য, বাকিটুকু লেখাই হবে না।

লেখা আর ঘুম

একটা লেখা, আরও একটা, কটা লিখব আজ?
কাজের মধ্যে ছুটি আমার, ছুটির মধ্যে কাজ
রোদ্দুর না, বৃষ্টিও না, বাইরে চেয়ে কিছুই দেখব না
যতই ভোরে বাঁশি বাজুক, সন্ধেবেলা যতই ঝরুক সোনা।
চেয়ার ছেড়ে যাওয়া নিষেধ, চেয়ার জুড়ে দিন রাত্রি কাটে
কলম ছোটে পাহাড় চূড়ায় কলম ছোটে সাগর, নদী, মাঠে
সাদা পাতায় রাত্রি জাগি, ঘুমোই কালো পাতায়
রবীন্দ্রনাথ হাত বুলিয়ে দিলেন আমার মাথায়।

স্থির মুহূর্ত

ওদের একটু চুপ করতে বলো, আমি আপাতত
নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে কথা বলছি

গেট ঠেলে সবাই ঢুকে পড়ছে পরের বাড়িতে
কেউ দেখছে না সবুজ ঘাসের ওপর ছড়িয়ে আছে
কত সোনার বোতাম

ঝুল বারান্দায় একটি স্বচ্ছ নারীমূর্তি, তাকে ভেদ করে যাচ্ছে
পড়ন্ত সূর্যের রক্তিম রশ্মি
বেতের চেয়ারে আধো ঘুমন্ত পিতামহের দিকে
খলখল করে হাসতে হাসতে মৃত্যু এগিয়ে আসছে
একটি বালকের রূপ নিয়ে
ওকে একটা খেলনা দাও না, একটা সীমান্ত যুদ্ধ

যারাই পরের বাড়িতে আসে, গেটে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে
পাপোশে সিগারেটের ছাই ফেলে কেউ কেউ তাকায় অপরাধী চোখে
ওদের সবাইকে স্থির মুহূর্ত দাও
আমি আপাতত নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে কথা বলছি
স্থির মুহূর্ত, স্থির মুহূর্ত!
ঝুল বারান্দার রমণী এবার ঝাঁপ দেবে সায়াহ্নের দিকে
সবই পূর্বকল্পিত, ভবিষ্যতের ছবির মতন
তার আগে আমি জরুরি কথাবার্তা সেরে নিচ্ছি
এখুনি স্থির মুহূর্তের সঙ্গে জুড়ে যাবে দুটি ডানা।

অমৃত শিশুরা

পৃথিবীর পেট ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় শতাব্দীর অমৃত শিশুরা
চতুর্দিকে হা-হা শব্দ, আরও চাই, আরও দাও, দাও
স্তন্য নয়, স্তন দাও, পীযূষ কে চায়, দাও রক্ত দাও, দাও
রক্তমাখা ঠোঁট নিয়ে দুনিয়া দাপায় আজ অমৃত শিশুরা।

এক বটবৃক্ষে আজ শ্বেতকেতু প্রশ্ন ভুলে প্রাণ খুলে হাসে
বৃক্ষটির পাতা নেই, ন্যাড়া ডালে শীর্ণ আলো, ক্ষুধার্ত আঙুল
চতুর্দিকে ভেদ বমি, গন্ধ চাটে গর্ভপাতে উন্মুখ আঙুল
অনাগত কালে কেউ খেলার সঙ্গীও চায় না, একা একা হাসে!

শূকরীর মতো তবু এ পৃথিবী সন্তানের জন্ম দিয়ে যায়।

মন্দির-কাহিনী

ট্রামটা যখনই চারমাথা মোড় পেরোয়, অফিসবাবুরা
হাত দুটো তোলে কপালে যেদিকে কালী ঠাকুরের মন্দির
তিরিশ বছর আগে যা দেখেছি, এখনও ছবিটা তেমনি
সে সব অফিসবাবুরা অনেকে হাড় জুড়িয়েছে শ্মশানে
কিংবা ছেলের সংসারে আজ বিনা বেতনের ভৃত্য
হাত জোড় করে কী চেয়েছিলেন, কী বা পেয়েছেন কে জানে!

ছেলেরা এখন অফিসযাত্রী, একই রাস্তায় রোজ যায়
ঠিক জায়গায় হাত জোড় করে, চোখ বুজে কিছু বিড় বিড়
মন্দিরখানা প্রায় একই আছে, খসেছে কিছুটা চল্‌টা
কালী মূর্তির স্তন খুঁটে যায় আরশোলা এক গন্ডা
কলার খোসা ও রাশি রাশি বাসি ফুল পচা কটু গন্ধ
ধেড়ে ইঁদুরেরা রাজত্ব পেয়ে রাত্তিরে করে হুল্লোড়
গত বছরই তো চোর ঢুকেছিল, নিয়ে গেছে সব গয়না
পুলিশরা এসে ভোগ খেয়ে গেছে, ঢালাও মদ্য মাংস!

পুরুত মশাই কাঁদছেন, তাঁর মেয়ের প্রেমিক খ্রিস্টান
ছেলেটা দিব্যি বোমা বানাচ্ছে, বাড়িতে দেয় না পয়সা
মল্লিকবাবু সেবায়েৎ, তাঁর লিঙ্গেও বাঁধা মাদুলি
তবু গাঁটে গাঁটে বাতের বেদনা, বাঁজা রইলেন গিন্নি

মহাকাল থেকে ঝুরঝুর করে খসে পড়ে কিছু ময়লা
একটি বৃদ্ধা রোজ ভোরবেলা ঝাঁট দিতে দিতে ক্লান্ত
তারই ফোকলা মুখের হাসিটি ধার চায় কালী মূর্তি
তিনটি ভিখিরি চট পেতে বসে, কুকুরটা করে ঘুর ঘুর
প্রথমেই আসে রুক্ষ নারীটি, প্রণামের ছলে কেঁদে যায়
অশ্রু ফোঁটায় প্রতিদিন শুরু হয় জীবনের গল্প...।

‘সারাদিন ছুটি আজ...’

সারাদিন ছুটি আজ কারখানা বন্ধ
সারাদিন ছুটি আজ পাঠশালা বন্ধ
উনুন জ্বলেনি আজ খাওয়াদাওয়া বন্ধ
বহুদিন বহুরাত সব কিছু বন্ধ
কেউ কেউ অভিমানে, কেউ রাগে অন্ধ
সারাদিন ছুটি আজ কারখানা বন্ধ
হাওয়া বয় শনশন পচা-পচা গন্ধ
উনুন জ্বলেনি আজ, খাওয়াদাওয়া বন্ধ
ধিকিধিকি জ্বলে খিদে, তবু চলে দ্বন্দ্ব
গেটে ঝোলে বড় তালা, কারখানা বন্ধ
সংসার ভেঙে যায়, বাড়ে খানাখন্দ
কাজ নেই, কাজ নেই, সব কিছু বন্ধ
বলো দেখি, কে যে ভালো, আর কে যে মন্দ
উনুন জ্বলেনি আজ কারখানা বন্ধ
কাজ চাই, কাজ নেই, এই নিয়ে দ্বন্দ্ব
ওদিকে অভাব নেই, নাচ-গান-ছন্দ
ওদিকে মাংস-মদ, আতরের গন্ধ
এদিকে শিশুরা কাঁদে মা-বাবারা অন্ধ
খেলা নেই, পড়া নেই, সব কিছু বন্ধ
ধিকিধিকি খিদে জ্বলে, তবু এত দ্বন্দ্ব
কেড়ে খেতে পারো নাকি? কপালটা মন্দ
কপাল দু’ হাতে নয়? চোখ বুঝি অন্ধ?

সারাদিন সারারাত, কারখানা বন্ধ...

শুধু একটি ঝলক

একটু আগে কী বলছিলে? হঠাৎ একটু ঘুমিয়ে পড়লুম
ঘুমের মধ্যে দেখি একটা নৌকো একলা একলা দুলছে
মাঝ সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, নীলের মধ্যে ডুবেছে নীল
এটাকে ঠিক স্বপ্ন বলা যায় না, শুধু একটি ঝলক
আবার চক্ষু মেলেই দেখি, তোমার চালচিত্র আকাশ
বসে রয়েছ দিগন্তের রেখার ওপর, মুখে পড়েছে
চূর্ণ অলক, হাওয়ায় উড়ছে নীলিমাময় শাড়ির আঁচল
একটু আগে কী বলছিলে? আবার বলো। মায়া ঘুমের
জন্য দোষী, তবু ঐ যে একলা নৌকো, নীলের নৌকো
না দেখলে কি তোমার অমন দিগন্ত রূপ চক্ষে পেতাম?

এবার আমি উঠে বসছি, তুমিও কাছে এগিয়ে এসো
সমুদ্র বা দিকবলয়ের জন্য শুধু দুই মুহূর্ত
তার বেশি আর সহ্য হয় না, ইচ্ছে করে তোমায় ছুঁতে
স্পর্শে অনেক জন্ম স্মৃতি, ওষ্ঠ-ঢেউয়ে গোপন ভাষা
মাঝে মাঝেই অন্য মানুষ, এক পলকে সব অচেনা
হুড়মুড়িয়ে ঢুকতে চায় দূরত্বের অসীম বাধা
অনুভবের রং বদলায়, শরীর থেকে শরীর হারায়
আবার তাকে ফিরিয়ে আনি, না না, শরীর অনেক ভালো
শরীর দিয়ে গল্প শুরু, রূপ ছাড়া কি গল্প জমে?

কাহিনী বিন্যাসের মতন শরীরে তাপ রক্ত ছড়ায়।

দুটি গাছ

একটি গাছ ফুলের বদলে অজস্র জোনাকিতে সেজে আছে
আর একটি নিঃস্ব গাছ দেখছে পাশ থেকে
চোখ নেই, তবু দেখে, কান নেই তবু শোনে, পেট নেই
তবু খায়, মাথা নেই তবু চিন্তা করে
এমনই প্রাণী এই গাছেরা
বিশুদ্ধ গান শুনলে খুশি হয়
ওদের কি ঈর্ষা আছে, কিংবা লোভ, প্রতিহিংসা?
ওরা ভালোবাসার মতন কত কী দেয়, বিনিময়ে
চায় কি কিছু?
আমি পাশের বঞ্চিত গাছটির দিকে চেয়ে আছি
যেন শুনতে পাচ্ছি ওর কান্না
জোনাকি মগ্ন গাছটিকে নিয়ে কবিতা লেখা যায় না
দুঃখের এক একটি বিন্দু উঠে আসে কোন অতল থেকে
মনে পড়ে যায়, মানুষের দীর্ঘ ইতিহাস মনে পড়ে যায়।

বড় মানুষের ঝি

আরে ছি ছি ছি ছি ছি, পাড়ার লোকে বলবে কী
রাত দুপুরে বাড়ি ফিরছে বড় মানুষের ঝি

সন্ধেবেলা মশারি ফেলে যারা ঘুমোতে যায়
মাঝরাত্রে হুড়ুস ধাড়ুস সবাই বারান্দায়
ঐ এল কি, না এল না, সঙ্গে আছে কে?
পাড়ার যত হুলো বেড়াল কোমর বেঁধেছে
রাস্তাখানা ছটফটাচ্ছে, তারও অমন দশা
গাছগুলোনও নিথর চুপ, বন্ধ পাতা খসা
গাড়ি থামবে চণ্ডীতলায়, বাকি পথটা হাঁটা
ভয় পায় না, আঁচল ওড়ায়, যম দুয়োরে কাঁটা।

কোথায় যায়, চরণ দুটি টলমলে না সোজা?
বড় মানুষের ধরন ধারণ সহজ নাকি বোঝা!
অঙ্গখানি সোনার বর্ণ, সোনার ভরি কত?
অমন মেয়ে হাত ঘুরোলেই আসবে শত শত

এক এক রাত ভোর হয়ে যায় , তবুও আসে না সে
পোড়া কপাল, সে নাকি আজ ছাদে রয়েছে বসে!
অপ্সরা না কিন্নরী গো, এল আকাশ পথে
কোন সিনেমার নায়ক তাকে উড়িয়ে আনল রথে?

হাসিতে যার মুক্ত ঝরে, মেঘবরণ কেশ
ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে যারা, দেখে নির্নিমেষ
ওগো কন্যা, তুমি হঠাৎ লক্ষ্মী মেয়ে হলে
কী যে বিপদ হবে বলো তো, পাড়ার দঙ্গলে!
গল্প নেই, রাত্রি জাগা হবে কীসের টানে
সবাই ফের চক্ষু গরম করবে দিনমানে
বড় মানুষের মেয়ে, তোমায় মন্দ হলেই মানায়
নইলে কেন জন্মালে না ওদের গরিবখানায়!

নতুন লেখা

নতুন কী লিখছেন, সুনীলবাবু? আপাতত কিছু না
কেউ বিশ্বাস করে না
যদি বলি, একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করছি
সবাই অন্যমনস্ক হয়ে যায়, হঠাৎ বলতে শুরু করে
আজ রাস্তায় ট্রাফিকের বড় গোলমাল

নতুন লেখা মানেই লম্বা-লম্বা উপন্যাস
সে-রকম কয়েকখানা লিখে অন্যায় করে ফেলেছি?

এখন রাত পৌনে-একটা, আজ আকাশ অদৃশ্য
কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত সরস্বতী-বিসর্জনের খুব হই-হল্লা ছিল
এ-বারে একটিও সরস্বতী মূর্তির সামনে দাঁড়াইনি
এখন দূরে-দূরে কিছু আলো শান্তভাবে ঘুমন্ত
দিনের বেলা পিকনিকে যথেষ্ট পানাহার ছিল, রাত্তিরে আবার
কেন হুইস্কি খাচ্ছ? স্বাতী খুব নরম, মৃদু অনুযোগ করেই
চলে গেল বিষয়ান্তরে, তারপর শুতে চলে গেল
হ্যাঁ, সত্যি আমি বেশি-বেশি পান করছি, বেশি-বেশি সিগারেট
কেন? কেন?
কোনও ব্যর্থতাবোধ থাকার কথা নয়, বেশ তো চমৎকার জীবন
তবু এই রাত্তিরে চুপ করে বসে থাকি, বিছানা ডাকে, যাই না
চিন্তাকেও স্তব্ধ করে রাখি, স্তব্ধতাকে আদর করি
নাঃ, কোনও অনুতাপ নেই, আঙুলে কোনও পাপ নেই
কলম সরিয়ে রেখে চেয়ে থাকি সাদা পৃষ্ঠার দিকে
যা-যা লিখতে পারিনি, তাদের স্পষ্ট দেখতে পাই
এত-এত লেখা, তার পরেও সংখ্যাহীন না-লেখা
তারা হাসে, হাত ধরে নাচে, চোখ টিপে সরে যায়
যেন একটা মঞ্চ, এই খালি, এই ভর্তি, উইংসের একপাশে ওরা
অন্যপাশে উঁকি দেয় কে? চেনা-চেনা লাগে, চিনতে পারি না

আরও আড়ালে চলছে পাশাখেলা, একজন চোখ-ভেজা রমণী
আর তার বিপরীত দিকে...এই, এই, ভুল চাল দিয়ো না!

প্রেম বিষয়ক কিছু কথা

কবি, এবারে সত্যি করে বলুন তো, মধ্যগগন পেরিয়ে সূর্য এখন
চলে যাচ্ছে মধ্য বয়েসে, যেমন আপনার বয়েস,
প্রথম ফুল ফোটার মতন যৌবন উদ্গমে এবং বাতাসে বন্যার জলের মতন
আরও অনেক বছর
আপনি যে সব প্রেমের কবিতা লিখেছেন, ঠিক যেন
নেশাগ্রস্তের মতন প্রেম,
এই প্রেমের দাপট কি আপনার এই বয়েসেও থাকে? প্রেম কি
সত্যিই কখনো পুরনো হয় না, হারিয়ে যায় না?
প্রশ্ন শুনে কবি স্মিতহাস্যে বললেন, তুমি সেই গল্পটা
জানো না বুঝি?
একজন রবীন্দ্রনাথকে প্ল্যানচেটে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল, গুরুদেব,
মৃত্যুর পর সত্যিই কি স্বর্গটর্গ...
তরুণ প্রশ্নকারীটি ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে বলল, আপনি আমার
উত্তর এড়িয়ে গিয়ে নিজেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করলেন?
বুড়ো বয়েসে বুঝি এরকম হয়?
আমি পরকাল কিংবা স্বর্গ-নরক নিয়ে...
কিন্তু প্রেম, সে কি ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দু, কিংবা
চোখ খোলা স্বপ্ন, কিংবা চার দেয়ালে বন্দির একটিমাত্র জানলা?
কবি হাসলেন, রবীন্দ্রনাথের কৌতুকটি তুমি বলতেই দিলে না
তা হলে প্রথম থেকেই এত উপমা দিচ্ছিলে কেন?

এসব প্রশ্ন করতে হয় সোজাসুজি!
তরুণটি বলল ঠিক আছে, স্পষ্টাস্পষ্টিই জিজ্ঞেস করছি, প্রেম
কতদিন টেঁকে বলুন তো? ক' মাস? ক' বছর?
একজনের সঙ্গে আজীবন প্রেম কি সম্ভব?
কবি মুচকি হেসে বললেন, আমার সোজাসুজি উত্তর, তোমায় বলব কেন?
তরুণটি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ব্যস, ভয় পেয়ে গেলেন, ভাবলেন
বুঝি আপনার ওসব মাখো মাখো প্রেমের কবিতাগুলো
আর কেউ পড়বে না?
কবি বললেন, তুমি এবার চাঁছাছোলা ভাষায় কথা বলছ
তবে আমি উপমা শুরু করি?
প্রেম একটা নদী। আসলে নদী বলে কিছু নেই অথচ
পৃথিবী ভর্তি নদীর কত নাম! কত কাব্য!
আজ তুমি একটা নদীতে স্নান করতে গেলে, কী সম্ভোগের দাপাদাপি
এক বছর পরে যাও, সেই নদীর অন্য জল, তুমিও অন্য মানুষ
ফুল আর ভ্রমরকে কতবার মেলানো হয়েছে, ফুল দু'একদিনে ঝরে যায়
ভ্রমরেরই বা কতটুকু আয়ু?
তবু ফুল ফুটতেই থাকে, ভ্রমরও আসে গুন গুনিয়ে
যেন একই ফুল, একই ভ্রমর

তরুণটি বলল, আপনি কিন্তু এখনো উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন
কবি বললেন, উপমা মাত্রই তো এড়িয়ে যাওয়া, তুমি
মধ্য গগনের কথা বলছিলে
কেন জানতে চাওনি, এই বয়সেও আমার সেই অঙ্গটি চাঙ্গা থাকে কিনা?
তরুণটি খানিকটা থতোমতো খেয়ে বলল, তার মানে, তার মানে
প্রেম শুধু শরীর, মানে এতকাল যে...
কবি তাকে বাধা দিয়ে বললেন, শরীরও এক শরীর নয়,
নদীর মতন, হৃদয়ও এক হৃদয় নয়, নদীর
মতন। অথচ সবই আছে।
যাও, সন্ধেবেলা একটা নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকো

তোমার সঙ্গিনীর কানে কানে সুমধুর শাশ্বত মিথ্যেগুলো বলো
তাকে দুঃখ দিও না,
সে-ও তোমাকে যা-দেবে, তুমি তার মানেই বুঝবে না।

নীরার কৌতুক

নীরার অভিমান আমাকে সাত জন্ম নির্বাসন দেয়
আমি সইতে পারি না, পারি না, পারি না, অন্য লোকেরা
কী ভাবে সহ্য করে?
রাস্তায় কত শুকনো মুখ মানুষ দেখি, ওদের কোনো নীরা নেই?
ওগো দুঃখী পকেটমার, এক জীবন নিঃস্ব থেকে গেলে?
হায় রাইটার্স বিল্ডিং, হায় লালবাজার, তোমরা কেউ
নীরাকে চিনলে না
কী রুক্ষ তোমাদের জীবন যাপন, কী নির্মম আত্মবিস্মৃতি!
আমি কখনও অস্ত্র হাতে তুলে নিলে নীরা এই বসুন্ধরাকে
আড়াল করে দাঁড়ায়
এক এক সময় আমি অসহিষ্ণু ভাবে বলি,
খুকী, জীবনটা শুধু ভালোবাসার ছেলেখেলা নয়!
নীরা লঘু কৌতুকে উত্তর দেয়, ভালোবাসার ছেলেখেলা ছাড়া
আর সব ফুঃ!

ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে

কী মুস্কিল, একটা ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে
উঠে পড়লুম ভুল বাসে
তারপর বদলে গেল সব রাস্তা
এত সব অচেনা ভুরু কোঁচকানো মানুষ
অন্যরকম গাছপালা, নীল রঙের বৃষ্টি হয়ে
গেল এক পশলা
বাস থেকে নামতেই বাড়িগুলি সব সাদা রঙের
এক রকমের বন্ধ দরজা
হলুদ রঙের নারীরা দাঁড়িয়ে ঝুল বারান্দায়
কোথাও ফুল দেখছি না, তবু এত ভ্রমর কেন?
ঠিকানা খুঁজব কী, একজন জিজ্ঞেস করল
তুমি কে?
আর সবাই তর্জনী দেখিয়ে হাসছে
আমার শরীর ছোট হতে হতে একটা ল্যাংটো শিশু
অগত্যা দৌড় দৌড় দৌড় উল্টো দিকে
একদম পৃথিবী পেরিয়ে...

মায়ের চিঠি

কাল সারা রাত ধরে তুষারপাত, তিন ফুট
গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করতে...
কফি ফুরিয়ে গেছে, শিট! আগে খেয়াল হয়নি
কাচের জানলার বাইরে পাতাহীন গাছের ডালে
থোকা থোকা বরফ, জাপানি ছবি
দেখলেই ভুরু কুঁচকে যায়, আজ আবার?

গরম লাগছে, মিলির বড্ড বাতিক, এতখানি হিটিং
টি ব্যাগ, জল ফুটছে, হোয়ার দ্যা হেল ইজ সুগার?
অজস্র জাঙ্ক মেইল, একটা শুধু বাড়ি মর্টগেজের
ওঃ হো, আর একখানা, মায়ের বাংলা চিঠি
মাকে একটা কমপিউটার...বারাসতে প্রায়ই লোড শেডিং
দেশটা দিন দিন উচ্ছন্নে যাচ্ছে,
রাস্তায় কেউ চাপা পড়লেই বন্‌ধ ডাকে
ই-মেইলে বাংলা চালু হয়নি
প্রত্যেক সপ্তাহেই তো তোমাকে টেলিফোন করি, মা, তবু
কেন চিঠি লেখো?
বাংলা হাতের লেখা আমি ভুলেই গেছি

খালি পেটে দিনের প্রথম সিগারেট
থ্যাঙ্ক ইউ ফর নট স্মোকিং, মিলি বাড়িতে নেই
গাড়িটা বদলাতে হবে, আবার ব্যাঙ্ক লোন
ফ্রিজ প্রায় খালি, বাজার করা হয়নি উইক এন্ডে
টুথ পেস্টও শেষ, যা খুঁজবে কিছুই পাওয়া যাবে না,
ওয়ান অফ দোজ ডেইজ
ঘড়ির কাঁটা দৌড়োচ্ছে, শিট, এখনো স্নান হয়নি
আর একটু দেরি হলেই জ্যামে পড়তে হবে,
বাম্পার টু বাম্পার, টেলিফোন বাজছে, বাজুক,
আনসারিং মেশিনে...মিলি শিকাগোয়, প্রিয়তোষের সঙ্গে
একটু প্রেম করতে চায় তো করুক
দু'খানা টোস্ট, মার্মালেডও তেতো লাগছে, আর একটা মোজা
কোথায়?
ড্যাম ইট!
আজই বসের বাড়িতে ডিনার, মনে আছে? ড্যাম ইট!
আমি কাঁদছি? ক্যান ইউ বিট ইট, আমি কাঁদছি? ড্যাম ইট!
যদি আজ অফিস না যাই, সারা দিন, সন্ধে, রাত্তির একলা একলা কাটাই?
মা, আজ আমি ঠিক তোমায় বাংলায় চিঠি লিখব!

সহসা ফিরে দেখা

একটা দেশ ছিল, মা বলে ডাকা হত
নিজের ঘরখানা কখনও দেশ নয়, পৃথিবী আবছায়া
শখের টুকিটাকি, বাইরে হাহাকার
দু' চোখ বুজে থাকা, দু' কানে তুলো গোঁজা, কেমন বেঁচে
থাকা?

বাইরে যাও তুমি নদীর ধার ঘেঁষে
স্বপ্ন দেখা নয়, শুধুই ছবি নয়, সামনে বাস্তব
শীর্ণ অঙ্গুলি, অচেনা মুখগুলি
কথার কথা দিয়ে তুমি কি ফিরে যাবে নিরালা জানলায়?

শরীর ঘোরে ফেরে, জীবন দু' রকম
একটা জানলায়, একটা মাঝে মাঝে নদীর কিনারায়
জীবন শুধু নয়, হৃদয়ে দুটি ভাগ
প্রথম আধো-চেনা, চেনারও ভ্রম হয়, দ্বিতীয় পলাতক।

কিছুটা ভালোবাসা, কিছুটা উচ্চাশা
এ হাতে পূর্ণতা, ও হাতে মরীচিকা, নিছক পাগলামি
জয়ের গরিমায় দামামা যে বাজায়
দেখেছ মুখখানা, সেও তো ঘন ঘন পেছন ফিরে চায়!

যে নিল সন্ন্যাস, সে-ও নার্সিসাস
দু' হাতে বরাভয়, নিম্ন উদরেও লুকিয়ে রাখা ভয়
এ দিকে ডিডেলাস, ও দিকে ইকারুস
স্বর্গে সশরীর যুধিষ্ঠির তবু যেমন ঢাকে চোখ।

জীবন কেটে যায়, সহসা ফিরে দেখা
নারী ও নর্মের অমৃত ছেঁচে কেন ওষ্ঠ বিস্বাদ
সত্যি? নাকি এও শখের হা-হুতাশ
মানুষ দূরে থাক, উচ্চাসনে শুধু বসাব মানবতা?

অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী

তিনতলার ওই রঙিন কাচের জানলা
সহ্য করতে পারি না পারি না পারি না
রাস্তায় ঘুরি, চটিটা হঠাৎ ছিঁড়ল
আমারই ছিঁড়বে, অন্য কারও তো ছেঁড়ে না
তিনতলার ওই রঙিন কাচের জানলা
কে থাকে ওখানে? সারা রাত আলো জ্বলেছে
চিঠিখানা এল তারিখ পেরিয়ে পরদিন
ঝাড়গ্রাম যাব, সেদিনই শহরে হরতাল
কবিতায় আসে বার বার ভুল ছন্দ
তিনতলার ওই রঙিন কাচের জানলা
কে থাকে ওখানে, সারা রাত আলো জ্বলেছে—

আমার রাত্রি বিছানায় ছটফটানি
আমার স্বপ্ন গুঁড়োয় হামানদিস্তে
ভুল ঠিকানায় কাকে যে গিয়েছি খুঁজতে
নাম মনে নেই; খোঁজাটাও বুঝি ছলনা
হে জীবন, তুমি সাতাশ বছরে ভ্রান্ত
হে সময়, তুমি প্রহেলিকাতেই দীর্ণ
সোজাসুজি পথ ডুব দিতে গেল নদীতে
কেউ কি ডাকল, কেউ না শুধুই বৃষ্টি
কোনাকুনিভাবে তাকালেই চোখে পড়বে
তিনতলার ওই রঙিন কাচের জানলা
কে থাকে ওখানে, সারা রাত আলো জ্বলেছে
সহ্য করতে পারি না পারি পারি না!

ওরা

ওরা একটা বোমা বানাচ্ছে, যাতে সব মৌমাছিরা শেষ হয়ে যাবে
মৌমাছির সঙ্গে ভোমরা, ফড়িং টড়িং-এর মতন পোকা মাকড়
আর কোনো ক্ষতি হবে না
বাঁচা যাবে। মৌমাছিরা আর হুল ফোটাতে পারবে না মানুষকে
মানুষকেও আর চুরি করতে হবে না পরের ঘরের মধু
হ্যাঁ, মধু আর পাওয়া যাবে না অবশ্য, তাতে আর এমন কী
'মধ্বাভাবে ঘুড়ং দদ্দাৎ' কথা আছে না?
মধুর অভাবে গুড়, কিংবা চিনি, চিনি তো থাকছেই
মানুষের ঠোঁটে ও জিভে মিষ্টির কোনো অভাব হচ্ছে না
শুধু ফুলগুলো ঠায় বসে থাকবে প্রতীক্ষায়
প্রেমিকের প্রতীক্ষায়
প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় বেলা যাবে, সে আর আসবে না গুনগুনিয়ে
এক সময় তারা নেতিয়ে পড়বে
প্রেম না পেলে ফুল বাঁচে না, ওরা তো আর মানুষের মতন নয়
চারদিকে তাকিয়ে দেখো সারা পৃথিবীতে আর একটাও ফুল নেই
'ফুল ফুটুক না ফুটুক তবু বসন্ত' আসবেই নিশ্চিত
ফুল টুল নিয়ে অনেক কবিত্ব হয়েছে, আর অত আদিখ্যেতার দরকার কী
আগামী শতকে ফুল ছাড়াই দিব্যি চলে যাবে
তবু যদি মন কেমন করে, ঠিক আছে, কাগজের ফুল অনেক বেশি বাহারী
আম-কাঁঠাল-জম্বুরার মতন বড় বড় ফলগুলো নাকি ছোট্ট ছোট্ট ফুল থেকে হয়?
ফুল তবে শুধু টেবিল সাজাবার জন্য নয়, কোমল হাতের জন্য নয়
ফুল নেই, তাই ফল নেই, কাগজের ফুল থেকে ফল ফলাতে পারবে বিজ্ঞান?
মা ফলেষু কদাচন
অত ফলের জন্য লোভ করতে শাস্ত্রেও বারণ করেছে
ফল বাদ যাক, আজকাল বিধবারাও তেমন ফল খেতে চায় না
আম-কাঁঠালে নীল মাছি আসে, কলার খোসায় পা হড়কায়
এসব আপদ থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে
ধান-গম-যবের দানা, এগুলোও আসলে ফল, আগে খেয়াল হয়নি

তা হলে তো একটু মুশকিল
ফুল না ফুটলে ফসলের খেতগুলোও খাঁ খাঁ করবে
দুনিয়ার সব ভাঁড়ার ফুরোলে টান পড়বে যে ভাত-রুটিতে
রুটি নেই তো কী হয়েছে, কেক খাও, কেক খাও, বলেছিলেন না এক রানি?
নাঃ, সে আপ্তবাক্যে বিশেষ সুবিধে হয়নি
ভাতের বদলে কি প্রাথমিক শিক্ষায় পেট ভরবে, বলে দিন না অমর্ত্য সেন স্যার
কিংবা ভাতের বদলে ধর্ম চুষে চুষে খাবো?
অন্ন চিন্তা চমৎকারা কা তরে কবিতা রুথঃ!
খালি পেটে কবিতা হবে না, সেমিনারে বক্তৃতা দেওয়াও যাবে না
সামান্য চাষাভুষোদের এতখানি কর্তৃত্ব মানুষের শিল্প-সংস্কৃতির ওপর?
নাঃ, মুশকিলটা যাচ্ছে না, উল্টো দিকে ফেরো, উল্টো দিকে ফেরো
ঘুরে দাঁড়াও, আগে ধরে আনো যত নষ্টের গোড়া ঐ মৌমাছিটাকে
কিন্তু এখন আর তা কী করে হবে, দেরি হয়ে গেছে দেরি হয়ে গেছে অনেক
ওরা যে আগেই বুকের মধ্যে সোনার কৌটোয় রাখা মৌমাছিটাকে
বিষের ধোঁয়ায় মেরে ফেলেছে।

আয়নার মানুষ

কেন সেই দিনটির কথা মনে পড়ছে বারবার?

সেই আমার উনত্রিশ বছর বয়েস, সেবারের সেই শীত
আমার প্রবাসী ঘরে, একদিকের দেয়াল জোড়া আয়না
সেটাই আমার একমাত্র বিলাসিতা
তার সামনে উলঙ্গ হয়ে নিজের সঙ্গে বেশ কথা বলা যায়
কদিন ধরে তুষারপাত হচ্ছে একরাশ নীরবতা ঘিরে
আমি এক শৃঙ্খলহীন নিজের স্বাধীন দরজায় বন্দি
ঘরের উত্তাপ বড় বেশি, গেঞ্জি-জাঙ্গিয়াও খুলে ফেলতে ভালো লাগে

আমার সারা গায়ে রোম, বিবর্তনের পথে কি এক ধাপ পিছিয়ে?
অনায়াসেই আমাকে এক শিম্পাঞ্জির মাসতুতো ভাই বলা যায়
সেই প্রথম নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম, কী চাও তুমি?
এই ছন্নছাড়া, ভ্রাম্যমাণ জীবন, এরপর কোন্ দিকে?
এখানে সবাই রয়েছে, কাবার্ড ভর্তি পানীয়, এবং টেলিফোন
তুললেই ছুটে আসবে প্রিয় বান্ধবী, এবং সবকিছু
জানলার ওপাশে কয়েক হাজার মাইল দূরে কলকাতা
কেন টানছে, কেন এখানেই থেকে যাবে না, কী তোমার ভালো লাগে
আয়নার মানুষ বলো বলো, কী তোমার অন্বিষ্ট?
দু'জনেরই চোখে জল আসে, একজন আর একজনকে বলে
একটাও কি সার্থক কিছু লিখে যেতে পারব এ জীবনে?

যখনই লিখতে বসি, দেখতে পাই সেই আয়নার মানুষটির কান্না...

এত প্রশ্ন, এত প্রশ্ন

শীত এলই না, বইতে লাগল বসন্তের হাওয়া
(হাওয়া'র বদলে প্রথমে বাতাস লিখেও কেটে দিয়েছি)
এবার ক্যালেন্ডারে বসন্তের আগে ভাগেই পাত পেড়ে
বসে যাবে গ্রীষ্ম
হিংসের মতন রোদ্দুর বুক চাটবে ধরিত্রীর
(ধরিত্রী, না পৃথিবী, না মাটি পাথরের বস্তুবিশ্ব?)
তা আসুক না চড়া রোদ, আমি গরম ভয় পাই না!
সইয়ে নিতে হবে গরম, আরো বাড়বে, গরম তো ক্রমশই বাড়বে
শরীর গরম, আমার নোখের ধুলোও গরম
(আরও কোনো কোনো অঙ্গ তপ্ত লোহার মতন হলেও তা
লেখা ঠিক কী?)

বাজার গরম, হাওয়া গরম, চোখ গরম, চাটু গরম
এমনকী কোনো দুঃখও আর স্যাঁতসেঁতে হবে না,
পান করতে হবে গরম গরম
(এক সঙ্গে এত গরম কি কবিতা সহ্য করে? উষ্ণ শব্দটি
যে ঠিক মানাচ্ছে না!)

দুঃখ কি পান করি, না উপভোগ, না গায়ে মাখি?
হিমবাহগুলি গলে যাচ্ছে, জ্বলছে চিরহরিৎ অরণ্য
(গুলি না গুলো? অরণ্যের বদলে বন, না জঙ্গল, না
শুধু গাছপালা?)
তার আগে দুঃখের মীমাংসা হোক, কার দুঃখ, কীসের দুঃখ
ধরা যাক, একটা সীমান্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি,
এক্ষুনি ভেঙে পড়বে রেলিং

(আগের লাইনটি আবার একটু অন্যরকম)
ধরা যাক, ঠেলতে ঠেলতে আমাদের নিয়ে আসা হয়েছে এক সীমান্তে
পাশেই একটা সুবিশাল খাদ, যেমন গ্র্যান্ড কেনিয়ান, এখানে
দুঃখের কি কোনো স্থান আছে,
না আমরা ডানা চাইব?
ধরা যাক, দরজার আড়ালে উন্মুখ নারীর সঙ্গে চকিতে
শরীর মিশিয়েছি, পাখির মতন
ঠোঁটে ঠোঁট, হঠাৎ এসে পড়ল কোনো শিশু
(আঃ ফের ঝামেলা, নারী না মেয়ে? পাখির উপমা কেন,
শিশুটি কি বাচ্চাবেলার আমি?)

ধরা যাক, সূর্য নিবে গিয়ে জ্বলে উঠল জুপিটার
সমস্ত গরমের চেয়েও গরম এক অগ্নি-নরক টান মেরেছে
মানব সভ্যতাকে

তখন কি দুঃখ নামে এক সমুদ্রে ডুব দেওয়াই
একমাত্র বাঁচা?

আচ্ছা, অঙ্ক কষা ভবিষ্যৎ থাক, কল্পনায় কাছাকাছি আসা যাক
সে রকম কোনো দিনে তুমি আর কবিতা পড়বে না? তোমাকে
আর চিঠি লিখব না?

তোমাকে ভালোবাসা জানাব কোন্ ভাষায়?
(এত প্রশ্ন চিহ্ন, এত প্রশ্ন চিহ্ন)
হঠাৎ ভেতর থেকে উঠে এল একটা প্রবল অট্টহাসি
সমস্ত প্রশ্নের গালে থাপ্পড় কষিয়ে বলল, ওরে পাগলা
এত গরম, ঘাম, নর্দমা, বিষ বাষ্প, গ্রীন হাউজ এফেক্ট
সব কিছু ছাপিয়ে এক পরিষ্কার শূন্যতায় যে ছবিখানি,
অসংখ্য হাত বাড়ানো রয়েছে সেদিকে, দেখছিস না?
একটা মালা দুলছে, একটা মালা দুলছে,
দুলছে, দুলছে, দুলতে দুলতে চলে যাচ্ছে।

চোখের এক পলক

আমার উপহার পাওয়া ডায়েরিটির বাঁ দিকের পাতায় পাতায়
রামায়ণের স্কেচ
আজকের পৃষ্ঠায় সীতা হরণের ষড়যন্ত্র করছেন মারীচের
সঙ্গে রাবণ
সীতার মুখের সঙ্গে তোমার মুখের আশ্চর্য আদল, নীরা
এই শিল্পী কি তোমাকে চেনে?
কে তোমায় অশোকবনে বন্দিনী করে রেখেছে?

কেউ না। তোমার গায়ে হাত ছোঁয়াবে, এত সাহস দশ লক্ষ
রাবণের নেই
তবু তুমি কোথায়, কতদিন দেখিনি, কোথায়, কোথায়?
বাক্য দিয়ে খুঁজি, সুর দিয়ে খুঁজি, রং দিয়ে খুঁজি
এই বিদ্যুৎ ঝলক সহসা, এই প্রগাঢ় তমস
এই হাটবাজার, এই শান্তিনিকেতনের নির্জন রাস্তা
এই অন্তর্ধান, এই সম্প্রকাশ, আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছ
বাসস্টপের দিকে
লাল রঙের চটি, ঠোঁটে লোধ্ররেণু, আঁচলে ঝড়ের ঝাপটা
রাবণ-টাবণ সব এলেবেলে, চোখের এক পলক ফেললেই
সব অন্যরকম!

নীরব সংসার

খাবার টেবিল, পাঁচটি মুখ, কিছু কথা কি
হবে না আজও বলা?
কীসের জন্য বৃষ্টি নামে, জ্যোৎস্না রাতে কেন বা ছলাকলা!
কাঁচা স্যালাড, গোলমরিচ, হাতবদল, আঙুলে নেই ভাষা
আলোর নীচে অনবরত পোকার যাওয়া-আসা
সামনে যারা দেখতে পাই না, আড়ালে মুখ কার
বেগুন ভাজায় নুন পড়েনি, নীরব সংসার
অতীত থেকে উদ্ভাসন, সে তুমি, কে তুমি
যেখানে ছিল শিউলি ফুল, সেখানে মরুভূমি
একটা-দুটো খেজুর গাছ, মাত্র একটু ছায়া
এসো বরং সেখানে বসি, ঝলসে উঠুক মায়া
ছবি-জগৎ, দু'দিকে মুখ, ভ্রমের মধ্যে চেনা
ঝগড়াঝাঁটি হোক না তবু দক্ষিণা লাগবে না!

দাঁড়িয়ে রয়েছ একা, ঠিক একা নও

নীরা, তুমি আধো অন্ধকার এক ঝুল বারান্দায়
দাঁড়িয়ে রয়েছ একা, ঠিক একা নও
জোনাকির ঝিকিমিকি, গুপ্ত চোখ, ছোট ছোট চাওয়া
বড় ঢেউ ছোট ঢেউ বাতাসের কিংবা সমুদ্রের
বালির পাহাড় ভাঙে, স্নিগ্ধ উপত্যকা
দাঁড়িয়ে রয়েছ একা, ঠিক একা নও
তোমার শরীর ঘিরে এত উষ্ণ শ্বাস
কে ডেকেছে? চাঁদ নয়, একবার মুখটি ফেরালে
এদিকে নিছক নশ্বরতা, সভ্যতার শেষ, আর অন্য দিকে
দাউ দাউ অগ্নি। ঠিক রোমকূপে আগুন শরীর
আকাশের পেট চিরে জ্বলন্ত উল্কার ছোটাছুটি
নৈঃশব্দ্যের কথকতা, দেখা যায় না বুক থেকে বুকে
এত ঝড় বিনিময়, এক মৃত্যু থেকে
আর এক সুদূর যাত্রা, নীরা, তুমি একা
দাঁড়িয়ে রয়েছ চুপ, ঠিক একা নও, অন্ধকার মধ্যযামে
ছদ্মবেশী ক্রুবাদুর কোথাও পেয়েছে মরীচিকা
দু'হাতে আচমন করে রূপ, তার পদপ্রান্তে ধর্ম, অর্থ, কাম
নিরালার নারী, তুমি টের পাওনা স্তনাগ্রে সহসা
চিবুকে, ঊরুতে কোনো ব্যর্থ প্রেমিকের ছোঁয়া, কত যে সুদূর!

সময় তখন খেলার সঙ্গী

ধোঁয়া লাঞ্ছিত শহুরে বাতাস, তবু আচমকা চাঁপার গন্ধ
এদিকে ওদিকে তাকাই ফুলের
কোনো দিশা নেই

কোনো রূপ নেই
চেনা মানুষের অচেনা চাহনি
চেনা রাস্তায়
দিক বিভ্রম
ভ্রম নিয়ে বাঁচি, ভ্রম নিয়ে খেলি, ভ্রম নিয়ে কাটে সকাল সন্ধে!

এবং মধ্যরাত্রেও খেলা, জীবনধারণ অমৃত পাত্রে
তারা জগতের একটি বিন্দু,
এই পৃথিবীর
পরিসীমা নেই
আর কেউ নেই, বিছানার পাশে নারীটিও নেই
সবই অদৃশ্য
চেতনা বিশ্বে এক মুহূর্ত, একটু হাসির শব্দ মাত্র

ঘুমের মধ্যে অন্য মানুষ, ভ্রমণে ত্রস্ত প্রতিটি অঙ্গ
ঘুমে ছায়া নেই, ঘুমে রং নেই
স্বপ্নের ঘুমে
ফুঁপিয়ে কান্না
বহুকাল মৃত পিতার সঙ্গে
সংলাপ চলে
না-বলা কথার
চোখের পলকে স্থির যৌবন, ফিরে আসে সব খেলার সঙ্গী।

কাকে যে বলি

দিনের বেলায় ছিল আঁকিবুকি জীবন, একটা কবিতা পড়ে
মন ভালো হয়ে গেল

এ কথা কাকে যে বলি, কেই বা বুঝবে!
বৃষ্টি এল কি এল না, আকাশ মেঘলা
লুপ্ত চাঁদ

আমার একটা হারানো বোতামের জন্য কষ্ট হল
এ কথা কাকে যে বলি, কেই বা বুঝবে

বুঝবে না, আসলে বোঝানো যাবে না, আত্ম পাগলামির
এ এক নিভৃত জগৎ

তোমাকে মুখোশ পরতেই হবে, ভড়ং দেখাতেই হবে,
তোমার নকল কণ্ঠস্বর
নাটকের মতন উঠবে নামবে, তুমি হাসবে

আসলে আমি যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি
কেউ বুঝবে না, বোঝানো যাবে না।

ব্যর্থতার কথা

শেখ সুলতান একটা আঙুল তুললে
তক্ষুনি আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়

শেখ সুলতান নৌকোয় আমার পাশে বসে বলল,
গরম লাগছে বুঝি, এই নাও দক্ষিণের বাতাস

আমি আশ্চর্য হই না
অনেকবার দেখেছি, অসম্ভবকে নিয়ে ছেলেখেলা করার
দিকে তার খুব ঝোঁক

ঠিক ম্যাজিশিয়ান বলা যায় না তাকে
তার আলখাল্লার মধ্যে লুকোনো থাকে না পায়রা
কিন্তু সে মাটির গন্ধ শুঁকে শুঁকে ফুলগাছ বসায়
বন্যায় ভেসে আসা শিশুর গলা থেকে ছাড়িয়ে নেয়
নীল রঙের সাপ
গোরুর চোখের দিকে সেবারে সে তাকিয়ে হাসল, অমনি
যমজ বাছুর হল
তার নিজের অবশ্য গোরুও নেই, বাছুরও নেই
কিন্তু তার অনেক রাস্তা আছে, অনেক ধু ধু প্রান্তর
অনেক নদীর নিরালা ঘাট
জঙ্গলের একটা শিমুল গাছে চড়ে সে দিগন্ত পর্যন্ত
তার রাজত্ব দেখিয়েছিল একবার
মাঝে মাঝেই দেখা হয় তার সঙ্গে
প্রত্যেকবারই সে কিছু না কিছু উপহার দেয় আমাকে
এক পশলা বৃষ্টি, মেঘ-ছেঁড়া আলো, সকালবেলার ঐকতান
শুধু একটা জিনিসই দিতে পারে না সে
তার সেই ব্যর্থতার কথা লেখা উচিত নয় কোনো কবির
দেখো শেখ সুলতান, আমি প্রতিজ্ঞা ভাঙিনি!

কবির বাড়ি

বগুড়া রোড, বাঁকের মুখে বাড়ি
টালির চাল, কাঁঠাল গাছের ছায়া
কালকাসুন্দি, হেলেঞ্চার বেড়া
শীতের রোদে ছড়িয়ে আছে মায়া।

সদর দ্বার আধেকখানি খোলা
কেউ কি আছে? বাগান বেঁচে আছে
নরম মাটি, মৃদু পায়ের ছাপ
ইষ্টকুটুম পাখিটি নিম গাছে।

কবির বাড়ি, কবি এখন নেই
শতাব্দীও ফুরিয়ে এল ক্রমে
বাতাসে ওড়ে ছিন্ন ইতিহাস
জীবন ভাঙে ইতিহাসের ভ্রমে।

কবির বাড়ি, কবি এখন সেই
তা হলে আর ভেতরে কেন যাওয়া
একটা ভোমরা গুনগুনোচ্ছে একা
শব্দটুকুই পাওয়ার মতন পাওয়া।

ভোরবেলার স্বপ্ন

রাজমোহন্‌স ওয়াইফ লেখা মাঝপথে বন্ধ করে
বাংলায় কলম ডোবালেন বঙ্কিমচন্দ্র
দেড় শতাব্দী পরে খর চোখে তাকালেন আমার দিকে
তাঁর কপালের ভাঁজ ও ভ্রূকুটি দেখে

কে না কেঁপে উঠবে?
আমি মুখ নিচু করে থাকি অপরাধীর মতন
রামধনু আঁকা আকাশের শেষ প্রান্তে উড়ে যাচ্ছে যে-সব পাখি
সেগুলি বিলীয়মান বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠা...
পাতলা বইখানা হাতে নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র বললেন,
এই নীলদর্পণ কেন লিখেছিলাম জানো?
একদিন হঠাৎ মনে হল, আমাদের তলোয়ার-বন্দুক নেই বটে
কিন্তু ভাষার অস্ত্র তো রয়েছে হাতে
তোমাদের তা মনে নেই? মনে রাখো নি?
কার্মাটায় খুব মন দিয়ে সাঁওতালি ভাষা শিখছেন বিদ্যাসাগর
এবার তিনি এই ভাষায় ব্যাকরণ লিখবেন
তাঁর কপালের ভাঁজে অনেকগুলি সিঁড়ি
বাংলার কথা তাঁর মনেও পড়ে না, মনে করতে চান না
ক্যাপটিভ লেডির নামও আর উচ্চারণ করেন না মধুসূদন
ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ সিংহের মতন পায়চারি করতে করতে
মাঝে মাঝেই বলে উঠছেন ভাঙা গলায়:
হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব...
হঠাৎ টিভি-তে হিন্দি রামায়ণ সিরিয়াল দেখে
চোখ উলটে গেল তাঁর
অজ্ঞান হয়ে ধড়াম করে পড়ে গেলেন মাটিতে
পণ্ডিতদের দিয়ে সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করাচ্ছিলেন কালীপ্রসন্ন
বাংলা মহাভারত দেশের মানুষদের বিনা পয়সায় পড়াবেনই পড়াবেন
তার জন্য জমিদারি বিক্রি হয়ে যায় তো যাক
এখন নিজেই সে মহাগ্রন্থের পাতা ছিঁড়ছেন
আর কেউ পড়বে না, আর কেউ পড়বে না
গঙ্গায় নৌকোতে যেতে যেতে বিস্ময়ে ধনুক হয়ে গেল
বিবেকানন্দর ভুরু
দু' পাশে কীসের এত ধ্বংসস্তূপ?
নিবেদিতা বললেন, এটা কোন্ দেশ, চিনতে পারছি না!

গান লিখছেন রবীন্দ্রনাথ আর গুনগুন করে সুর ভাঁজছেন
এক সময়, মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন খুব মৃদু কণ্ঠে
তোমরা দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে পারলে না?

কৃষ্ণনগরের বাড়িতে দিলীপকে গান শেখাচ্ছেন তার বাবা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
আচমকা থেমে গিয়ে হা-হা করে হাসতে লাগলেন দ্বিজেন্দ্রলাল
জানলা দিয়ে তাকিয়ে বললেন, দ্যাখ, দ্যাখ
কী ভেবে লিখেছিলাম, আর আজ তার কী অর্থ
সকল দেশের রানি যে চাকরানি হতে চলেছে এই দেশ?
আর একটু দূরে, মুর্শিদাবাদে নিখিলনাথ রায় কাতরাচ্ছেন ঘুমের মধ্যে
বারবার বলছেন, আমার বাংলা কোথায় গেল আমার বাংলা!
দর্শক আসন শূন্য, মঞ্চে একা গিরিশচন্দ্র
দু' চোখে জলের ধারা, ফিসফিস করে বলছেন,
আমার সাজানো বাগান, শুকিয়ে গেল? নাটকে নয়, সত্যি শুকিয়ে গেল?
সাজানো বাগান, আমার দেশ?

অন্য একটি মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ, পার্ট ভুলে গেছেন
দু' চোখে বিস্ময়, বিশ্বাস করতে পারছেন না নিজের কান
উইংসের আড়ালে যারা কথা বলছে, তাদের মাতৃভাষা নেই?

সুকুমার রায় 'আবার যদি ইচ্ছা করো আবার আসি ফিরে'
গানটি গাইতে গাইতে হঠাৎ থেমে বললেন বাবা উপেন্দ্রকিশোরকে
না, না, আর ফিরে কী হবে এই হাঁসজারুর দেশে

অবনঠাকুর হাত তুলে কিছু বলতে গিয়ে চিত্রার্পিত
নজরুল আর শরৎচন্দ্র হাঁটছেন একই রাস্তার দু' পাশ দিয়ে
যেন কেউ কারুকে চেনেন না
রাস্তার লোকেরাও চিনতে পারছে না তাঁদের
একটি অল্প বয়েসী রোগা ছেলে, তার কাশিতে রক্ত পড়ে

দাঁড়ালো এসে নজরুলের সামনে
নজরুল তার কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, তবু তোমায় লিখে যেতে
হবে, সুকান্ত!
তারাশঙ্করকে হাতছানি দিয়ে ডেকে শরৎচন্দ্র বললেন,
জানো, শিশির নামে ছেলেটি ইংরিজি অধ্যাপনা ছেড়ে
বাংলায় নাটক করছে?
তারাশঙ্কর বললেন, কে শিশির, আজ কেউ তাকে চেনে না
দাদা, সত্যি কথাটা শুনবেন, শতবার্ষিকী হলেই আমাদের
সবাই ভুলে যায়
নজরুল বললেন, তাই তো আমি চলে যাচ্ছি, ওপারে বাংলাদেশে!
জগদীশচন্দ্র আর সত্যেন বসু ব্যাকুলভাবে ডাকছেন ছাত্র-ছাত্রীদের
কেউ শুনছে না, বিমানে চেপে মিলিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম দিগন্তে
বুদ্ধদেব বসু চেয়ে আছেন তাঁর ক্ষত বিক্ষত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকে
কৈশোরে যার প্রেমে পড়েছিলেন, সেই ভাষাই খেয়ে নিচ্ছে তাঁর আয়ু
জীবনানন্দ কালি ঢেলে দিচ্ছেন রূপসী বাংলার পাণ্ডুলিপিতে
হঠাৎ আপন মনে বলে উঠলেন, মহাপৃথিবী না ছাই! জন্মভূমিটাই
থাকল না!
প্রেমেন্দ্র আর শৈলজানন্দ কাঁধ ধরাধরি করে হাঁটছেন
শ্মশানের বাগানে
সেখানে দিন দুপুরে চলছে প্রেতের নৃত্য
বিভূতিভূষণ দাঁড়িয়ে আছেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সামনে
বার বার ডাকছেন, অপু, অপু, ছেলেরা কেউ গ্রাহ্য করছে না
বনফুল আর সতীনাথ কথা বলতে পারেন হিন্দিতে,
লেখেন বাংলায়
এক সময় কলম থামিয়ে চেয়ে রইলেন উদভ্রান্ত ভাবে
আজ উনুন জ্বলবে কি জ্বলবে না ঠিক নেই, তবু দুর্দান্ত তেজে
কী লিখছেন মানিক
এক সময় চেঁচিয়ে উঠলেন, উল্লুকদের চিৎকার থামাও, গায়ে জ্বালা
করছে আমার
রান্নাঘরে বাঁধাকপির তরকারি চাপিয়ে এসেছেন আশাপূর্ণা

ফাঁকে ফাঁকে লিখে ফেলছেন কয়েক পাতা, কারা যেন হুড়মুড় করে
ছুটে যাচ্ছে পাশের গলি দিয়ে
ওরা কেউ কিছু পড়ে না

রেডিওর সামনে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ
শুনছেন নিজেরই গান
এখনো অনেক ছেলেমেয়ে তাঁর গান দিব্যি গাইছে
একটু আধটু সুর এদিক ওদিক হয় বটে, তবু তৃপ্তির সঙ্গেই
মাথা দোলাচ্ছেন তিনি
এক সময় খেয়াল হল, তাঁর একটা গান তো কেউ আর গায় না
সীমান্তের ও পারেও না, এ পারেও না
সহ্য করতে পারবেন না বলে এতদিন সীমান্ত দেখতে যাননি
আজ গিয়ে দাঁড়ালেন সেখানে
এখন শিলাইদহে যেতে তাঁর ভিসা লাগবে
নিজেই গলা খুলে ধরলেন তাঁর সেই প্রিয় গানটি
বাঙালির গান, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক...
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক...

এ কী, রবীন্দ্রনাথ কাঁদছেন?

অকতাভিও পাজ-এর কবিতা

কোচিন

১
সারি সারি নারকোল গাছের মধ্যে
ছোট্ট সাদা রঙের
পর্তুগিজ গির্জাটি
পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁকি মেরে
দেখছে আমাদের চলে যাওয়া।

২
দারচিনি রঙের সব পাল
শনশনে বাতাসে তুলে নেয়
শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে বুক

৩
ফেনায় তৈরি শাল জড়িয়ে
চুলে জুঁইফুল
কানে সোনার দুল
তারা সন্ধে ছ'টার প্রার্থনা সভায়
মেক্সিকো শহর বা কাদিজ-এ নয়
ত্রিবাঙ্কুরে।

৪
নেস্টোরিয়ান পেট্রিয়ার্কের সামনে
আমার ধর্ম-অবিশ্বাসী হৃদয়
আরও প্রচণ্ড উত্তাল।

৫

খ্রিস্টানদের সমাধিভূমিতে চরে বেড়াচ্ছে
অন্ধবিশ্বাসী
                    সম্ভবত শৈব
গোরুগুলো।

শেক্‌সপিয়ারের অপ্রকাশিত প্রেমের কবিতা?

অনুবাদকের কথা: গ্যারি টেইলর নামে এক তরুণ গবেষক শেকসপিয়ারের একটি অপ্রকাশিত অজ্ঞাতপূর্ব কবিতা আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করেছেন। তার ফলে বিরাট উত্তেজনা, কৌতূহল ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে সারা বিশ্বের শেকসপিয়ার-প্রেমীদের মধ্যে। চার শো বছর পরেও শেকসপিয়ার এখনও প্রায়ই সংবাদের শিরোনাম হন। শেকসপিয়ারের নামে প্রচলিত বিস্ময়কর, মহৎ রচনাগুলি ঠিক কার লেখা এ নিয়ে সংশয় এখনও পুরোপুরি মেটেনি। স্ট্রাটফোর্ড অন আভন্‌-এর যে-পলাতক বালকটি লন্ডনে এক নাট্যশালার আস্তাবলে ঘোড়ার রক্ষক হয় এবং পরবর্তীকালে অভিনেতা পদে উন্নীত হয়, সেই উইলিয়াম শেকসপিয়ারই যে অসাধারণ, কালজয়ী নাটকগুলি লিখেছেন তা অনেকেই বিশ্বাস করতে চান না। অত্যুৎসাহী গবেষকরা কখনও মার্লো, কখনও ফ্রান্সিস বেকন বা অন্য কারুকে ওই সব রচনার পিতৃত্ব দিতে চেয়েছেন। শেকসপিয়ারের কবরও খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছে। তবু অবধারিত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এর মধ্যে বহু অন্য লেখকের রচনাও শেকসপিয়ারের নামে চালাবার চেষ্টা হয়েছে। গত তিন শো বছরে অন্তত ৮০টি নাটককে শেকসপিয়ারের নাটক বলে দাবি করা হয়েছে। তার মধ্যে মাত্র একটাকে সম্ভবত সঠিক পর্যায়ে রাখা যায়। অপরপক্ষে, পণ্ডিতদের ধারণা, শেকসপিয়ারের অন্তত দুটি নাটক হারিয়ে গেছে, তার মধ্যে একটির নাম ‘লাভস লেবার ওন’।

শেকসপিয়ারের সনেটের সংখ্যা ১৫৪, এ ছাড়া তাঁর তিনটি দীর্ঘ কবিতা,

'ভিনাস অ্যান্ড অ্যাডোনিস', 'দা রেপ অফ লিউক্রিস' এবং 'দা ফিনিক্স অ্যান্ড দা টারট্‌ল' একত্রে ছাপা হয়েছিল একটি সংকলনে। এ ছাড়া তিনি আর কি কোনও ছোট কবিতা লেখেননি?

গ্যারি টেইলরের আবিষ্কারটি চমকপ্রদ হলেও এক কথায় অবিশ্বাস করাও যায় না। মাত্র বত্রিশ বছর বয়েস হলেও এই আমেরিকান যুবকটি শেকসপিয়ার-চর্চায় প্রভূত যোগ্যতার অধিকারী। সব মিলিয়ে দেখার জন্যই তিনি বড়লিয়ান গ্রন্থাগারে শেকসপিয়ারের সব লেখার প্রথম লাইনের সূচি মিলিয়ে দেখছিলেন। সেখানেই তিনি একটি লাইন দেখতে পান, ''শ্যাল আই ডাই? শ্যাল আই ফ্লাই?'' এ লাইন তিনি আগে পড়েননি। কোথায় এই লাইন আছে খুঁজতে খুঁজতে গুদাম থেকে একটি খাতা পাওয়া গেল। খাতাটি চামড়ায় বাঁধানো। লাল রিবন দিয়ে বাঁধা। খাতাটি সপ্তদশ শতাব্দীর একটি কাব্য সংকলন, কোনো অভিজাত ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য কোনো পেশাদার লেখক দিয়ে তাঁর পছন্দ মতন কবিতাগুলি লিখিয়েছিলেন। এর মধ্যে শেকসপিয়ারের দুটি কবিতা আছে, অন্যটি পরিচিত। কাগজ, কালি, হাতের লেখার বয়েস এখন সহজেই পরীক্ষা করা যায়। সে সব পরীক্ষায় খাতাটি পাশ করেছে। তা ছাড়া কম্পিউটারে রচনা পদ্ধতি পরীক্ষারও ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক লেখকেরই বিশেষ বিশেষ ধরনের শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক থাকে, তাঁদের সমগ্র রচনাবলী থেকে এই ধরনের নিজস্ব শব্দ ব্যবহার পদ্ধতি নির্ধারণ করা যায়, কম্পিউটার তা অনায়াসে বলে দিতে পারে। গ্যারি টেইলর কম্পিউটারের সমর্থন পেয়েছেন। এবং কবিতাটি তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেসের আশু প্রকাশিতব্য সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করতে চান।

অনেক পণ্ডিত যেমন গ্যারি টেইলরের আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তেমনই সংশয় প্রকাশও করেছেন কেউ কেউ। সংশয়বাদীদের আপত্তির কারণ, কবিতাটি হালকা ধরনের, মহাকবির উপযুক্ত নয়।

৯০ লাইনের এই কবিতাটি হালকা ধরনের ঠিকই। এটি প্রেমের উচ্ছ্বাসময় এক গাথা, যা অনায়াসে সংক্ষিপ্ত হতে পারত। একই শব্দ নিয়ে পান করা শেকসপিয়ারের অন্যতম মুদ্রাদোষ। কবিতাটিতে মিল দেবার ঝোঁক অত্যন্ত বেশি, তাতেই মনে হতে পারে, কোনো বড় কবি তাঁর প্রতিভা-উন্মেষের প্রথম দিকে একটা হালকা বিষয় নিয়ে ছন্দ-মিলের পরীক্ষা করছেন। বাংলায় দ্রুত ভাবানুবাদ।

আমি কি প্রাণ দেব? আমি কি উড়ে যাব?
প্রেমের প্রলোভন এবং প্রতারণা
দুঃখ প্রসবিনী?
আমি কি দূরে রবো? আমি কি কাছে যাব?
আমি কি প্রকাশিব না করি অনুতাপ
আমার আচরণ?
সকল দিক ছেয়ে তাহার রূপলেখা
আমাকে বাঁধে যেন অমর ক্রীতদাস।
যদি সে ভ্রূকুটায়   আমি যে মরি শোকে
বিষাদে ডুবে যাই,   ভুলি যে সব সুখ!

তবুও নিরুপায় আমার ভোগতৃষা
দেখাতে হবে খুলে, প্রেমের যন্ত্রণা
বাড়ে যে দিন দিন!
যদি সে হাসি দেয় নির্বাসনে যায়
আমার সব জ্বালা, যদি সে তোলে ভুরু
বিষাদে দুরু দুরু আমার সব সাধ
ওরে ও সন্দেহ, তুই যা দূরে যা
আমাকে জ্বালাপোড়া করিস নিশিদিন
সমূলে সব কিছু নিয়ে যা উড়ে যা
এখন প্রেমে আমি হয়েছি বলীয়ান!

আমার প্রিয়তমা তাকে কী দোষ দেব
দোষেরও দোষ নেই, এবার প্রমাণিব
তাহার প্রীতিকণা
যতন নিতে হবে, দেখি না সে কী বলে
সুখের আশ্বাস, কিংবা মুখ-ফেরা
অথবা পরিহাস

যা হয় হোক তবু সইব সব কিছু
যাতনা দিলে যদি সে পায় কৌতুক,
সেটুকু মেনে নেব
রূপের পাশে থাকে কিছুটা মরুভূমি
কিছুতে মোছে না তা, ভুলের বোঝা বাড়ে
ভুলের ধুলো মেশে।

যেন সে একদিন স্বপ্নে এসেছিল—
যদিও হায় সব স্বপ্ন চলে যায়
যেমন মরীচিকা—
আমার প্রিয়তমা, আমার কবুতরী
কয়েছি কত কথা, হেঁটেছি তার পাশে
নিরালা প্রান্তরে
দু'দিকে কী যে গেল, কিছুতে চোখ নেই
অনেক দূর এসে আকাশ যেথা মেশে বসেছি
সেইখানে
নিবিড় পাশাপাশি ওষ্ঠাধরে মিল
বাহুর বন্ধনে বেঁধেছি সেইখানে হৃদয় সম্পদ।

তখন সুপবন পেয়েছে কত খেলা
লোভীর মতো এসে উড়িয়ে দেয় তার
সোনালি কেশরাশি
এমন খেলা যেই দু'চোখ ভরে দেখি
অমনি চোখ যায়, রূপের ঝাপটায়
অবশ অনুভূতি
মায়ায় বাঁধা যেন দৃষ্টি থমকানো
এমন রং কোনো মানবী তনু ধরে
রূপের এই জোর হল রূপান্তর
আমার ভালোবাসা ঊর্ধ্বে উঠে যায়।

অলকদামে ঘেরা ললাটখানি তার
কোমল সমতল যেন বা মখমল
শুভ্র সুন্দর
নিপুণ ভুরুরেখা আকাশে যেন আঁকা
সেখানে জ্বলে দুটি তারকা ঝিকিমিকি
প্রেমের জয়ে জয়ী
কপোল দুটি ছেয়ে সূক্ষ্ম দেখা যায়
দুধে ও আলতায় হয়েছে মেশামেশি রূপের নব বিভা
যতই চেয়ে দেখি, ততই বাড়ে নেশা
যতই নেশা তত তৃষ্ণা জেগে ওঠে।

ওষ্ঠ দুটি রাঙা যেন বা চাঁদ ভাঙা
এমন মধুরিমা মিষ্টতর হয়
পুরুষ ঠোঁটে মিশে
সেখানে বিনিময় সুখের অধীরতা
এবং আরও চাওয়া
চিবুক যায় জিনি একটি লহমায়
বিশ্ব নিখুঁতের সকল রং-রেখা
মরাল গ্রীবা তার মসৃণতা যেন
মূর্তি ধরে আছে এমন সৌষ্ঠব।

বক্ষ উপহার তুলনা নেই তার
সুগোল চূড়া দুটি যদিও কাছাকাছি
তবুও দূর দূর
কভু কি ছোঁয়া যায় এমন সুন্দর
এমন দুর্লভ এ দুটি চুম্বক
পরশে বিস্ময়
প্রকৃতি যেন তার উজাড় করে দেওয়া

সকল গুণ দিয়ে করেছে নির্মাণ;
কোথাও নেই এক বিন্দু মলিনতা
সে যেন পৃথিবীর রূপের মহারানি।

স্বপ্নে যে প্রহর ছিলাম সমাহিত
ছিল না কোনো ক্ষোভ, ছিলাম ভাসমান
সাগরে সুখস্রোতে
চক্ষু মেলে দেখি কোথাও কিছু নেই
কোথায় ধ্রুবতারা, কোথায় সুখ এই
আঁধার নিরাশায়।
বুঝেছি সুতরাং এবারে জেগে উঠে
আমাকে যেতে হবে আমাকে পেতে হবে
হৃদয় যাকে চায়
কিছুতে দেরি নয়, নিমেষও বড় বেশি
সে যদি চলে যায় রইবে বুক ভরে অনল অনুতাপ।

Shall I die? Shall I fly
Lovers' baits and deceits,
sorry breeding?
Shall I fend? Shall I send?
Shall I shew, and not rue
my proceeding?
In all duty her beauty
Binds me her servant for ever.
If she scorn, I mourn,
I retire to despair, joying never.

2

Yet I must vent my lust
And explain inward pain
by my love breeding.
If she smiles, she exiles
All my moan; if she frown,
all my hopes deceiving
Suspicious doubt, O keep out,
For thou art my tormentor,
Fly away, pack away,
I will love, for hope bids me venter.

3

'Twere abuse to accuse
My fair love, ere I prove
her affection.
Therefore try! Her reply
gives thee joy—or annoy,
or affliction.
Yet howe'er, I will bear
Her pleasure with patience, for beauty
Sure will not seem to blot
Her deserts, wronging him
doth her duty.

4

In a dream it did seem
But alas, dreams do pass
as do shadows—
I did walk, I did talk
With my love, with my dove,
through fair meadows.
Still we passed till at last
We sat to repose us for our pleasure.
Being set, lips met,
Arms twined, and did bind
my heart's treasure.

5

Gentle wing sport did find
Wantonly to make fly
her gold tresses,
As they shook I did look,
But her fair did impair
all my senses.
As amazed, I gazed
On more than a mortal complexion
Them that I love can prove
Such force in beauty's inflection.

6

Next her hair, forehead fair,
Smooth and high, next doth lie

without wrinkle,
Her fair brows, under those,
Star-like eyes win love's prize
when they tinkle.
In her cheeks who seeks
Shall find there displayed beauty's
banner,
Oh admiring desiring,
Breeds as I look still upon her.

7
Thin lips red, fancy's fed
With all sweets when he meets,
and is granted
There to trade, and is made
Happy, sure, to endure
still undaunted,
Pretty chin doth win
Of all the world commendations,
Fairest neck, no speak;
All her parts merit high admirations

8
A pretty bare, past compare,
Parts those plots which besots,
Still asunder
It is meet naught but sweet
Should come near that so rare

Its a wonder,
No Mishap, no scape
Inferior to nature's perfection,
No blot, no spot
She's beauty's queen in election

9
Whilst I dream, I exempt
From all care, seemed to share
pleasures in plenty,
But awake, care take—
For I find to my mind
pleasures scanty
Therefore I will try
To compass my heart's chief contenting
To delay, some say,
In such a case causeth repenting.

William Shakespeare

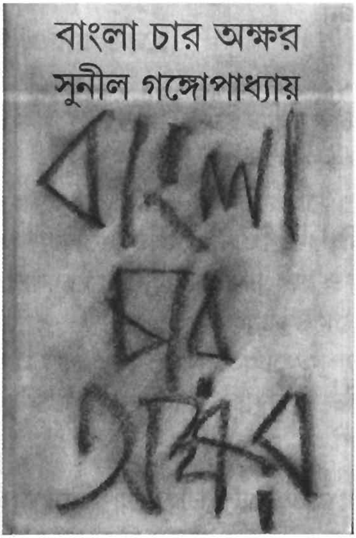

বাংলা চার অক্ষর

সূচি

হাওয়ায় উড়ছে ৭৭, অর্ধরতি ৭৮, এক জন্মের অভিমান ৭৮, এক পলক ৭৯, সীতার অগ্নিপরীক্ষা ৮০, অলীক দেখা ৮২, জয়জয়ন্তী ৮২, একটু দাঁড়াও ৮৩, মেঘমল্লার ৮৪, অন্য জীবন ৮৫, কুমারী মেয়েরা, কবিতা পড়ো না ৮৬, তুচ্ছ ছন্দ মিলে ৮৭, কলম অসহায় ৮৮, আমার বয়েস বাড়ছে ৮৯, কথা দেওয়া আছে ৯০, বহুরূপীর গীতা ৯১, ভুল বোঝাবুঝি ৯৩, বাংলা চার অক্ষর ৯৪, সিঁড়িতে কে বসে আছে ৯৫, সুন্দরের স্বপ্ন ভাঙে ৯৬, প্রকৃতির প্রতিশোধ ৯৭, সম্বোধনে মরীচিকা ৯৯, তুম্বুনিতে সেই রাত্রি ১০২, দরজার কাছে এসে ১০৩, রাশি রাশি শুকনো পাতা ১০৪, জীবনের আত্মজীবনী ১০৪, ধ্যান ভঙ্গ ১০৬, কুয়াশার মায়াপাশ ১০৭, আগমনী কান্না ১০৮, কল্পান্তের আগে ১০৯, অ-প্রেম ১১০, তবু একটা গভীর অরণ্য ১১১, স্বপ্ন ১১২, আচমকা চোখে জল ১১৩, রিঙ্কু-রঞ্জনের বাড়ির কোলাজ ১১৪, গল্প ১১৫, হিমালয়কেও দেখা যায় না ১১৬, বাজের শব্দ ১১৬, হে রাত্রি, পাথর-ভাঙা... ১১৭, রাধা ১১৮, প্রথম দেখার মতো ১১৮, মানুষ হারিয়ে যায় ১১৯

সংযোজন

কবির উপহার ১২০, কে তুমি? কে তুমি ১২১, কুসুমের গল্প ১২৪, দেশ-কাল-মানুষ ১২৬, একটি গানের খসড়া ১২৯

হাওয়ায় উড়ছে

যে-মুহূর্তে তোমার পায়ে একটা কাঁটা ফুটল
অস্ফুট কাতর শব্দে অবনত হলে তুমি
সেই মুহূর্তে, নারী, তুমি শিল্প হয়ে গেলে
কত ছবিতে, ভাস্কর্যে, বিজ্ঞাপনে তুমি চিরকালীন
তোমার সেই মুহূর্তের ব্যথা, ভয় ও অসহায়তার
কথা কেউ মনেও আনবে না
বাঃ শিল্প হতে গেলে তোমাকে মূল্য দিতে হবে না কিছু?
তুমি চাও বা না চাও, তোমার ঐ ভঙ্গিমাটিকে
শিল্প ছাড়বে না।

পুরুষদের পায়ে কাঁটা ফুটলে তা শিল্প হয় না
কাঁটা বনে যদিও পুরুষরাই বেশি যায়।

বিশ্বব্যাপী শিল্পে ভরে আছে নারীদের অভিমান
পুরুষদের অভিমান থাকতে নেই
মজার কথা এই, এসব তো আমার মতন
পুরুষদেরই রটনা
পুরুষরাই নানা যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে নারীদের
পায়ের তলায় রাখে, আবার মাথায় বসায়
দেবী নাম দিয়ে...
আমি কি নারীবাদী কবিতা লিখছি নাকি?

হাওয়া উড়ছে দু-জোড়া অশ্রুভরা চোখ ও
একটি আঁচল
হাওয়া উড়ছে হাঁটু ভাঙা সিংহের মতন
অসহায় গজরানি
হাওয়ায় উড়ছে ব্যর্থ প্রেম, অলৌকিক ব্যাকুলতা
হাওয়ায় উড়ছে ভুল বোঝাবুঝি, নারী ও পুরুষদের
কোনোদিন ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায়
মুখোমুখি দেখা না হওয়ার অতৃপ্তি...

অর্ধরতি

পায়ে চলা পথ, ঝিরিঝিরি এক নদী
মেঘের খেলায় এই আলো, এই ছায়া
ওপারে দাঁড়িয়ে যারা দেয় হাতছানি
জানি তারা সব ছদ্মবেশিনী মায়া।

স্বচ্ছ সলিল, বালিতে স্বর্ণকণা
হাঁটু গেড়ে বসি, করতলে আচমন
যে-মুখের ছবি হারিয়ে গিয়েছে কবে
জাদু আয়নায় দেখা যায় যৌবন।

মন্দ কী, হোক নদীটি মন্দাকিনী
অর্ধরতির বাকি অংশটি আজ
শেষ আশ্লেষে এখানেই হোক সারা
খুলে ফেলে সব অহঙ্কারের সাজ।

মায়া সশরীর, ঘূর্ণি হাওয়ার নাচ
নদী তোলপাড়, কালিমালিপ্ত বেলা
হে পথিক, তুমি ভুলে গেছ সব শ্লোক
মৎস্যগন্ধা বেয়ে চলে যায় ভেলা।

এক জন্মের অভিমান

দেখতে দেখতে জানতে জানতে ভাঙতে ভাঙতে যাওয়া
পৃথিবীর মতো মহাশূন্যেও কত অনন্ত বৃত্ত
জীবনটা শুধু একমুখী, তার পেছনে চক্ষু নেই

কোথাও একটু বিরতিও নেই, দু’-এক কদমও কেউ কোনওদিন ফেরেনি
সিঁড়িতে একলা বসে থাকা, চোখ হতবাক, পটভূমিতে অন্ধকার
বসে থাকাটাও থেমে থাকা নয়, আয়ুতে ঘড়ির কাঁটা।

বৃষ্টির ফোঁটা ফিরে ফিরে যায়, নদীও কিছুটা ফেরে
ঝড়-বিদ্যুৎ, বাজ গর্জন, মাটিতে শীত বসন্ত
শুধু প্রাণ, যার এত দাপাদাপি, সে মিশে যাবেই ধুলোয়
সময় এমনই হিংস্র যে তাকে কামড়ে চিবিয়ে কুলকুচি করে হাওয়া
মরীচিকা, নাকি দূরের আলেয়া, টেনে নিয়ে যায় এক দিগন্তপ্রান্তে
অসম যুদ্ধ, মানুষের কোনও হাতিয়ার নেই সেই পড়ন্ত বেলায়!

চোখ ভরে দেখা, চোখের আলোও ছায়া ছায়া হয়ে আসে
এত জানাজানি, এত কিছু শোনা, শুধুই ভ্রমের শ্রম?
অর্ধেকও কাজে লাগে না জীবনে, হঠাৎ কখন বিস্মরণের হানা
সব সাধ, সব ভালোবাসাবাসি অপূর্ণ থাকে, মাঝপথে যবনিকা
অসহায় রাগে খাক হয় মন, জলে ধুয়ে যায় ছবি
এই চলে যাওয়া, সকলেই যায়, বুক ভরা এক জন্মের অভিমান!

এক পলক

যেই এক পলক ফেললাম, দৃশ্য বদলে গেল
রোদ ঝলকাচ্ছিল না? এখন মৃদু চুম্বনের শব্দে বৃষ্টি পড়ছে
সেই বৃষ্টির রং একটি কিশোরীর ঘুমভাঙা চোখের মতন
যে-রাস্তায় ছ’জন লোক হল্লা করছিল, এখন সেখানে
শুধু এক অন্ধ ভিখিরি
পেয়ারা গাছের ডালটায় তিনটে ছাতারে পাখি নেই,
একটি মাত্র ফড়িং

বদলে যায়, এক পলকে অনেক কিছু বদলে যায়
বিনতা মাসি হাঁটু গেড়ে চোখ বুজে বসে আছেন, আগে তাঁর চোখে
চশমা ছিল না
রশিদ খান হারিয়ে গিয়েছিল, মশমশিয়ে হেঁটে আসছে রশিদ
পাশের তালাবন্ধ বাড়িটায় কেউ গলা সাধছে
মাঠের মধ্যে ফাঁকা মঞ্চ, মুখ্যমন্ত্রী সাপ-লুডো খেলছেন
তাঁর মেয়ের সঙ্গে
একটা ঘুড়ি দুলতে দুলতে গোঁত খেয়ে পড়ল পুকুরে
গেরুয়া পরা ছোট মামা মাথার চুলের মুঠি ধরে কাঁদছেন
ইস্কুলের ঘণ্টা হঠাৎ বেজে উঠল আজ ছুটির দিনে
একটু জিরিয়ে নেবার জন্য চেতন মিস্তিরি বাজাচ্ছে বাঁশি
ব্রিজের ঠিক মাঝখানে গম্বুজের মতন দাঁড়িয়ে আছে নিষ্পলক শেখ সুলেমান
সুনীল গাঙ্গুলির কলমের ডগায় প্রেমের কবিতার বদলে মৃত্যুভাবনা
চেনা মাছওয়ালা ঢোল বাজিয়ে মেতে উঠেছে হরি সংকীর্তনে
বারান্দা থেকে ঝুঁকে আছে যে-মেয়েটি, তাকে ঝাপটা দিয়ে গেল
পলাশ রঙের আলো
বদলে যায়, এক পলকে অনেক কিছু বদলে যায়
কৃষ্ণচূড়া পাতার আড়ালে একটা কোকিল শুধু ডেকেই চলেছে
কেউ সাড়া দেয় না, তবু সে ডাকে।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা

রামচন্দ্র ছিলেন নেত্ররোগী, দীপশিখা তাঁর সহ্য হত না
আর কতবার তুমি অগ্নিপরীক্ষায় যাবে, সীতা?
লক্ষ্মণকে একটি চুম্বন দিলে তেমন কিছু পাপ হত কী?
অগ্নি যে সবার সামনে তোমাকে আলিঙ্গনের সুখ ভোগ করে নিল
তা কেউ বুঝল না?

রাম বরাবরই আগুনকে ভয় পান
সীতাকে জীবনসঙ্গিনী করার মতন পৌরুষই ছিল না রামচন্দ্র বেচারির
সীতাকে উদ্ধার করার জন্যও তিনি লঙ্কা অভিযানে যাননি
লোকে কী বলবে, সেই ভয়েই তো তাঁকে অত ঝুঁকি নিতে হল
লোক, লোক, লোক, তারা সবাই হাত না তুললে সিংহাসন
ফিরে পাওয়া যায় না
বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে হারাবার মতন ক্ষমতা ছিল না
রামচন্দ্র আর তাঁর দলবলের
তাই বিশ্বাসঘাতক বিভীষণের সাহায্য নিতে হয়েছিল
সেই শুরু হল ছলে, বলে, কৌশলে, সমস্ত ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে
ক্ষমতা দখলের রাজনীতি
শ্রীরামচন্দ্রই এর প্রবর্তক
যারা রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলে তারা সবাই
ওই বিভীষণের বংশধর!
সেই প্রথমবারই যদি তুমি অগ্নিপরীক্ষা অস্বীকার করতে, সীতা?
সগর্বে অসতীত্ব মেনে নিয়ে উড়িয়ে দিতে আত্মসম্মানের জয়ধ্বজ
তা হলে হয়তো লোক, লোক, লোক, অন্ধ লোকশক্তি
আর ফিরতেই দিত না রামকে
অযোধ্যায় রামের নামে মন্দিরও গড়া হত না
এবং সেই মন্দির ভেঙে মসজিদ বানাবার বর্বরোচিত অন্যায়
এবং আবার ভাঙাভাঙির দুঃসময় থেকে মুক্তি পেত কি
এই হতভাগ্য দেশ?

অলীক দেখা

ঝড়ের যেমন একটা চোখ থাকে তেমনি নদীরও থাকে
দুটো ডানা
পাহাড় মাঝে মাঝে মাথা নিচু করে
এক দেশ সরে যায় অন্য সমুদ্রের দিকে
মরুভূমি লকলকে জিভ দিয়ে চাটে মেঘ
নারীরা মিহিন বাতাসে মিশে অদৃশ্য হয়ে যায়
এক একদিন রাত্তিরের ঝিমঝিমে অন্ধকারে বসে থেকে দেখেছি
পাথরের গায়ে ছেনি দিয়ে লেখা হচ্ছে ইতিহাস।

অকস্মাৎ শোনা যায় ছুটন্ত নক্ষত্রগুলির গগনভেদী শব্দ
বিশ্ব-নিখিলের ঐকতানে একটু একটু করে লাগছে রং
বইয়ের পৃষ্ঠায় দীর্ঘশ্বাস ফেলছে অতৃপ্ত মৃত লেখকরা
একটা পোড়ো, ভাঙা বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে
অতি বৃদ্ধ, বিস্মৃত রাজমিস্তিরি
দেওয়ালের বাঁধানো ছবি ঝড়কে ডাকছে, এসো, এসো
একদিন রাত্তিরের ঝিমঝিমে অন্ধকারে বসে থেকে দেখেছি
জোনাকিগুলি উড়ে উড়ে রচনা করছে
আমারই ব্যর্থতার ছবি
কে যেন ডাকছে, এমন অজানাতম দুঃখী কণ্ঠস্বরে?

জয়জয়ন্তী

পাঁচ মাত্রায় হেসে চলে গেল চাঁপা ফুল-রঙা সপ্তদশীটি
ট্রাম-ব্রেক কষা ধাতু-কর্কশ শব্দে বাজল কড়ি মধ্যম
সন্ধেবেলায় বাতাসে হঠাৎ এমনি এমনি শোনা যায় মৃদু
পূরবীর সুর

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আমি কি সত্যিই শুনি, অথবা কিছু না
মাঠের মধ্যে তালগাছগুলো নন্দলালের ছবির মতন
বৃষ্টি-বিকেলে তারা আর গাছ থাকে না, শুধুই ছবি হয়ে যায়...

কী লাভ এসব দেখে, বা সুরের সঙ্গে আমার শ্রবণ মিলিয়ে
জীবন যাপনে এসব তুচ্ছ, জীবন শুধুই বাস্তব, তার লকলকে শিখা
ছড়িয়ে রয়েছে লোভে হিংসায়, শিশু হত্যায়, সবুজ ধ্বংসে
সেখানে শ্রী নেই, ক্রন্দন ছাড়া কোনো সুর নেই, ক্রোধ-লোভ ছাড়া
কোনো রস নেই
ভাঙছে মাটির দেয়াল, খনির গর্ভে মিশেছে কত কঙ্কাল
রক্তপাতের এত ছলছুতো, মানুষ নামের প্রাণীরা এ গ্রহে
কেন জন্মাল
আকাশে লক্ষ গ্রহ তারকায় আর কেউ আছে, কেউ কি দেখছে?
সুজলা, সুফলা এই পৃথিবীতে মানুষ মেতেছে কাল-সংহার
দারুণ খেলায়...

গালে হাত দিয়ে এই সব ভাবি, তবু কেন শুনি অন্তরীক্ষে
বাজায় না কেউ, তবু বেজে যায়, বাঁশির শব্দে জয়জয়ন্তী!

একটু দাঁড়াও

তুমি যে-ই মাথা নিচু করলে আমি দেখতে
পেলাম তোমার পায়ের পাতা
আমি তোমার স্তনবৃন্ত কখনো দেখিনি
শুধু দেখছি কুয়াশায় অধোলীন তোমার বুকের
অর্ধবৃত্ত
তোমাকে কতবার দেখেছি

কিন্তু আমি তোমার যথার্থ নির্মাণ একবারও দেখিনি
তুমি তোমার তুমিত্ব থেকে যে-ই বেরিয়ে এলে
তার আগে আমি আমার আমিত্বের খোলসে ঢুকে পড়ে
হয়ে গেলাম চৌরাস্তার যাত্রী
এই মুহূর্তে তোমাকে চাই অথচ তোমাকে চিনতেই পারছি না
তুমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আর কার সঙ্গে যেন
চোখাচোখি করলে?
রূপান্ধ যুবার ভ্রান্তি অনিত্যকে নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলে
মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে তুমি নেমে আসছ, পেছনে সব
মন্দির ভেঙে পড়ছে
সমস্ত দেবী মূর্তি তুচ্ছ করে তুমিই শেষ পর্যন্ত একমাত্র...
দেবী নও, কী করুণ ও সাধারণ, হাহাকারময়, ক্ষীণতনু,
এদিক ওদিক তাকাচ্ছ অসহায়ের মতন...
একটু দাঁড়াও, আমি অনন্তের উজান ঠেলে আসছি
এই তো এসে পড়লাম বলে...

মেঘমল্লার

ভীমসেন যোশীর মেঘমল্লার শুনতে-শুনতে বৃষ্টি নেমে এল। অবশ্য
এ কথা আকাশও জানে, এখন বৃষ্টি না-দিলে মেঘেরা হাঙ্গার-স্ট্রাইক করে বসবে।
কোমল শুদ্ধের মধ্যে খেলা করছে দুর্জয় নিখাদ। এখনো নামেনি সন্ধে, কদম্বের
ডালে বসে আছে অতি একলা মাছরাঙা। শাহজাদির ওড়নার মতন
ঝিলমিলে বাতাস
খুশির ছলে ছুঁয়ে যাচ্ছে পুরনো লোহার দরজার বুক, ক্ষুধার্ত নদীটি এবং
একলা নদীটি আজ সহসা এমন ভাগ্যে সাজপোশাক সব খুলে নৃত্যে মেতে উঠল
ভীমসেন যোশী কি কিছু জানলেন, না বুঝলেন? ক' টাকা পেলেন এই
রেকর্ডিং-এর জন্য?

কোনো-কোনো জলসা হয় সারারাত, ভীমসেন ঘুমোবার সময় পান না। এখন অন্যের গান, ভীমসেন বসে আছেন, রাত তিনটে, ফেরার ব্যবস্থা ঠিক নেই। মদ্যপান ছেড়েছেন শোনা যায়। স্থির দৃষ্টি, হাঁটুর ওপর ধুতি শূন্য করতল। হঠাৎ নম্রবৃষ্টি, প্রতিটি ফোঁটার শব্দ তবলার বোল কিনা, তিনি ছাড়া আর কে বুঝবেন? লয় ঠিক নেই, সমে ভুল, ভীমসেন মাথা দোলাচ্ছেন আর কুঁচকে যাচ্ছে ভুরু তারপর তিনি অদৃশ্য। দরজায় কেউ যেন লাথি মেরে গেল। এখন মাঝারি মাপের মানুষেরা পরিবেশন করে যাচ্ছে মাঝারি সঙ্গীত। বিরাট বজ্রপাতের শব্দে স্পষ্ট হল্‌কতান। আকাশে
আহ্‌মদ জান থেরাকুয়া আর তাঁর সঙ্গে টক্কর দিচ্ছেন পাগলা ভীমসেন!

অন্য জীবন

বাইরে যখন ফর্সা আকাশ, মাথায় গোলকধাঁধা
অসীম যখন উদ্ভাসিত, তখন চক্ষু বাঁধা!

এসব হল ভাবের কথা, অভাব চতুর্দিকে
শরীর ভরা আগুন জ্বলে খিদেতে ধিকধিকে।

রাস্তাগুলো দিক ভুলে যায়, দুপুরে মরীচিকা
অন্ধকারে কোথাও নেই একটা কোনো শিখা?

এ জীবনের একদিকে প্রেম, অন্যদিকে অন্ন
ভাতের থালায় নুন পড়েনি, প্রেমও মতিচ্ছন্ন!

সকালবেলা মন যদি দাও বিশ্ব বিসম্বাদে
পৃষ্ঠা জুড়ে রক্তারক্তি, লক্ষ শিশু কাঁদে।

তবুও বেঁচে থাকার মধ্যে বিদ্যুতের ঝলক
ঝলসে ওঠে অন্য জীবন, দু' চোখ নিষ্পলক।

কুমারী মেয়েরা, কবিতা পড়ো না

কুমারী মেয়েরা, কবিতা পড়ো না, বিপদে পড়বে
যে-বয়সে মেঘ বেশি ডাকে তার আকাশ অন্য
কবিতার বই ভুলেও ছুঁয়ো না, আঙুল পুড়বে
কবিরা নিজেরা স্বেচ্ছায় জ্বলে লেখার জন্য।

সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দাড় করে উঠে হঠাৎ দাঁড়িয়ে
কী শুনলে তুমি? কে যেন ডাকছে অচেনা গলায়
কেউ নেই তবু হাওয়াও জড়ায় দু' হাত বাড়িয়ে
মেঘ ভাঙা চাঁদ তোমাকে ভোলায় ছলায় কলায়।

যারা কাছাকাছি, সব বড় চেনা চোখের চাহনি
এক এক সময় স্নেহ তেতো লাগে, দপ করে জ্বলো
যখন যা আসে সব ভুল, তুমি কিছুই চাওনি
বাথরুমে গিয়ে আয়নার ঠোঁটে সব কথা বলো।

কুমারী মেয়েরা, কবিতা পড়ো না, ছুঁয়ো না ও বই
ছেলেরা পড়ুক, চিঠিতে দিক না খাসা উদ্ধৃতি
বুঝে বা না বুঝে বন্ধুরা মিলে করো রৈ রৈ
কোনো একদিন সেই হাসিটাই হয়ে যাবে স্মৃতি।

যে-সব নারীরা আড়ালে, অচেনা নদীর মতন
কবিরা তাদেরই মূর্তি গড়ার ভাষা খুঁজে মরে
তাদের লুকোনো দুঃখে থাকে না ছন্দপতন
নির্মাণ খেলা সারাটা জীবন কালো অক্ষরে।

কুমারী মেয়েরা, বিপদটাকেও আচারের মতো
চেখে নিতে চাও চকিতে একলা দুপুরের দিকে?
চাখো তবে, দায়ী করো না কিন্তু, হও সম্মত
এমন মধুর সর্বনাশের জন্য কবিকে!

তুচ্ছ ছন্দ মিলে

মধ্য পুকুরে ডুব দিয়ে মাটি তোলা
দুপুর বেলায় বাজি ফেলা সেই আঁকুপাঁকু করা ত্রাস
এখন দরজা জানলাও সব খোলা
মধ্য বয়েসে ফিরে আসে সেই জলের কঠিন ফাঁস।

কৈশোর ছিল আজিব স্বপ্ন মাখা
এই লুকোচুরি, এই কান্নায় মায়ের আঁচলে চোখ
এই ভূমিতল, এই কাঁধে দুটি পাখা
নরকের খুব কাছ ঘেঁষে ছিল রঙিন অমৃত লোক!

সতেরো বছরে হয়েছিল রাহাজানি
প্রথম মৃত্যু, বিষটিষ নয়, বন্দুক বেয়নেট
করমচা-রং মেয়েটির হাতখানি
বুক ছুঁয়েছিল, আল্‌পনা পায়ে এই মাথা ছিল হেঁট।

মধ্যবয়েসে স্বপ্ন দেখার মানা
দুপুরের ঘুমে কায়াহীন ছায়া-শরীরেরা আসে ফিরে
ব্যর্থ প্রণয় মনোলোকে দেয় হানা
মুখহীন নারী চকিতে হারায় গড়িয়াহাটের ভিড়ে।

দেশ না পৃথিবী, কে যে দিয়েছিল ডাক
মনেও পড়ে না, হাঁটুর ব্যথাটা বেশি করে চাড় দিলে
সত্যি-মিথ্যে, মাঝখানে থাকে ফাঁক
কবিতা লেখায় নিজেকে লুকোই তুচ্ছ ছন্দ-মিলে!

কলম অসহায়

ছায়ার পায়ে পায়ে মানুষ ঘোরে
মানুষ নেই, তবু দেয়ালে ছায়া
কিসের গোলযোগ গলির মোড়ে
কে ছেড়ে যেতে চায় মর্ত্যকায়া!

দুঃখী সংসার জয়নগরে
মেয়েটা কাজ করে ইঁটভাটায়
ছেলেটা মাটি ছেনে মূর্তি গড়ে
দু' বেলা মুড়ি খেয়ে দিন কাটায়।

ইঁটের পর ইঁট উঁচু প্রাসাদ
সিঁড়ির ধাপে ধাপে পায়ের ছাপ
কে জানে ছিল কার গোপন সাধ
কে হাসে, কে লুকোয় মনস্তাপ?

দোকানখানি ছোট হাটখোলায়
কেন রে সেটা ফেলে মিছিলে যাস?
আগুন লাগে কেন ধানগোলায়
রক্তমাখা পথ, পুকুরে লাশ!

ছোঁয়নি কোনোদিন কাগজ খাতা
কবিতা-কাহিনীর জানে না কিছু
যখনই লিখি আমি তাদের গাথা
কলম অসহায়, মাথাটা নিচু!

আমার বয়েস বাড়ছে

ছোট ছোট আয়নাগুলো দূরে সরে যাচ্ছে
আমার বয়েস বাড়ছে, আয়নাদেরও বয়েস বাড়ে না?
ভাঙা কাচ দেখে মনে পড়ে
এই কি সেই মুখচ্ছবি?
যেন জল ভেঙে যাওয়া
জলের অতলে খুব নিঃশব্দে ডুবে যায় মুখ।
আমার জলের কাব্য সব মিথ্যে
মুখখানি বুকে বিঁধে আছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে থেমে যাই
কেউ নেমে আসছে হুড়মুড়িয়ে
শপ্‌শপ্‌ শাড়ির শব্দ, বনবিড়ালীর মতো অন্ধকারে
জ্বলে-ওঠা চোখ
কয়েকটি মুহূর্ত যেন অনন্ত, যেন সব কিছু স্থির
কে যে কাকে দেখে, কেউ চেনার পলক থেকে
অচেনা জগতে চলে যায়
আমার সিঁড়ির কাব্য সব মিথ্যে,
মুখখানি বুকে বিঁধে আছে।

আমার বয়েস বাড়ছে
নদীদের বয়েসের গাছ পাথর নেই
আমার তারুণ্যে দেখা তন্বী নদীগুলি সব
ফল্‌গু হয়ে গেল?
নগর ছড়ায়, মরুভূমিও ছড়ায়
শুধু আদিম অরণ্য কুঁকড়ে মুকড়ে যাচ্ছে সরে
শিমুল গাছের নীচে পা ছড়িয়ে বসে কেউ
বাঁশি বাজাবে না?

কোমরের ভাঁজে কলসি, লেপ্টে থাকা ভিজে শাড়ি
উরুতে বিদ্যুৎ
আমার বয়েস বাড়ছে, সে কি আরও আগে চলে গেল
আমার সময় কাব্য সব মিথ্যে, মুখখানি বুকে বিঁধে আছে।

কথা দেওয়া আছে

এখানে ওখানে জ্বলছে আগুন, তবুও তোমার সঙ্গে আমার
দেখা হবে নাকি বকুল গাছের নিরালা ছায়ায়?
সব রাস্তাই বন্ধ, মানুষ ছুটছে শুধুই দিক ভুল করে
বাতাসে ধোঁয়ার বিষের বাষ্প, কিংবা মিথ্যে কথার গন্ধ?

তবুও কি আমি দরজা-জানলা রুদ্ধ রাখব
মরুঝড়ে উট যেমন বালিতে মুখ গুঁজে রাখে
আমিও তেমন, ঝড়ে নামব না?
নদী উত্তাল, আকাশে বারুদ, প্যাঁচা ও বাদুড়
ওড়াউড়ি করে মধ্য দুপুরে
ক্ষুধিত মানুষ ধর্ম খাচ্ছে, মাথায় ও পায়ে ধর্ম মাখছে
ইতিহাস ছিঁড়ে জ্বালছে উনুন, কোথা থেকে এত হাঙর-কুমির
হাসি হাসি মুখে খেলতে এসেছে?

এত বাধা, এত যবনিকা ছিঁড়ে যেতে দেরি হবে
তোমার সঙ্গে দেখা হবে, সেই কথা দেওয়া আছে
বকুল গাছকে
যদিও বা তুমি আগে পৌঁছোও, দেখো যেন সেই
বকুল গাছটা ঝলসে না যায়!

বহুরূপীর গীতা

গোড়ালি-ডোবা কাদার মধ্যে হেঁটে যাচ্ছি গড়বন্দিপুরের দিকে
একটা অশথ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ
আকাশে উড়ছে শকুন, পুকুর হওয়া মাঠে জাল ফেলছে
এক ঠেঙো-ধুতি জেলে
এক দঙ্গল বাঁদর-সাজা ছেলেমেয়ে তাড়া করছে একটা কুকুরকে...
মাথায় ময়ূরের পালক, মুখের রং নীল ধরনের, জরির পোশাক পরা
কৃষ্ণ একমনে বিড়ি খাচ্ছে
অনেকদিন বহুরূপী দেখিনি
একটানা বৃষ্টির মাসে বহুরূপীটির বোধহয় বাজার খারাপ
কেউ আর ও-সব আমোদে পয়সা দিতে চায় না
সঙ্গীদের থামতে বলে তার সামনে গিয়ে বললুম, কী গো ভাইটি,
তুমি কি গড়বন্দিপুরে থাকো,
সেখানকার খবর কী?
হাতে সুদর্শন চক্র নেই বটে, তবু তীব্র চোখে তাকিয়ে
নব দূর্বাদলশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ যা বলতে লাগলেন, তা অবশ্যই এক
নতুন গীতা!

তোমরা বাবুরা সেখানে হঠাৎ উদয় হচ্ছো কেন গো?
ভোট আবার এসে গেল বুঝি?
হঠাৎ দাঙ্গা-টাঙ্গা লেগে গেল নাকি?
কাঁধের ঝোলায় জলের বোতল আছে, তাই না?
আমাদের গাঁয়ের জল খেলে তোমাদের ওলাউঠো হয়,
আমাদের হয় না
সাপের বিষের ওষুধ এনেছ? কালকেই আজু শেখের এন্তেকাল
হয়ে গেল
মা মন্‌সার বিষের ছোবলে!
বীজতলা রোয়ার সময় বৃষ্টি এল না
বৃষ্টি নেই, আকাশ শুকনো, মানুষের মুখও আমসি

এখন আবার শালা এত বৃষ্টি পড়ছে, পড়ছে তো পড়ছেই,
সব ভেসে গেল
এতে আর গরমিণ্ট কী করবে, গরমিণ্ট তো ভগমানের মতন
আকাশ সামলাতে পারবে না
কিন্তু ইস্কুলে একটাও ম্যাস্টার নেই, তা পাঠাতে পারো না?

আমার একজন সঙ্গী বলল, এ সব তুমি কী বলছ, বহুরূপীদা
সবই তো জানি, গ্রাম তো আর রাতারাতি বদলায় না
কিন্তু গ্রাম-পঞ্চায়েত কতটুকু কাজ করেছে, আর
আপনিই বা কী করেছেন?

এবার শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসলেন
মুখের চেহারাটা বদলে গেল, গাঢ় কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলেন
এই কলি যুগের মুক্তির উপায় বড় জটিল
একটা বিশাল গুহা, তার মধ্যে সবাই ঢুকে যাচ্ছে দলে দলে
স্বামী পোড়াচ্ছে স্ত্রীকে, স্ত্রী খেয়ে ফেলছে স্বামীকে
সন্তানরা বাবার পরিচয় না জানলেই ধর্মও জানবে না
বাচ্চারা হাতের আঙুলের বদলে পায়ের আঙুল চুষতে শিখবে
ছোট মেয়েরা অদৃশ্য হয়ে যাবে পূর্ণিমার রাতে
চোরদের ধরে এনে পদ্মবনের সামনে দাঁড় করালেই তারা কাঁদবে
কুকুরে চাটবে হিন্দু-মুসলমানের মারামারির রক্ত
তখন বিধবা লক্ষ্মী আর নীলোফার এ ওকে জড়িয়ে ধরবে
ধানের দুধ পোকায় খাবে না, আমি খাব
একটা নদী ঘরের দরজার কাছে এসে বলবে, ওগো,
আমায় রাত্তিরটা থাকতে দেবে?
একটা পুঁটি মাছ পৌঁছে যাবে সমুদ্রে
কুমিরেরা দর্জির দোকানে জামাকাপড়ের মাপ দেবে
আর আকাশ থেকে খসে পড়া একটা তারা নাচবে উদ্দাম হয়ে
তোমরা অবশ্য কিছুই দেখতে পাবে না, সবই অদৃশ্য,
হা-হা-হা, সবই মায়া!

আমি মহাভারতের খটোমটো গীতা কখনো ভালো করে
বুঝতে পারিনি
স্বয়ং বেদব্যাসও কি বুঝতে পারতেন এই নতুন গীতা?

ভুল বোঝাবুঝি

ধড়াম করে দ্রুত দরজাটা বন্ধ করার পরই মনে হল
এই ব্যস্ততা কি ভুল বুঝবে দরজাটা?
এত জোর শব্দ তো তাকে অপমান করাও বটে
তা হলে কি তুমি চাবি দিয়ে খুলে আবার যাবে ভেতরে
ধীরে সুস্থে এক পা এক পা এগোতে এগোতে ক্ষমা চাইবে?
সারা পৃথিবী তোমাকে মনে করবে পাগল।

সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড়িয়ে নামতে নামতে হঠাৎ দেখতে পেলে
একটা চড়ুই পাখির বাচ্চা চিঁ চিঁ করছে
ওপরের ঘুলঘুলিতে বাসা, বাচ্চাটা পড়ে গেছে নীচে
মা-পাখিটা ডাকাডাকি করছে ব্যাকুল ভাবে
তুমি পাশ কাটিয়ে নেমে গেলে খানিকটা
জরুরি কাজের বিশ্ব সংসার টানছে তোমার কান ধরে
তবু তুমি থমকে গেলে, ফিরে আসতে শুরু করলে
বাচ্চাটাকে ওর মায়ের কাছে, বাসায় তুলে দিলে
এখনো বাঁচানো যেতে পারে।
সেটাও কি জরুরি নয়?
মা-পাখিটা অন্য স্বরে চিৎকার করে ঘুরতে লাগল
তোমার মাথার ওপরে
এই রে, ওকি ভাবছে, তুমি বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে চাইছ?
মানুষ পাখিদের মারে কিংবা বন্দি করে, মানুষ কি পাখিদের বাঁচায়?

মা-পাখিটা ভয় পাচ্ছে, তোমার হাতের তেলোয় বাচ্চাটা, কয়েকটি মুহূর্ত,
কয়েকটি মুহূর্ত
যদি বাচ্চাটা সত্যি মরে যায়?

বাংলা চার অক্ষর

ওকে অন্য একটা সেঞ্চুরি দাও
ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ
তখন দেখবে চকমকাচ্ছে ওর আসল তেজ
বলেছিলেন কমলকুমার
তবে কি আমি এ যুগের উপযুক্ত নই?
এসব রাস্তা চিনি না বলেই এত হোঁচট খাই।
এখনও নৌকো দেখলে উচ্ছল হই। বিমানে উঠি বাধ্য হয়ে
ত্রুবাদুরদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করি, বাউল ফকিরদের সঙ্গেও
চার্বাকপন্থীদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছি
যেতে ইচ্ছে করে সমস্ত সীমান্তের ওপারে
রথের মেলায় হারিয়ে গিয়ে এক চাষির বাড়িতে শুয়ে থাকি
অন্ধ কিশোরীটিকে দেখে মনে হয় ওর স্পর্শে
আমার কপাল জুড়োবে
যখন দিনদুপুরে দেখতে পাই উল্লুকদের উৎপাত
কোমর বন্ধ না থাকলেও আমি অদৃশ্য তলোয়ার খুঁজি।

কিন্তু আমি তো ছেঁড়া চটি পরে মন্দিরের পাশ দিয়ে
যেতে যেতে থেমে গিয়ে প্রণাম করিনি কখনও
রামধনুকে জেনেছি শুধু জলবিন্দুর কারুকার্য
ফ্রয়েড, ডারউইন ও কার্ল মার্কস, এই তিন দাড়িওয়ালার
উত্তরাধিকার মেনে নিয়েছি

অনুভব করেছি আইনস্টাইনের শেষ জীবনের মনোবেদনা
ইন্টারনেটে দেখি বিশ্বকে, ই-মেইলে চিঠি পাঠাই
তবু কমলদা, আপনি ঠিকই বলেছিলেন
আমার কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না এই সেঞ্চুরিটা
কুড়ি থেকে একুশে পা, তবু সাবালক হচ্ছে না এই সভ্যতা
চতুর্দিকে কীসের এত শব্দ, অধঃপতনের?

আপনি কোন সেঞ্চুরিতে আছেন, কমলদা, তেইশ না চব্বিশ?
তখন কি বাতাসে পেট্রোল-ডিজেলের গন্ধের বদলে
বনতুলসীর গন্ধ ফিরে আসবে
শরীরের উন্মাদনাকে ঘিরে থাকবে একটা কিছু পবিত্রতা
রাত জেগে আয়ুক্ষয় করবে কবিরা
চার অক্ষরের শব্দের মধ্যে বাংলা ভালোবাসা
প্রথম স্থান অধিকার করে নেবে?

সিঁড়িতে কে বসে আছে

সিঁড়িতে কে বসে আছে মুখ ঢেকে একা?
এত অন্ধকারে এক জীবনের সারাৎসার দেখা।

সিঁড়িতে কে মুখ ঢেকে একা বসে আছে?
চিনতে পারো নি, যাও চুম্বনের ছলে ওর কাছে।

মুখ ঢেকে একা বসে আছে কে সিঁড়িতে?
সমস্ত হারিয়ে যাওয়া এসেছে ফিরিয়ে কেউ নিতে!

সিঁড়িতে কে বসে আছে একা ঢেকে মুখ?
ওর কি অতীত ছাড়া নেই কোনো বিশ্বস্ত সম্মুখ!

সিঁড়িতে কে আছে মুখ ঢেকে একা বসে?
যে চুম্বনে শেষ নেই, তাও গেছে বৃন্ত থেকে খসে!

সিঁড়িতে কে বসে আছে একা মুখ ঢেকে?
দণ্ড পল থেমে আছে, অন্তরীক্ষ দেখছে দূর থেকে!

সুন্দরের স্বপ্ন ভাঙে

নদীটি শুকিয়ে গেছে, পড়ে আছে নদীটির নাম
পূর্ণিমার চাঁদ এসে দোল খেতে গিয়ে দেখে
জল নেই, শুনশান, স্থির মধ্যযাম!
ভেঙে যায় সুন্দরের ছোট ছোট
প্রিয় স্বপ্নগুলি
ইঁদুরেরা খেয়ে নেয় প্রেক্ষাপট, রং মাখা তুলি!

সুন্দরের স্বপ্ন ভাঙে, হারায় না, ফিরে ফিরে আসে
এই বৃষ্টি, এই রোদ যেমন আকাশে।
যেমন শৈশব স্মৃতি, এ সবই তা জেদি
চতুর্দিকে যত হোক কামান গর্জন, তবু
মায়ের গলার স্বর
সব শব্দভেদী!
সুন্দর লুকিয়ে থাকে, খেলা করে একান্ত নিভৃতে
সে জানে কেউ না কেউ ঠিক এসে যাবে তাকে
বুকে তুলে নিতে।

সুন্দরের এক কণা এসে পড়ে এঁদো জলে,
কচুরি পানায়
তাজমহলের চেয়ে সেখানেও তাকে কিছু কম কি মানায়?
শুধু তো গোলাপে নয়
ঝরে পড়া শেফালির, আশ্বিনের কাশে
গরিব ঘরের চালে সে হঠাৎ কুমড়োর ফুল হয়ে হাসে
শালিক পাখিটি উড়ে যায়, কিছু শব্দ রেখে যায়
বাবুই পাখির বাসা সুন্দরের ঘর বাড়ি
এমনকী লেগে থাকে পরিশ্রমী
পিঁপড়েদের পায়
ঘুম যদি নাও আসে, স্বপ্ন ছাড়া বেঁচে থাকা ভার
বারবার ফিরে এসো সেই স্বপ্নে
সুন্দর আমার!

প্রকৃতির প্রতিশোধ

শেখ সুলেমান একটা চড় মেরেছিল নীলোফারের ভাই, বাচ্চা মজনুকে
সাতজেলিয়া থেকে মোল্লাখালি যাবার খেয়া নৌকো
এমনই কুমড়ো গাদা যে সবাই সবার গা ঘেঁষে আছে
বেশি টালমাটাল হলেই উল্টে যাবে ভরা বর্ষার রায়মঙ্গলে।
শতকরা সাতষট্টি জন যাত্রী সুলেমানের এই বেয়াদপি
মেনে নেয়নি মনে মনে
কিন্তু শেখের বিরুদ্ধে কে মুখ খুলবে, সবাই চুপ
আর শতকরা একুশ জন (হিসেবে মিলল না, তাই না?
কিছু লোক তো সব সময়ই বাইরে থাকে)
সুলেমানের সমর্থনে হেসে উঠল খলখলিয়ে

অবশ্য তারা সবাই জানে, পা মাড়িয়ে দেবার জন্য
মজনুকে চড় মারলেও
সুলেমানের আসল নজর ছিল নীলোফারের অপূর্ব দুটি
স্তনের ঢৌলের দিকে
এ রূপ দেখলে ফেরেস্তাদেরও মতিভ্রম হতে পারে
কিন্তু মাছওয়ালি নীলোফার যে বড় বেশি সতীত্বের ছেনালি দেখায়।

একটা বাচ্চাকে চড় মারলে সে ঘটনা বেশিদূর গড়ায় না
খেয়া নৌকো ওপারে পৌঁছয়, সবাই ভুলে যায়, শুধু মজনু
কুঁ কুঁ করে মৃদু মৃদু কাঁদে
নীলোফার একবার মাত্র রক্ত চোখের ঝলক দিয়েছে
সুলেমান সাহেবের দিকে
তারপর বেশ কিছুদিন আর যায় না সাতজেলিয়ার হাটে
মজনু কোথায় কেউ তার খবরও রাখে না।
শেখ সুলেমান ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং নানান কাজে ব্যস্ত
তার চোরাই কাঠের ব্যবসা, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার
সময় নেই
তা ছাড়া কেউ মুরুব্বির পা মাড়িয়ে দিলে তাকে চড় মারায়
দোষ হবে কেন?
তবু শেখ সুলেমান হঠাৎ হঠাৎ দেখতে পায়
নীলোফারের উরু জড়িয়ে ধরা কিশোরটির কান্না ভরা মুখ
খেয়াঘাটের বট গাছটা হঠাৎ তাকে বলে, ছি ছি, সুলেমান
শীতকালের আকাশের বিদ্যুৎ তাকে বলে, ছি ছি, সুলেমান
একটা লঞ্চের ভোঁ তাকে বলে, ছি ছি, সুলেমান
ফিনফিনে বাতাস তার কানে কানে বলে যায়, ছি ছি, সুলেমান
এ গ্রামের মানুষজন শেখ সুলেমানকে কিছু বলে না,
কিন্তু প্রকৃতি তাকে যেন ভূতের মতন তাড়া করছে
নৌকোর দাঁড়ের শব্দের মধ্যেও ছি ছি
গরম ভাতের থালায় ফিসফিস করে ছি ছি

যে হাত দিয়ে সে থাবড়া মেরেছিল, সেই হাতের তালুতে
লেখা ফুটে ওঠে ছি ছি
সুলেমান ক্ষমা চাইতে চায়। কিন্তু কোথায় নীলোফার, কোথায় মজনু
তারা আর দেখা দেবে না কোনোদিন।
মজনু ক্ষমা না করলে চিরকালই অদেখা থেকে যাবে
নীলোফারের বুকের ডৌল
এই দুঃখে মাটিতে গড়াগড়ি দেয় শেখ সুলেমান।

সম্বোধনে মরীচিকা

চিঠিতে তোমাকে সম্বোধন করতাম, ওগো মরীচিকা, তাই না?
তখন বয়েস ছিল তেইশ, মরুভূমিটি দিগন্ত ছড়ানো, আর
সব সময় তৃষ্ণায় আমার গলা শুকিয়ে কাঠ
তুমি কখনো কখনো দাঁড়াতে এসে ঝুল বারান্দায়
সমুজ্জ্বল দন্তরুচির হাসিতে, এক পাশে মুখ ফিরিয়ে
ছড়িয়ে দিতে ছাতিম ফুলের মতন কিছু পরাগ-রেণু
তারপরেই আমার জ্বর হত
দেখা, চেনা হাসি, কিন্তু কাছে ডাকতে না
জ্বর হলেই আমার চিঠি লেখার ইচ্ছে হত খুব
রক্ত মাখা পরাবাস্তব চিঠি শুধু এক শো চার ডিগ্রি জ্বরেই লেখা যায়
আমার সারা শরীরে মরুভূমির বাতাস, অন্তঃস্থল পর্যন্ত
দগ্ধ করে দিচ্ছে
চিঠির অক্ষরে পিণ্ডি চটকাতাম বাংলা ভাষার

কখনো কখনো তোমাকে মনে মনে রাক্ষসীও বলতাম
তোমার ঠোঁটে রক্ত, টপটপ করে ঝরে পড়ছে, আমারই রক্ত
সে রকমই দেখতাম, কেমন স্বাদ বলো তো, জিজ্ঞেস করিনি।

যেবার তুমি হঠাৎ সিঙ্গাপুর চলে গেলে কোনো ইঙ্গিত না দিয়ে
সেবারে না-লেখা চিঠিতে তিনবার বলেছিলাম, হারামজাদি!
এতদিন পর সত্যি কথা বলছি, এখন আর লজ্জা কী, বলো
ছাদে উঠে নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলাম
এর নাম কি প্রেম, না নারী-মাংস চেটেপুটে খাবার তীব্র বাসনা?
কিন্তু তুমি তো নারী নও
তুমি নারী ছিলে না, নারীর আদল, কুয়াশা ভেদ করা
এক বিমূর্ত অভিমান
না হলে সুহৃদয়ের বোন মণিদীপা কী দোষ করল
তার স্তন দুটি ও ঊরুর ডৌল তো তোমার চেয়ে মন্দ বলা যায় না
আমি বেকার জেনেও মণিদীপা আমার দিকে তরল করেছিল চোখ
একদিন সারা দুপুর কেউ নেই, মণিদীপার নাকের পাটা ফুলে গেছে
আর একটু হলেই...তুমি এসে কল্পনায় দারুণ উৎপাত শুরু করলে
তোমার কাছে আমি দাসখৎ লিখে দিইনি, যদি একটা দুপুর
মণিদীপার সঙ্গে...তারপর সব মুছে ফেলা যেত
তবু পারিনি, সেদিন তোমায় বলেছিলাম, হিংসুটে আহ্লাদী পেল্লাদি!

তুমিও আমাকে দু-তিনটে চিঠি লিখেছিলে
না, মোট পাঁচটা, ঠিক মনে আছে
কী সম্বোধন করেছ, শুধু নাম, তাই না?
তোমাদের বাড়ির কাজের লোক আর আমার নাম একই
তবু তুমি অন্য নাম দাওনি
সে সব চিঠি রেখে দিইনি অবশ্য, বিয়ের আগে নষ্ট করে ফেলতে হয়েছে
আমি জানি, আমার ছিন্নপত্রগুলিও হাওয়ায় উড়তে উড়তে
কোনো মরুভূমিতে কিংবা লবণ সমুদ্রে ছড়িয়ে গেছে
একেই বলে, সাধনোচিত ধামে প্রস্থান!
সরকারি কাজে বাইরে যাচ্ছি, এয়ারপোর্টে হঠাৎ দেখা
অনেক বছর বাদে, একটুক্ষণের জন্যে, মনে আছে?
কী সব এলেবেলে কথা হল, ইংরিজিতে যাকে বলে স্মল টক
বাংলায় আমড়াগাছি, আমার একদম পছন্দ হয় না

ওদিকে তোমার স্বামী বেচারি অতিরিক্ত লাগেজ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত
তোমরা যাবে মুম্বাই, আমি দিল্লি, আমাদের সময় আলাদা
সময় আলাদা, সময়ের মাঝখানে বিরাট ফাটল, আমরা কেউ কারুর নয়
তোমার একটা ছেলে, বোধহয় তিন চার বছর বয়েস হবে
তোমার ঊরুর শাড়িতে মুখ ঢেকে মিটি মিটি চোখে দেখছে আমাকে
সরল শৈশব অতি সাংঘাতিক, বয়স্করা দুর্বল হয়ে পড়ে
এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল, এ আমার সন্তান
হলেও তো হতে পারত
যদি আমি পেরিয়ে আসতে পারতাম একটা মরুভূমি
আমিও অবশ্য অন্য দুটি সন্তানের পিতা, তারা আমার খুবই প্রিয়
তবু ঐ বাচ্চাটা জুল জুল করে তাকাচ্ছে, কী যে মায়া হল
ওর মাথার চুলে আদর করতে গিয়েও সরিয়ে নিলাম হাত

সিকিউরিটিতে ঢোকার আগে আমি মনে মনে কী বললাম জানো?
এই নারীকে আমি মরীচিকা বলতাম এক সময়, তাই না?
ও আসলে আমার মরূদ্যান
কোনো দিন পৌঁছোতে পারিনি, কিংবা চাইনি, কিন্তু ওর অঞ্জলি থেকেই
তো জল পান করে গেছি সেই যৌবনে
শুধু ঐ টুকুই, মনে রেখো, তুমি আমার বুক মুচড়ে দিতে পারোনি
তোমার মূর্তি গড়িয়ে ভালোবাসার নামে ঘোরাফেরা করেছি
শিল্পের আশে পাশে
সব চিঠি, সব সম্বোধন, তোমাকে নয়, সেই মূর্তিকে
ঝুল বারান্দা থেকে আমিই তোমাকে নেমে আসতে দিইনি
ধুলো মাটির রাস্তায়!

তুম্বুনিতে সেই রাত্রি

তুম্বুনিতে সেই রাত্রি, মাঠের মধ্যে ঘোর অন্ধকার
বসন্ত পোদ্দার নামে দৈত্যাকার মারাঠি যুবক
আর কঠোর চেহারার কুসুমকোমল রশিদ খান
শক্তির দাপাদাপি আর সন্দীপনের জাদুবাস্তবতার প্রতিশ্রুতি
সবচেয়ে কৃশকায়, সবচেয়ে মায়াময় যোগব্রত
চাঁদ উঠবে না, আলপথে অনেক গর্ত ও রিপুভয়
হঠাৎ হঠাৎ পুরুষকারের ঠোকাঠুকি, অট্টহাসি ও
মধুমাখানো ছুরির সংলাপ
এবং গান, আমরা হাঁটছি, যে কেউ বেসুরো হবার জন্য স্বাধীন
তারই মধ্যে কোথায় ছুটে গেল যোগব্রত, একটা প্রবল
ই-ই শব্দ করে, অভিমানের কুয়াশা মেখে
আমরা থমকে যাই, সিগারেট ছুঁড়ে ফেলি
আকাশে উড়ন্ত বাদুড়, কোথাও ডাকছে প্যাঁচা, আর
কেন এত ঝিঁঝির ডাক
এগারোটি কণ্ঠে সেই পাতলা যুবকটির নাম ধরে চিৎকার করে
টুপটাপ খসে পড়ে এক একটা নক্ষত্র, উল্কা ছুটে যায়
তুম্বুনির মাঠে আমরা ডেকে চলেছি গলা চিরে
যোগব্রত ফিরে আয়, যোগব্রত, ফিরে আয়, ফিরে আয়
যুদ্ধযাত্রী পুরুষেরা হাহাকার করছে একজনের জন্য
অভিমান ছাড়া যার আর কোনো হাতিয়ার নেই।

দরজার কাছে এসে

দরজার কাছে এসে কে দাঁড়িয়ে আছে
ভিজে-পা খালি-পা এক নারী

তোমার তো দেখার দরকার কিছু নেই
তুমি থাকো সহস্র ব্যস্ততা-নির্বাসনে
ঠান্ডা হোক সকালের চা, তুমি খাও চিঠির কাগজ
তুমি খাও টেলিফোন, তোমাকেও খেয়ে নিক কিছু লোভী চোখ
বিভিন্ন হাতের পাঞ্জা, মানুষের ভাষা।

দরজার কাছে এসে কে দাঁড়িয়ে আছে
ভিজে-পা খালি-পা এক জনমদুখিনী

কে ডাকছে? এগারো রকম কণ্ঠস্বর
একই উত্তর
শরীর জাগ্রত, অন্য শরীরের টান
রং দিয়ে মুছে দাও, কিংবা থাকো ঘুমের গভীরে
জামার বোতাম একটা অসময়ে ছিঁড়ে যেতে পারে?
দু'আঙুলে ছুঁয়ে দিলে বুক।

দরজার কাছে এসে কে দাঁড়িয়ে আছে
ভিজে-পা খালি-পা এক জীবনসর্বস্ব।

রাশি রাশি শুকনো পাতা

সবাই অনেক কিছু জেনে গেছে, যে-সব জানার কোনো
দরকারই ছিল না
এত সব অকিঞ্চিৎকর জানার আবর্জনা ভর্তি মাথা
তাই তো পদক্ষেপে মাঝেমাঝেই থাকে না নিজস্বতা

সমস্ত রাস্তাই যদি চেনা হয়ে যায়, তখনও
উন্মুখ প্রতীক্ষায় থাকে কয়েকটি অচেনা
স্বপ্নগুলোও সরল, সাদাসিধে হয়ে গেলে
আর বেঁচে থাকারই কোনো মানে থাকে না।

এই দেশের বুকের মধ্যেও রয়েছে একটা গোপন দেশ
পরিচিত মানুষের ভিড়ে একটি রহস্যময় মুখ
গণ্ডি এঁকে ঘিরে রাখা নারীর আঁচল ওড়ে, ঢেকে দেয় চোখ
আর তখনই সমস্ত গণ্ডির বাইরে ছুটে যায় অসংখ্য পলাতক
একটি মৃত নদীর গর্ভে শোনা যায় কুলুকুলু ধ্বনি
বাতাসে কীসের ঘ্রাণ, যেন যাত্রা শুরু হবে আবার
শৈশব থেকে, কিংবা মধ্য বয়েস থমকে গিয়ে ঘাড় ফেরায়
গাছের মতনই পাতা ঝরে, পাতা ওড়ে, রাশি রাশি
শুকনো পাতা...

জীবনের আত্মজীবনী

আমার একত্রিশতম পূর্বপুরুষ
যখন একটি ছটফটে নদীর পাশে, ভর দুপুরে
খোলা মাঠে তার ছ'নম্বর রমণীটির সঙ্গে

চিৎ-উপুড় খেলায় হাঁপাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই
হঠাৎ তাঁর পিঠের ওপর এসে বসল একটা বাজপাখি।
কী ঝামেলা!
বাজপাখিকে সরিয়ে দেওয়া যায় না, খেলাও বন্ধ করা যায় না
তখন নাকি আবার আকাশে আগুনের ছড়াছড়ি
দুই দিগন্ত থেকে ছুটে আসা ঝড় রং বদলাবদলি করছিল
ঘুমন্ত পাহাড়ের গায়ে ঘাস-আগাছার মধ্যে তুঁত বরণ ফুল
আর অনন্ত অবাক-চোখে ফড়িং
পায়রারা তাদের ঠোঁটে ধরে ধরেই খেয়ে ফেলছিল কচকচিয়ে
এই সবের মধ্যে হল কী
আমার ত্রিশতম ঠাকুরদা জন্মালেন অষ্টাবক্র হয়ে
তাঁর চেহারাটা শালিক-শালিক আর ভেতরে
বাজপাখির আত্মা!

এই সবই লেখা আছে ধারাবাহিক জিনের আত্মজীবনীতে
আর সব আত্মজীবনীতেই কিছু কিছু ভুল থাকে ইতিহাসে
আগুন? না, সে সময়ের আকাশ ছিল ভবঘুরে সাদা
মেঘে ঢাকা?
হয়তো ঝড় ছাপিয়েও শোনা যাচ্ছিল মান ভাঙার গান
পায়রাগুলো সত্যিই হিংস্র ছিল? এখন তারাই
শান্তির পতাকায় পতপত করে
আমার নারীর কাছে, আমি, এক এক সময়
কী যে হয়, বাজপাখির মতন ডানা ঝাপটাতে যাই
সে খুব শান্ত, নীল স্বরে বলে, দেখো,
সরবিট্রেট রেখেছ তো জিভের তলায়?

ধ্যান ভঙ্গ

আমার সেই অরণ্য প্রবাসে, উপবাস-খিন্ন দেহের সামনে
তুমি পায়সান্নের বাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে না?
গাছতলার আলো ছায়ায় আর কেউ ছিল না
আমার সমস্ত শরীরময় ক্ষুধা
তবু আমি প্রথমেই সুঘ্রাণ চরুর জন্য লোভ করিনি
আগে দেখেছি তোমার পায়ের পাতা
পদনখে কয়েক সহস্র চাঁদ, আলতা রাঙা গোড়ালি
মাঝখানে লাল রঙের পৃথিবী
তারপর দুটি পা বেয়ে ওঠা হিলহিলে লাবণ্য
চালতা ফলের মতন গুল্ফ, ভাঙা পর্বতশৃঙ্গের
মতন জানু
ছাল ছাড়ানো কলা গাছের মতন ঊরুদ্বয়
হে রম্ভোরু, আমি কেঁপে উঠেছিলাম
কোথায় গেল আমার ক্ষুধা ও ক্ষুদ্র তৃষ্ণা
তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলে সুমেরু
আড়াল করে
নাভিতে মেঘলুপ্ত চাঁদ
কী গভীর রহস্যময় যোনিদেশ
যেন বিষাদময় এক ঝর্নার উৎসমুখ
মরাল গ্রীবার মতন তোমার দুটি হাত
সদ্য ফোটা পদ্মের মতন দুটি সুগন্ধ স্তন
না, তোমার হাতে ধরা সোনার পাত্রটি আগে দেখিনি
দেখেছি তোমার ময়ূর-নিন্দিত গ্রীবা, দেখেছি
তোমার শিশু-সারল্যের থুতনি
নদীর বাঁকের মতন দুটি চোখ
উড়ন্ত ভুরু, দৃষ্টিতে বৃষ্টিস্নাত রোদ...

কীসের জন্য কেন যে বেঁচে আছি, তা জানি না
'অয়ি' বলে তোমাকে ডাকতে ইচ্ছে হয়
আর ফিরে আসবে না?
সমগ্রতায় যদি নাও আসতে পারো
শুধু দুটি রক্তিম পায়ের পাতা
নাভিতে সদ্য বিলুপ্ত চাঁদ, ভুরুতে অচিন পাখি
দাঁড়িয়ে থাকার নিস্তব্ধ সঙ্গীত, ঊরুর বিষণ্ণতা
কিছু একটা দেখা দাও
ধ্যান ভেঙে বসে আছি, দেখা দাও, দেখা দাও!

কুয়াশার মায়াপাশ

ঝড় উঠবার আগেই সে কেন হঠাৎ হারিয়ে গেল
নৈরাজ্য বা বিপর্যয়ের জন্য একটু অপেক্ষা করল না
আকাশ যখন মেঘের সঙ্গে মেতে ওঠে সংঘর্ষে
তখন চতুর্দিকেই তো চলে এলোমেলো আনাগোনা।

যারা কাছে ছিল তারা কোন্ টানে চলে গেল খুব দূরে
একা বসে আছি সারাটা বিকেল রোদ ঝলমল ছুটি
কিংবা আমিই জ্যা-মুক্ত এক তিরের মতন বেগে
কিছুই না জেনে বাতাসে রেখেছি ব্যর্থ বজ্রমুঠি!

মায়ের সঙ্গে দেখাও হয় না, বাবার ছবিটি ম্লান
কৈশোর যেন সাদা কালো ছবি, উইধরা অ্যালবাম
সুন্দর, তুমি পাঠালে আমায় অলীক অন্বেষণে
যেখানে যেখানে আঙুলের ছোঁয়া ব্যর্থ মনস্কাম।

কেউ কি হারিয়ে গিয়েছে, অথবা আমিই এখানে নেই
এই যে আকস্মিক সন্ধ্যায় শুরু হয় হা-হুতাশ
ঈষৎ নেশায় মনগড়া সব দুঃখেরা উদ্বেল
সব দুঃখই নদীসঙ্গমে কুয়াশার মায়াপাশ!

আগমনী কান্না

সভ্যতার সঙ্কটের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ মনে হয়
রবীন্দ্রনাথ যদি আজ বেঁচে থাকতেন
অমনি শুনতে পাই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ
শেষ রাতে স্বপ্ন দেখি পিকাসোকে
আবার গের্নিকা আঁকছেন
ঘুম ভাঙার পরও ঘোর কাটে না
দেয়ালে লেনিনের ছবির চোখ দুটো মনে হয় জীবন্ত
যেন কিছু বলতে চাইছেন তিনি
জানলার বাইরের উন্মত্ত চিৎকারে কি মাথা খারাপ
হয়ে যাচ্ছে আমার;
ওঁরা তো কেউ নেই, অনেক দিন নেই
চলে গেছেন বার্ট্রান্ড রাসেল ও গান্ধীজি
চার্লি চ্যাপলিন নেই, চলে গেছেন সত্যজিৎ রায়
পল রবসন, বড়ে গুলাম আলি খান
মাদার টেরিজা আর মার্টিন লুথার কিং
যাঁদেরই কথা মনে পড়ে, সবাইকে খেয়ে নিয়েছে
বিংশ শতাব্দী
তা হলে এই নতুন শতাব্দীতে সুস্থতার ভরসা চাইব
কার কাছে?

পরের মুহূর্তেই শুনতে পাই
সদ্য জন্মানো পঞ্চান্ন হাজার শিশুর আগমনী কান্না...

কল্পান্তের আগে

কাছাকাছি সব কিছুর মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়ছে দূরত্ব
দূরত্ব শব্দটাই অনবরত জ্বালাচ্ছে আমাকে
যা-ই লিখতে যাই, কলমের ডগায় পিঁপড়ের মতন দূরত্ব এসে যায়
তবে কি শুরু হয়ে গেল কল্পান্ত?
মাথা তুলছে ডুবো পাহাড়, মেঘের সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে
শিকড় সমেত গাছপালা
অতিকায় প্রাণীর মতন সহস্রাব্দ ল্যাজ আছড়াচ্ছে
পাশ ফিরে
এমনও কি হতে পারে, দিন-দুপুরে যা আমার চোখের সামনে জীবন্ত
তা অন্য কেউ দেখছে না?

ময়দানে ঘাস ছিঁড়ে মুখে দিচ্ছে জামার সবক'টি বোতাম খোলা ছেলেটি
আর মেয়েটির শাড়ির পাড়ের বাইরে রক্তাভ পায়ের পাতায়
বিন্দু বিন্দু শখের দুঃখ
ওরা অন্য কিছু দেখছে না, ওদের মধ্যেও কি উঁকি মারছে দূরত্ব
নইলে সন্ধে হবার আগেই ও কীসের, পর্বতের মতন দীর্ঘ ছায়া?
তবে কি শুরু হয়ে গেল কল্পান্ত?
নদীরা সব দল বেঁধে ফিরে যাচ্ছে বাপের বাড়িতে
মাথা তুলছে ডুবো পাহাড়, মেঘের সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে
শিকড় সমেত গাছপালা
ধান-ক্ষেতে পড়ে আছে এত গুঁড়ো গুঁড়ো স্বপ্ন...

হঠাৎ শহরটা বিনা যুদ্ধে ব্ল্যাক আউট ঘোষণার মতন
অলীক হয়ে যায়
চোখের নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে এক-একটা রাস্তা
গুলি ভরা পিস্তল নিয়ে যে ছুটছে, তারই পিঠে
লাগছে প্রথম গুলিটা
নিভে যাওয়া বাতিস্তম্ভের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল
চকখড়ির মতন মুখওয়ালা একজন মানুষ
কী অসম্ভব ঠান্ডা চোখে সে খুঁজছে কোনও পাশা খেলার সঙ্গী
মেঘের গুরু গুরু ডাকে শোনা যাচ্ছে সমস্ত নিয়ম ভাঙার আহ্বান
তবে কি শুরু হয়ে গেল কল্পান্ত?

ময়দানে বোতাম খোলা ছেলেটি আর একটু দাঁতে কাটুক ঘাস
মেয়েটির চোখ থাক না কান্নাভেজা, রুমাল ছোঁয়াবার দরকার নেই
আরও কিছুক্ষণ, আরও কিছুক্ষণ
বিশ্ব-সংসার চোখ বুজে থাকো
দূরত্ব, তুমি থমকে দাঁড়াও!

অ-প্রেম

ভালোবাসা ছিন্ন করে চলে যাওয়া তেমন শক্ত না
অনেকেই যায়, তারা কোন দিকে যায়, নিরুদ্দেশে?
রক্ত সাগরের তীরে জাহাজ অপেক্ষমাণ, অথবা রক্ত না
কালো হ্রদ, দুর্নিবার মেঘ ঝঞ্ঝা দিগন্তের শেষে।

বুকের ভেতরে মেঘ, যার অন্য নাম অভিমান
পায়ের তলায় ফুল, কিংবা পিঁপড়ে দলে পিষে যাওয়া
ভালোবাসা তাও নয়, আরও পলকা, একটি ফুৎকারে খান খান
মরুভূমি জেগে থাকে, শিয়রে সশস্ত্র ঘোরে হাওয়া।

তবু একটা গভীর অরণ্য

জঙ্গল ক্রমশ কমে আসছে ঠিকই, তবু একটা গভীর অরণ্য
বেশি দূর যেতে হয় না, মাঝে মাঝে খুব কাছে আসে
নীরব পাঁশুটে গাছ, হাতছানি দেয় ছোট-বড় পরগাছা
পায়ে চলা সরু পথ, মাঝে মাঝে ঘোর অন্ধকার
জঙ্গল ক্রমশ কমে আসছে ঠিকই, তবু একটা গভীর অরণ্য—

বাতাসে কীসের শব্দ, বিন্দু বিন্দু আলো নয়, উড়ন্ত স্ফুলিঙ্গ
পাতা-পোড়ানিরা সব বৃত্ত হয়ে বসে আছে দীর্ঘ চুল মেলে
কেউ কারো দিকে চায় না, শোনা যায় দ্রিমি দ্রিমি ধ্বনি
এক দৌড়ে বাইরে আসা যায়, তবু পিছুটান গেঁথে থাকে পিঠে
জঙ্গল ক্রমশ কমে আসছে ঠিকই, তবু একটা গভীর অরণ্য—

ভাতের থালায় এসে উড়ে পড়ে পোকা ধরা অজানা বৃক্ষের
জীর্ণ পাতা
সিঁড়ির তলায় লম্বা সাপ আর পাহাড়ি ইঁদুর খেলা করে
খেলার ওদিকে আমি, বাড়িখানা ভাঙা মন্দিরের মতো নিথর নির্জন
একদা যেখানে ছিল ঝর্না তার শুকনো খাতে দিকহারা ফড়িঙের ঝাঁক
পাথরের খাঁজে বসে থাকা যায়, হাওয়ায় অসংখ্য দীর্ঘশ্বাস
জঙ্গল ক্রমশ কমে আসছে ঠিকই, তবু একটা গভীর অরণ্য
মাঝে মাঝে কাছে আসে, অথবা স্বেচ্ছায় তার গাঢ় তমসায় ছুটে যাই!

স্বপ্ন

সাত পা এক সঙ্গে হাঁটা, তারপর স্বপ্ন দেখা শুরু
যখন তখন, দিন দুপুরে, রান্না ঘরে, বাথরুমে জলের ধারায়
স্বপ্ন বদলে যায় বারবার
তুমি মেয়ে চেয়েছিলে, আমি কেন ছেলে চাই
নিজেই জানি না
দেখো, যে এসেছে সে যে দু'জনেরই
দু' চোখের মণি
হামাগুড়ি দিতে দিতে টলটলে পায়ে দাঁড়িয়েছে
এখন দুধের গ্লাস নিজে ধরতে পারে, কী দারুণ
চমৎকার দুষ্টুমি শিখেছে।
এবার ইস্কুলে যাবে, মামণি ইস্কুলে যাবে
তুমি কিংবা আমি পৌঁছে দেব, কিন্তু কে আনবে
স্কুলবাস অ্যাদ্দুর আসে না।

আবার সে স্বপ্নটাই ফিরে ফিরে আসে
আমাদের চার দেয়াল, আমাদের নিজস্ব বারান্দা
ঘিঞ্জি বসতিতে নয়, শহরতলিতে নয়
নতুন রাস্তায়
অফিস যাবার পথে রোজ দেখি। সার সার বাড়ি উঠছে
তিনতলার ফ্ল্যাট
পুরোটা দক্ষিণ খোলা, বড় বড় জানলা সব দিকে
দেখো, দেখো, মেঝেটা কী ঠান্ডা, আর দেয়ালগুলোও
বেশ দূরে দূরে
রং বদলাতে হবে, যেমন দেখেছিলাম ভোরবেলা
কাঞ্চনজঙ্ঘায়
মামণি, দেয়ালে তুমি খবরদার পেনসিল দিয়ে
ছবি আঁকবে না
টবে ঝুলবে মানি প্ল্যান্ট, এবং মায়ের ঘরে রামকৃষ্ণদেব

খাঁচার ময়না পাখি, মা ওটা আনবেনই,
যখন তখন কথা বলে
দরজায় বেল বাজলে বলে ওঠে, কে এল গো? এসো, বসো
চা খাও, চা খাও!
কী মুশকিল, ওর জন্য কলের মিস্তিরি আর পিয়নকেও
চা খাওয়াতে হয়।

আচমকা চোখে জল

একদিন যারা খুব কাছাকাছি ছিল, এখন তারা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে
কেউ কেউ অদৃশ্যলোকে
এটা নতুন কিছু নয়
কোনো সময়ে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রগুলোও তো জড়ামড়ি করেছিল
একান্নবর্তী পরিবারের ভাইবোনদের মতন
তারপর আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে যেমন হয়, একটু একটু ব্যবধান
তারপর তাদেরও আলাদা আলাদা বৃত্ত
কয়েক ঋতুর অদেখা, ক্রমশ আলোকবর্ষ
এখন গোটা মহাবিশ্বই বেলুনের মতো ফুলছে
অস্তিত্বগুলো পালাচ্ছে যে যেদিকে পারে
কেউ কারুর দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না
মুছে ফেলছে পূর্বস্মৃতি, পিছুটান নেই, এমনকী
রেয়াত করছে না মাধ্যাকর্ষণও
একদিন এই বেলুনটা হঠাৎ ফেটে গিয়ে সবাই ডুবে যাবে
মহাকাল সাগরে
এই ধাবমানতাই ডেকে আনবে অন্তিম পরিণতি
আমার প্রতিটি পরমাণুতে বহন করছি
সেই দূরত্ব সৃষ্টির বিশ্ব ইতিহাস...

হে মহাকালের প্রবাহ, তোমাকে দেখতে পাই না
তবু কেন আচমকা চোখে জল এসে যায়
এক একটা অশ্রুবিন্দু নিজেই জিভ দিয়ে চাটি!

রিঙ্কু-রঞ্জনের বাড়ির কোলাজ

হলুদ রঙের ডুবো-তরী, কে আসছে কে যাচ্ছে,
কেউ ভাসছে নীল বাতাসে

সিঁড়িতে বসা দুই কিশোর, বাংলা গলায় স্পেনীয় গান,
টুঙ্গি ঘরে ছবির পর ছবি

এই সকাল, এই বিকেল, কয়েকখানা মহাদেশের
গল্পে মেতে থাকা মধ্যরাত

কাজের মেয়ে কবিতা পড়ে, ফোন বাজছে,
মোটর সাইকেলের শব্দ হঠাৎ দরজায়

দৃশ্য ও অদৃশ্য জীবন, অতীত এবং ভবিষ্যৎ গলা জড়িয়ে
খুলছে সব জানলা

একটি বিন্দু আলো কিংবা অন্ধকার, একটি বিন্দু বহুবর্ণ
এক-একবার হাতের মুঠোয়, এক-একবার
শূন্যে

হলুদ রঙের ডুবো-তরী, কে আসছে, কে যাচ্ছে,
কেউ ভাসছে নীল বাতাসে...

গল্প

রঞ্জন গল্প শোনাচ্ছে গল্পরাও নির্মাণ করছে রঞ্জনকে
একতাল মাটি গড়া মূর্তির মতন মাঝে-মাঝে
বদলে যাচ্ছে তার মুখের আদল
নিপুণ শিল্পীর মতন গল্পগুলি পরীক্ষায় মেতে আছে
রঞ্জনের গাত্রবর্ণ নিয়ে
আমরা চেয়ারে বসে আছি, চেয়ারগুলো বসে আছে আমাদের
কোলে রেখে
যেমন আমরা বিছানায় শুলে বিছানারা আমাদের নিয়ে
ঘুমোয়
গল্পের চরিত্ররা মাঝে-মাঝে এসে ঘুরিয়ে দিচ্ছে
কাহিনীর মোড়
মাসতুতো বোন ও প্রবাসিনী বউদিরা ভাঁজ করে দিচ্ছে
সময়
পুরনো গল্পেরা খুলে ফেলছে পোশাক
নিরুদ্দিষ্টরা ফিরে আসছে সমুদ্র পেরিয়ে
বাবা বয়স কমিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছেন ছেলের থেকে
স্ত্রী ফিরে গেছে, মিলিয়ে গেছে কৈশোর প্রেমিকায়
সময় থেমে থাকে না, সময় পেছনে ফিরেও যায় না
অপরিকল্পিত এক একটি গল্প রঞ্জনের বুক
থেকে উঠে এসে কণ্ঠস্বরের অলিগলি ও সেতু
পেরিয়ে
বেরিয়ে আসছে খোলা মাঠে, যেন বিগত ও
অনাগতদের নিয়ে লোফালুফি
খেলছে রঙিন বেলুনের মতন
বেলুনের পেটে বেলুন, সহস্রার পদ্ম, পাপড়ি মেলে
দিচ্ছে, উড়ছে বাতাসে।

হিমালয়কেও দেখা যায় না

কোথাও একটা হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি ভাঙছে ভাঙুক
আকাশে তবু ডেকে যাচ্ছে একটা রাতপাখি।

রাস্তাগুলো রিপুভয়ের জন্য রোজই বদলাচ্ছে দিক
দিকভ্রান্তের নিজস্ব রাস্তাটাই অদৃশ্য!

এবার তবে জলে নামবে, মুছবে পদচিহ্ন?
ভালোবাসার জড়ুলে তবু লেগে থাকবে রক্ত।

পিছন ফিরে তাকাও, ছুটে আসবে হাজার প্রশ্ন
খড়ের গাদায় সুচ খুঁজছে অন্ধ ত্রিকালদর্শী।

প্রশ্নগুলি বীর্য হয়ে যাবে নারীর গর্ভে
একটি হাসির ঝিলিকে সব ক্ষণকালের শিল্প।

যেমন তুমি দাঁড়াও এসে আমার চোখের সামনে
হিমালয়কেও দেখা যায় না, আর তো সবই তুচ্ছ!

বাজের শব্দ

স্নান করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে মেল
ট্রেনের মতন ছুটে আসছে খিদে, অথচ কয়েক
লাইন লেখা বাকি। এই সময় হঠাৎ যদি
একটা প্রচণ্ড
বাজ পড়ে? তাহলে আমি মেল ট্রেনটাকেই

খাব, না-লেখা লাইনগুলো স্নান করবে,
আর বাজের মধ্যে শিশুর কান্নার মতন একটা
শব্দ শোনা যাবে, খিদে, খিদে, খিদে!

হে রাত্রি, পাথর-ভাঙা...

হে রাত্রি, পাথর-ভাঙা, শিকলের ঝনঝনানি আর কতক্ষণ?
পুকুরের ধারে নিচু চাঁদ
পুকুরের ধারে নিচু চাঁদটাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে
খয়েরি খরগোশ
তালপাতার উড়ন্ত শাম্পানে ভেসে গেল একটি আকুল মূর্ধজা
কান্নাপরী
জানলায় কাচ নেই, কে দাঁড়িয়ে রয়েছে এত একা?

চোখ গেল পাখিটির সঙ্গে চোখ গেল
স্বর্গ উত্থানের সিঁড়ি ভগ্নস্তূপ হয়ে পড়ে আছে
চলে যাবে?
বুক ভরা এত ভালোবাসা, আহা, কতখানি খরচই হল না
আগুন কি ভালোবাসা চেনে?

রাধা

কোন ঘাটে যাবি রাধা, যে-ঘাটে রয়েছে
কালো বাঘটা ঘাপটি মেরে?
আর সব ঘাটে দেখ, দু' পয়সার বিকিকিনি
ঠিকঠাক চলেছে
পারানিরা চেনা শুনো, কড়ি বুঝে নেয়,
ঘর গেরস্থালি সব অবিকল থাকে
তুই কেন যাস সখী জেনে শুনে ভুলপথে
বাঘের খপ্পরে?
ও রাধা আয় রে ফিরে, আমরা সবাই
বসে আছি এই
যমুনার তীরে।

রাধার কোমর থেকে গাগরি উছলে ওঠে
দু'পায়ের মলে যেন লেগেছে তুফান
বাঘটা ডাকেনি তাকে, চুপ করে চেয়ে আছে
কে ডেকেছে, কে টেনেছে তাকে?
বুকে হাত দিয়ে দেখে, উথাল পাথাল, যেন
সমস্ত সংসার নিরুদ্দেশ
নীবিবন্ধে এ কী জ্বালা, দূর ছাই, এ মরণে
কত সুখ, কেউ তা জানবে না!

প্রথম দেখার মতো

প্রতিবার দেখা, কিছু নীরবতা, প্রথম দেখার মতো
নম্র গোধূলি, মায়া দর্পণ, আলো যেন জলকণা

সহস্র ঢেউ, চার পাশে, তার মাঝখানে এক দ্বীপ
দূর থেকে, যেন কল্পলোকের ওপারে দাঁড়িয়ে কথা।

গোধূলিও নয়, শহুরে সন্ধে, ভিড় ঠেলে ঠেলে আসা
ঝুলকালি মাখা ধোঁয়াটে নগরী, পদে পদে পিছু টান
তবু সেই দ্বীপ, দু' চোখের দ্যুতি, এসেছি তোমার কাছে
প্রতিবার দেখা, কিছু নীরবতা, প্রথম দেখার মতো!

মানুষ হারিয়ে যায়

মানুষ হারিয়ে যায়, চতুর্দিকে হারানো মানুষ
সকলেরই নাম আছে
কেউ কারো ঠিকানা জানে না
নিজেরই বাড়িতে এসে মনে হয় অচেনা সবাই
এক একটা মুহূর্ত আসে
সব কিছু ভুল হয়ে যায়
যেন ভুল করে ফেরা, কথা ছিল অন্য কোনোখানে;

মানুষ হারিয়ে যায়, চতুর্দিকে হারানো মানুষ
যেন অন্য পোশাকের
আড়ালে লুকিয়ে থাকে কেউ
নাম ধরে ডাকাডাকি, চোখে ফুটে ওঠে অন্য ভাষা
ভুল মর্ম, ভুল নর্ম
তাই নিয়ে কাটে সারাবেলা
সবাই অন্যকে খোঁজে, শুধু কেউ নিজেকে খোঁজে না!

কবির উপহার

ছায়া সিনেমার মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমার অল্প বয়েস
নয় কি এগারো, হাত মুঠো করে চেঁচিয়ে পড়ছি কবিতা
'বল বীর, চির উন্নত মম শির...' সামনেই বাবা
ভয়ে উদগ্রীব, যদি ভুল করি, যদি মুখস্থ ফসকায়
আমি নির্ভয়, সেই সভা ঘরে ক্ষুদে আবৃত্তিকার
হাততালি কম পায়নি, এবং একটা রুপোর মেডেল!

বাংলার স্যার একদিন নিয়ে গেলেন কবির কাছে
জন্মদিনের উৎসব, কত ভক্ত এবং ফুলটুল
কবি রয়েছেন নির্বাক, চোখ কারুকেই দেখছে না
প্রণাম করেছি, পিঠে খোঁচা মেরে স্যার বললেন, শোনাও
কবিকে শোনাও সেই কবিতাটা, অন্য অনেক লোকেরা
তারাও বলল, শোনাও ও খোকা, শুরু করো, শুরু করো
কিন্তু আমার গলা থেকে আর বেরুল না কোনো শব্দ
পালাতে পারলে বাঁচি, ভিড় ঠেলে কী করে কোথায় লুকোব
ভয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে মুকড়ে আমি যেন অদৃশ্য!

অত গোলমাল, অত স্তবস্তুতি কবির সহ্য হল না
গলার মালাটা একটানে ছিঁড়ে দিলেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে
একখানা ফুল ছিটকে পড়ল আমার বুকের ওপর
চট করে সেটা তুলে নিই কেউ দেখল কি দেখল না

সেই ফুলখানা আজও রাখা আছে আমার খাতার ভাঁজে...

কে তুমি? কে তুমি?

সুপর্ণ বেরিয়ে যায় কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায়
সুপর্ণটা কে?
বাঃ সে একজন বহুরূপী নয়?
নারী সেবা সমিতিতে সকলেই তাকে জানে
মিসেস অলকা বিশ্বাসের হাজব্যান্ড
অগ্রণী তরুণ সঙ্ঘে সম্বিতের বাবা
নন্দিতারও বাপি, তবে সেটা বলে রাস্তার ওপারে
হলদে বাড়ির মাসিরা
অফিসে, পার্টিতে তার ডাকনাম এস বি, কিংবা
'এস ও বি'-ও বলে কেউ কেউ
গাড়ি আসে সাড়ে ন'টায়, সদ্যস্নাত সুপর্ণ বিশ্বাস ঠোঁটে
সিগারেট ঝুলিয়ে দরজা খোলে।
তার ফিরতে রাত হবে, দিল্লি থেকে হেড অফিস
উড়ে আসছে সন্ধের বিমানে
এটা আজ ছুতো নয়, অন্যদিন ক্লাব গমনের মতো নয়
অবশ্য সে ভুলে যায় না ছেলে মেয়েদের জন্মদিন।

সম্বিৎ থার্ড ইয়ার, তার আছে কলেজে যাবার
কিংবা না-যাবার পূর্ণ স্বাধীনতা
কোনো কোনোদিন খুব ভোর থেকে সে নিশ্চুপ, একাচোরা
বিশ্বসংসারের সঙ্গে কোনো যোগ নেই
আবার কখনও তীব্র নাদে সে বাজায় বহুক্ষণ
বিদ্যুৎ-গিটার
সেদ্ধ ডিম খাবে বলেছিল, পড়ে রইল, সে খেল না
দুই বন্ধু এসে
ডেকে নিয়ে গেল নিরুদ্দেশে।
ছোট মেয়ে নন্দিতাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক তুলে দিতে হয়
পৌনে দশটার স্কুলবাসে

ইদানীং সাজগোজ নিজেই সে করে নেয় বেশ
সদ্য সে চোদ্দোয় পা, তার বালিকাত্ব খসে যাচ্ছে হুড়মুড়িয়ে
বিরলে মায়ের সঙ্গে গোপন কথার দিন শেষ
বাথরুমে ভেজা ফ্রক ও ব্রা ফেলে রাখে
বকুনিতে গ্রাহ্যও করে না
অন্যদিকে চেয়ে থাকে, মনে মনে ফুরফুরিয়ে হাসে
স্কুল থেকে ফিরেই সে হলদে বাড়িটায় কেন যায়
মার চেয়ে মাসিদের দরদের এতখানি টান
ও বাড়িতে কারা যেন মড়াকান্নার মতো গান গায়
প্রত্যেক সন্ধ্যায়
এখন নন্দিতা আর 'মা যাচ্ছি' বলে না।

তারপর, অলকা বিশ্বাস, তুমি কার?
সুদীর্ঘ দুপুর, সল্ট লেকে ধু-ধু বেলা
কাক-শালিকেরও ছুটি, চিলেরাও ক্রমে ঊর্ধ্বাকাশে
উঠে যায়
রাস্তায় কুকুরগুলো ঘুমের আশ্রয় খোঁজে
সাইকেল রিক্সার নীচে পাতলা ছায়ায়
এ অঞ্চলে ফেরিওয়ালা বিশেষ আসে না
ক্বচিৎ গাড়ির শব্দ স্তব্ধতার তালভঙ্গ করে যায়
বেরসিকভাবে
অলকা বিশ্বাস দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি দিয়ে
উঠতে উঠতে থেমে গেল কেন যে সহসা
আঁচল স্খলিত, দুই বুকে তার সমুদ্রের আঁটোসাঁটো ঢেউ
নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, এ মুহূর্তে
কে তুমি কামিনী?

দুপুরের ফাঁকতালে চুপি চুপি আসবে কোনো গোপন প্রেমিক
এ তেমন ছেঁদো গল্প নয়

দু'-তিন ঘণ্টার জন্য শাড়ি ছেড়ে, সালোয়ার কামিজে সেজে
বাড়ি থেকে যাবে না সে
কোনোরূপ গোলকধাঁধায়
কৈশোরের গানের মাস্টারটির স্মৃতি আজ তুচ্ছ হয়ে গেছে
মাসতুতো দাদার বন্ধু, সবজান্তা, কন্দর্পের মতো কান্তি
সন্দীপের মুখ মনে পড়লে হাসি পায়
উড়ো টেলিফোনও বন্ধ হয়ে গেছে চার বছর আগে
পোষা কোনো দুঃখ নেই, অলীক, শৌখিন
বুক ব্যথা কিছু নেই
এ জীবন স্বেচ্ছাকৃত, স্বামী ও সন্তানে সমর্পিত
সংসারের সব কিছু নিজে গড়া, নীল পর্দা, বাঁকুড়ার ঘোড়া
হুইস্কির বোতলে মানি প্ল্যান্ট, টবে লঙ্কা গাছে সাদা সাদা ফুল
একখানা যামিনী রায়, (আসল না কপি?) ভ্যান গঘের প্রিন্ট
সামনের আলমারিতে শুধু সুদৃশ্য ইংরিজি বই
কিছু বাংলা অত্যন্ত অন্দরে
সবই ঠিকঠাক আছে, তাই নয় কি অলকা বিশ্বাস?

তুমি কে? তুমি কে?
এমন দুপুরে মায়া হরিণীরা বিচরণে আসে
এমন দুপুরে রোদে ভোজবাজি ঝলসে ঝলসে ওঠে
এমন দুপুরে আধ-খোলা উপন্যাস কিংবা
কুরুশ কাঠির ভুল বোনা সোয়েটার
কিছুই পড়ে না মনে
পাহাড়ি নদীতে ভেসে আসে কাঠকুটো, ছিন্ন মালা
সিঁড়িতে কোত্থেকে এল এত জল, বৃষ্টি না
বন্যার মতো ঢল
দরজা বন্ধ, কেউ নেই, তুমি একা
একাকিত্বেরও চেয়ে একা
নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, তন্বী-শ্যামা উত্তর চল্লিশ

মেঘ ডাকছে বজ্র নাদে, কে তুমি, কে তুমি?
অলকা বিশ্বাস, সাড়ে তিনটেয় আছে নারী-সেবার মিটিং,
মনে নেই?
খিদে মনে নেই, ঘুম মনে নেই, ঘুগনি বানাবার কথা
মনে নেই?

শরীরের মধ্যে মৃদু জ্বালা, বুকে কস্তুরীর ঘ্রাণ
শাড়ি ও সায়ার মধ্যে অস্তিত্বের তমসায় বাতাসের
মৃদু ফিসফিসানি
কে তুমি? কে তুমি?

ঝনঝন শব্দে একটা ছবি খসে পড়ল, এই তো
ফিরে পেলে হারানো তোমাকে!

কুসুমের গল্প

মাদারিহাটের চা-বাগানের কম্পাউন্ডার বাবুর মেয়ে, তার ডাকনাম কুসুম
চেহারা এমন আহা মরি কিছু নয়
বয়েসের তুলনায় বড়সড়, নাকটা একটু চাপা
শ্রাবণের মেঘের মতন গায়ের রং
তার চোখ দুটিতে পাহাড়ের লুকোনো ঝর্নার চঞ্চলতা
গান জানে না, কবিতা পড়ে না, শুধু কী করে যেন একটা নাচ শিখেছে
ইস্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশানে ক্লাস টেনের সেই কুসুম
আর দুটি মেয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাচতে নাচতে
তালে ভুল করল তিনবার
ফিক করে হেসে ফেলল লজ্জায়
কী আশ্চর্য, তবু উত্তরবঙ্গে বেড়াতে আসা

এই বাগানের মালিকের ছেলের বন্ধু উজ্জ্বল নামে যুবকটি
মুগ্ধ হয়ে গেল তাকে দেখে
নাচ নয়, কুসুমের হাসিটাই বেশি পছন্দ হয়েছিল তার
শুধু কম্পিউটার দক্ষ নয়, সম্প্রতি পিতৃবিয়োগের পর
সে হরিয়ানার একটি কারখানার উত্তরাধিকারী হয়েছে
আপত্তির তো প্রশ্নই ওঠে না, এ যে অভাবনীয় সৌভাগ্য
তিনমাসের মধ্যে বিয়ে, কুসুমকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল
দিল্লির উপান্তে

কলেজে ভর্তি করানো হল কুসুমকে, তার উচ্চারণে
বড় বেশি ভুল
নাচ শিখতে পাঠানো হল সোনাল মানসিং-এর কাছে
সোনাল তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন তিন সপ্তাহ বাদে
তার পায়ে ছন্দ নেই
দেখতে দেখতে কেটে গেল চার বছর
উজ্জ্বল চলে গেল অন্য বাগানের ফুলের দিকে
তারপর পশ্চিম গোলার্ধের স্বর্ণ মরীচিকার হাতছানিতে।
হরিয়ানার কারখানার কোয়ার্টারের দোতলায় থাকে কুসুম
এমনি কোনো অসুবিধে নেই, টিভি'র বেলায় কাটে সারাদিন
আর প্রায় সর্বক্ষণ আঙুলে চাটে তেঁতুলের আচার
সেইজন্যই সে চিঠি লিখতে পারে না
এক এক রাতে সে উঠে আসে ছাদে
এখানে চা-বাগানের সবুজ ঢেউ নেই
দিগন্তে নেই পাহাড়ের রেখা
শুধু শুকনো ঊষর প্রান্তর, ডাঙা জমি আর কারখানার চিমনি
মাদারিহাট থেকে বোঁটা ছিঁড়ে আনা কুসুম কিছুতেই শুকিয়ে
ঝরে যেতে রাজি নয়
সোনাল মানসিং যাই বলুন, সে এখনো একা একা নাচে
আকাশের নীচে
মাঝে মাঝে একটু আধটু তালভঙ্গ হয় হোক, কেউ তো দেখবে না

স্কুলের ফাংশনে আর যে-দুটি মেয়ে নেচেছিল তারা এখন
কোথায়, কে জানে
তাদের নাম অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা নয়
কিন্তু কুসুমের বাবা-মা শখ করে তার ভালো নাম রেখেছিলেন
শকুন্তলা
নিজের তলপেটে হাত রাখে সে আনমনে
টের পায় একটু একটু নড়াচড়া
আসছে, একজন আসছে, সে খেলা করবে সিংহশিশুর সঙ্গে

এখনো অনেক কিছু ঘটবে!

দেশ-কাল-মানুষ

যে আমি এককালে দেশকে ভালোবেসে গেয়েছি কত গান
দেশের ডাক শুনে, অথবা না শুনেও, চেয়েছি প্রাণ দিতে
মুঠোয় আমলকী, ব্যাকুল কৈশোর, ভুলেছি জননীকে
দেশই গরিয়সী, স্বপ্ন মাখা রূপ দেখেছি দিকে দিকে
সে আমি ইদানীং আয়না-সম্মুখে বিরলে কথা বলি
শূন্য করতল, পাথর অভিমান, একলা পথ চলি
জন্ম দৈবাৎ, কোথায় কোন্ মাটি, তা কেন দেশ হবে...

[এভাবে লিখতে লিখতে একেবারে অন্তঃস্থলের ক্ষোভ এমনই ফেটে বেরুতে চায় যে মনে হয়, এখন ছন্দমিল দিয়ে লেখা আমার পক্ষে একধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা। তাই অতি দ্রুত আবার অন্যভাবে লিখতে শুরু করি...]

যে-আমি একসময় কত দেশ দেশ বলে গান গেয়ে গলা ফাটিয়েছি
দেশের ডাক শুনে, আসলে সেরকম কিছু না শুনে

পেছন দিকের ধাক্কায় চেয়েছি প্রাণ দিতে
মুঠোয় ছিল আমলকী, সেই পাগল পাগল কৈশোরে
নিজের মাকেও ভুলে গিয়ে দেশকেই মনে হত গরিয়সী
কত স্বপ্ন দিয়ে গড়া একখানা অপার্থিব প্রতিমা
সেই আমি ইদানীং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে আত্মধিক্কার দিই
খবরের কাগজের ওপর থুথু ফেলতে ইচ্ছে হয়
আকস্মিকতাতেই সকলের জন্ম, যে-কোনও মাটিতে, গাছের মতন
দেশ আবার কী, নিছক ছেলে ভুলোনো রূপকথা
ক্ষমতালিপ্সুরাই পৃথিবীটাকে টুকরো টুকরো করে দেশ বানিয়েছে
সমস্ত সীমান্তগুলিই লোভ আর দম্ভ দিয়ে ঘেরা
স্বদেশবন্দনার কাব্য আর গান শুধু অবোধ, আবেগতাড়িতদের
মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার ভাঁওতা
দেশ মানে বন্দিত্ব, দেশ মানে অন্ধ কুসংস্কার
জীবনধারিণী ধরিত্রীর সারা দেহে অনবরত ছুরি মেরে চলেছে
মানবসন্তানেরা!

যে-আমি ঈশ্বর কিংবা দেবলোক অস্বীকার করে এসেছি
প্রথমযৌবন থেকে
স্বর্গ-নরক নস্যাৎ করে ধন্য মনে করেছি শুধু একবারের মতন
মনুষ্যজন্মকে
মানুষকে মনে করেছি অমৃতের সন্তান
মানুষের জন্য পারস্পরিক হাতে হাত ধরা, বুকের উত্তাপ,
মানুষের জন্য ভালোবাসা
শিশুকে আদর, নারীর সুঘ্রাণ, প্রেমেই স্বার্থক ইহলোক
সেই আমিই এখন মানুষকে ভয় পাই, শিউরে উঠি জনসমষ্টি দেখে
মানুষ কোথায়, পৃথিবী ভরে গেছে ছদ্মবেশী অমানুষে
যারা প্রতিবেশী শিশুকে ছুড়ে দেয় দাউ দাউ আগুনে, তারা মানুষ?
যারা ধর্মের নামে এক হাস্যকর গুজবে মেতে উঠে
রক্তের গঙ্গা বইয়ে দেয়, তারা মানুষ?

যারা নিতান্ত পেশিশক্তিতে নারীকে ধর্ষণ করে, তারপর
খণ্ড খণ্ড করে তাকে কাটে,
তারা মানুষ?
যারা মন্দির, মসজিদ, গির্জা গড়ে তারপর এ ওরটা ভাঙে,
সে তারটা ভাঙে, ছিন্নমুণ্ড দিয়ে ভিত গাঁথে,
তারা কি মানুষ?
যারা এইসব ভাঙাভাঙি আড়চোখে দেখে, হত্যালীলায়
হাততালি দেয়
তারা কি মানুষ?
যারা ধ্বংসের অস্ত্র ছড়ায়, অনবরত ধ্বংসের উস্কানি দিয়ে
নিজের সন্তানদের দুধে ভাতে রাখে আর বিকেলবেলা
কুকুর নিয়ে বেড়াতে যায়,
তারা কি মানুষ?
মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো নাকি পাপ
আমি যে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি, কিছুতেই আঁকড়ে রাখতে পারছি না
এই সব কিছুর জন্য নিজের জন্মটাকেই দায়ী মনে হয়।

যারা আমার পরে জন্মেছে ও জন্মাবে
তাদের জন্য কেমন থাকবে এই পৃথিবীটা? আমি
শেষের দিকে কোনও কৃত্রিম, অবিশ্বাসী
আশাবাদ শোনাতে পারব না
তারা কি পারবে সমস্ত দেশগুলির সীমানা মুছে দিতে
অথবা সমুদ্রগুলি ভরে যাবে রক্তে?
তারা কি সমস্ত ধর্মগুলোকে গু লাগা কাগজের মতন ফেলে দিতে
পারবে আবর্জনায়?
(অথবা একটু ভালো করে বলতে গেলে ধর্মগুলিকে ঠেলে দেবে ইতিহাসে?)
অথবা ধর্মধ্বজীরা আরও বেড়ে উঠবে রক্তবীজের মতন?
ঈশ্বরবিশ্বাসীরা কি তাদের ঈশ্বরকে দাঁড় করাতে পারবে কাঠগড়ায়?
পরিশ্রমের ফসল সবাই ভাগ করে নেবে, না অনবরত কেড়ে নেবে
অন্যের মুখের অন্ন

তারা লাইব্রেরি পোড়াবে, তাজমহলে গিয়ে গণপেচ্ছাপ করবে
হে অনাগত ভবিষ্যৎ ও পর-প্রজন্ম, তোমাদের জন্য আমরা কিছুই
রেখে যেতে পারলাম না,
ব্যর্থতা ছাড়া!

[অথবা এসবই কি আমার নিজস্ব নৈরাশ্য?
অন্য কোথাও আছে অন্য মানুষ, যারা এই সব কিছু বদলে দেবে?
তারা পারবে, ঠিক পারবে তো? সত্যিই আছে
সেই অন্য মানুষ
আমি কি তাদের দেখে যেতে পারব?]

একটি গানের খসড়া

আর দূরে নেই স্বর্গরাজ্য, হ্যাঁচ্চো!

এমন সাধের বিকেলটা আজ
রাজা পরেছেন কোটালের সাজ
ধরে আন আছে যত ধড়িবাজ
হ্যাঁচ্চো!

দিকে দিকে আজ কত প্রকল্প
প্র-পূর্বক কল্প গল্প
আমি বেশি নেব, তুমিও অল্প
হ্যাঁচ্চো!

শোনো শোনো আজ উলট পুরাণ
সেতুবন্ধনে সীতা ঘুষ খান
রাবণকে দেখে রাম পিঠটান
হ্যাঁচ্চো!

নন্দ ঘোষেরা থাকেন দিল্লি
নাকি সুরে গায় আদুরে বিল্লি
শুনে শুনে ফাটে কানের ঝিল্লি
হ্যাঁচ্চো!

দিল্লির খুড়ো-খুড়িরা ব্যস্ত
পদী-পিসিমার চরণে ন্যস্ত
পদী পিসি খান মুন্ডু আস্ত
হ্যাঁচ্চো!

সকলেই আজ তাসের খেলুড়ি
ইস্কাবনের বিবি থুরি থুরি
যে-যেমন পারো ছুঁয়ে থাকো বুড়ি
হ্যাঁচ্চো!

আরও খেলা আছে চোর ও পুলিশ
তুমি পুঁটি খাও, আমার ইলিশ
তুমি বাংলায়, আমি ইংলিশ
হ্যাঁচ্চো!

(হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো, দূর ছাই, এ কী সর্দি হল রে বাবা, রুমালটাই বা কোথায় যে গেল!)

রুমালটা ছিল কোথায় যে গেল
আমার পকেটে কে হাত ঢোকাল
কিল খেয়ে তবু চুপ থাকা ভালো
হ্যাঁচ্চো!
আর দূরে নেই স্বর্গরাজ্য
হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো।

রচনাকাল ১৯৭৭

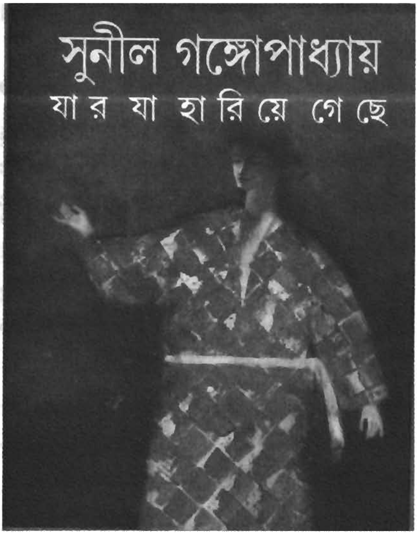

যার যা হারিয়ে গেছে

সূচি

তিনটি প্রশ্ন ১৩৩, যার যা হারিয়ে গেছে ১৩৩, অর্জুনের সংশয় ১৩৮, চাঁদমালা ১৩৯, মনোহরণ ১৪২, কেউ কেউ ক্ষমাপ্রার্থী ১৪৩, চোখ এবং হাত, নাক অদৃশ্য ১৪৪, সাতাশ শতাব্দী পর ১৪৪, হে মরুভূমির পথিক ১৪৭, বিরোচনের বিয়ে ১৪৮, চড়াই পাখিরা কোথায় গেল ১৫০, মণিকর্ণিকার ঘাটে ১৫১, কল্পান্ত ১৫২, ফুলের বদলে ১৫৩, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ১৫৪, বাঁধানো ছবি ১৫৫, আমার কৈশোরের মা ১৫৬, সত্যি থেমে গেছে ১৫৭, দেখা ১৫৭, যে কবিতা লেখা হয়নি ১৫৮, উপমা ও উপমেয় ১৫৯, সে ও আমি ১৬০, সান্ধ্য বিতর্ক ১৬১, একার চেয়েও একা ১৬৩, নতুন নতুন নরক ১৬৪, দুঃখ ১৬৫, মানুষের ডানা ১৬৬, নদীর কোন্ পারে তুমি, নীরা ১৬৭, স্থির চিত্র ১৬৮, নাভি কাব্য ১৬৯, বৃষ্টিধারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে হেঁটে যাচ্ছে নীরা ১৭০, এক মুঠো ভবিষ্যৎ ১৭১, এক জীবনের মর্ম ১৭৩, আকাশ দেখার অধিকার ১৭৬, পড়ে থাকবে একটি ঝরা কুসুম ১৭৭, জীবন মাত্র একবার ১৭৭, ব্রিজের ওপরে ও নীচে ১৭৯, সত্যের যমজ ১৮০, জ্যোৎস্না, রাত একটা পঁয়তিরিশে এক নারী ১৮১, সাবধান কলম ১৮২, অরণ্য গভীরে ১৮৩, মৃত্যু নিয়ে ১৮৪, সমস্ত দেহতত্ত্ব তুচ্ছ করে ১৮৪, উত্তর নেই ১৮৫, বারান্দার নীচে ১৮৬,

সময় জানে না ১৮৬, বিন্দু বিন্দু ১৮৭, বারবার প্রথম দেখা ১৮৮, সেই একদিন ১৮৯, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ১৯০, বৈজ্ঞানিকের বাজি ১৯১

তিনটি প্রশ্ন

তারপর ধর্ম বক বললেন, বৎস,
তোমাকে আমি আরও তিনটি প্রশ্ন করব
বলো তো, মানুষের কোন কষ্ট মুখের ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না
কিংবা বলতে গেলেও কেউ বুঝবে না?
মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে যুধিষ্ঠির বললেন,
কোনো কবি যখন ভাব প্রকাশের জন্য প্রকৃত ভাষা খুঁজে পায় না
তখন তার যে কষ্ট তা দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির পক্ষে
সহমর্মী হওয়া সম্ভব নয়!
ধর্ম বক হৃষ্ট হয়ে বললেন, বেশ, এবার বলো
মানুষের জীবনে এমন কোন্ মুহূর্ত আছে, যা রমণ সুখের চেয়েও
বেশি তৃপ্তি দিতে পারে?
এবারেও নির্দ্বিধায় যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ বললেন,
কোনো শিল্পীর সৃষ্টিতে শেষ তুলির টান দেওয়ার মুহূর্তটি
তার সঙ্গে অন্য কোনো সুখেরই তুলনা চলে না
ধর্ম বক পুনরপি বললেন, বেশ! এবার শেষ প্রশ্ন, বলো
কখন ধর্মকে মনে হয় অধর্ম?
নত নেত্রে, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, কম্পিত কণ্ঠে যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন,
যখন ধর্ম আসেন বকের ছদ্মবেশে, যখন মৃত্যু দিয়ে
পরীক্ষা করা হয় মানুষকে!

যার যা হারিয়ে গেছে

সেই যে একদিন এক ছোকরা বাজিকর অমলতাশ গাছতলায়
জোর গলায় হেঁকে বলেছিল:
কার কী হারিয়ে গেছে, এসো, এসো, আমাকে বলো
আমি সব খুঁজে দেব, আমি সব খুঁজে দেব!

এমন কে আছে, যার কখনও কিছু হারায়নি
এমন কে আছে যার কিছু হারাবার দুঃখ নেই
এমন কে আছে যে কিছু ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখে না
অনেক মানুষ এসে জড়ো হল সারা গায়ে রোদ্দুর মেখে
অনেক মানুষ এল এক চোখে বিশ্বাস, অন্য চোখে
অবিশ্বাস নিয়ে
অনেক মানুষ এল সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে দু'হাতে
পিছুটান সরিয়ে সরিয়ে
সবাই তাকে পলকহীন ভাবে দেখে নেয়
সবাই তার অচেনা মুখে একটুও চেনা চিহ্ন আছে কি না খোঁজে

টুকরো টুকরো রঙিন কাপড় জোড়া দেওয়া আলখাল্লা পরা
পুরুষ্টু গোঁফটা নিশ্চয়ই নকল, তার জোড়াভুরু নরম
নবীন তৃণের মতন
তার থুতনিতে মুছে যায়নি কৈশোরের লাবণ্য
চোখ দুটি দুরন্ত ঘোড়সওয়ার
তার উত্তোলিত ডান হাতে কিছু নেই, তবু যেন অদৃশ্য
জাদুদণ্ড ধরে আছে

কে আগে নিজের কথা জানাবে?
সকলের ঠেলাঠেলির মধ্যে কেমন যেন লজ্জা ভাব
কতই বা বয়েস ছেলেটার, তার কাছে কি মন খোলা যায়
তবে হতেও পারে কোনও গুনিনের বংশধর
যার হারানো বস্তু সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর, সে-ই প্রথম
মুখ খুলতে পারে
মাঝ বয়েসী, মুখে-মেছেতা স্ত্রীলোকটি বলল, ওগো
আমার একটা কাঁসার রেকাবি, ঠাকুরের...
তার কথা শেষ হল না, জাদুকর তার হাতে পাঞ্জার বরাভয়
দেখিয়ে বলল,
জানি, জানি, পাবে, ঠিক পেয়ে যাবে, তিন সত্যি

এরপর ফুটফাট বাজি ফোটার মতন শুরু হয়ে গেল
আমার আংটি, আমার ফাঁদি নথ, আমার জলে-ডোবা
পেতলের ঘড়া, তিনখানা একশো টাকার নোট,
মায়ের ছবি...
সে যদি নারী হত, তা হলে বলা যেত, তার হাসি
পূর্ণিমার আলোর মতন
সে পুরুষ, তাই তার হাসি যেন সদ্য ভাঙা নারকোলের
ভেতরের শুভ্রতা
সেই হাসি দিয়ে সে সবাইকে বলতে লাগল, পাবে
ঠিক পেয়ে যাবে, তিন সত্যি, তিন সত্যি
অনেকেই আশা করেছিল, সে সাঁইবাবার মতন শূন্যে হাত ঘুরিয়ে
তক্ষুনি তক্ষুনি এনে দেবে বাতাস থেকে
হারিয়ে যাওয়া সব কিছু
তবু তার তিন সত্যিতে এমন সরল সত্যের দৃঢ়তা
যা মুখের ওপর অস্বীকার করা যায় না
শূন্যতার মধ্যেও যেন ফুল ফুটছে, মেঘলা আকাশেও
যেমন ঝিকমিক করে তারা

শুধু দু'তিনজন দাঁড়িয়ে রইল এক পাশে
তারা কিছুই জানাল না, তাদের যা হারিয়েছে
তা জানাবার মতন ভাষা নেই
এ এমনই এক নিঃস্বতা যে বস্তুবিশ্বের অন্য কিছুই
তাদের মনে পড়ে না
তাদের নতচক্ষু, মনে মনে কাঁদছে বোধহয়
কেউ অন্যদের দিকে তাকাচ্ছে না
পাশাপাশি দাঁড়িয়েও তারা একলা
তাদের প্রত্যেকের হারাবার বেদনার নিজস্ব তীব্রতা এক নয়
তাদের কান্নাও আলাদা
বাজিকরটি আর সবাইকেই ফিরিয়ে দিয়েছে দৃষ্টি
প্রত্যেককে দিয়েছে তিন সত্যি

এই ছোট দলটির দিকে সে চেয়ে রইল একটুক্ষণ
এদের কোনও দাবি নেই, এদের কান্নাও সে শুনতে পায়নি
তবু বুঝতে তার দেরি হল না
তার মুখের হাসি অন্ধকার হয়ে গেল
নেমে এল ডান হাত
আর সে তিন সত্যি বলতে পারল না

বিকেল ফুরিয়ে গেছে, রাত্রি আসছে অন্য দেশ থেকে
মানুষেরা ঘরে ফিরবে, গোধূলিতে শোনা যাবে
যাই যাই মৃদু ফিসফিসানি
অনেকেই চায় তবু এ ছোকরাটি কারুর বাড়িতে
আশ্রয় নেবে না
কোনও গৃহস্থের বাড়ি শয্যা পাতা তার নাকি গুরুর নিষেধ
সে অন্ন নেবে না, ফল-মূল নেবে না, কোনও দক্ষিণাও চাই না
তবু কেন সে মানুষের হারিয়ে যাওয়া সব কিছু উদ্ধার
করতে এসেছে?
মন্ত্র-টন্ত্রও কিছু শোনায়নি, কোন সাহসে তিন সত্যি
উচ্চারণ করল এতবার?
যে কিছুই চায় না, সে কেন মানুষকে কিছু দেবে?
এ কোন্ আজব প্রাণী, সে কি এই পৃথিবীর নয়
তার খিদে তেষ্টাও নেই, সে শুয়ে থাকবে আকাশের নীচে
সে কোথা থেকে, কেনই বা এল, কেউ কিছুই বুঝল না
এবং পরদিন সকালে সে অদৃশ্য হয়ে গেল
তবে কি সত্যিই অলীক, দৈবী মায়া, সে রকমই ভাবতে ইচ্ছে করে
সে কি শত শত শতাব্দীর এক পথিক, হঠাৎ হঠাৎ
গাছতলায় এসে দাঁড়ায়?

দু'একদিনের মধ্যেই কেউ পুকুরঘাটে ফিরে পেল রেকাবি
কারও মায়ের ছবি উদ্ধার হল ইঁদুরের গর্ত থেকে
এ রকম দু'একটিতেই দিকে দিকে রটে গেল তিন-সত্যির মহিমা

এসব কাকতালীয় বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না
তার চেয়ে অলৌকিকত্ব অনেক জোর এনে দেয়
আসবে, আসবে, এরপর সব কিছুই ফিরে আসবে
অমলতাশ গাছটির নীচে স্থাপিত হবে এক অজ্ঞাত
দেবতার নামে বেদী
তেত্রিশ কোটির পরেও আরও একজন
শুধু যে-কয়েকজন নিস্তব্ধ ছিল, যারা কিছু চায়নি
যারা পায়নি তিন সত্যির প্রতিশ্রুতি
তারা আর ওই গাছতলায় যায় না, তাদের কান্না থামেনি।

এ বছর বন্যায় নদী এসে গ্রাস করেছে ইস্কুলবাড়ি
এ বছর তিল চাষ নষ্ট হয়ে গেছে শোঁয়া পোকার উপদ্রবে
এ বছর জমিতে জমিতে অনেক রক্ত ঝরেছে
এ বছর সদ্য স্তনবতী দুটি মেয়ে হারিয়ে গেছে মালবাজারে
এ বছর উদরাময় এসেছে রাক্ষসীর বেশে
তবু মজা পুকুরের পাঁক থেকে একটি শূন্য পেতলের কলসি
ভেসে উঠলে
চতুর্দিকে শোনা যায় জয়ধ্বনি
সবাই তো আগেই বলেছিল, তিন সত্যি কখনও
মিথ্যে হয় না
সেই বাজিকর অবশ্যই ফিরে আসবে
এর মধ্যে যার যার হারিয়েছে, সে সবও সে চোখের সামনে
এনে দেবে।

শুধু যা হারিয়ে যাওয়ার কথা মুখে বলা যায় না
তার সন্ধানেই তো ছুটে বেড়াচ্ছে সেই আলখাল্লা পরা, পাতলা ছেলেটা
যে মেয়েটি মুখ বুজে করে যাচ্ছে ঘর সংসারের কাজ
তার ভালোবাসা হারিয়ে গেছে তাই সে নিভৃতে গোপনে কাঁদে
শিলাবৃষ্টিতে ঝরে যাচ্ছে আমের বোল, তার সব ফুল
ঝরে গেছে আগেই

আগুন লাগল গ্রামের হাটে, তার বুক যে পুড়ে খাক হয়ে গেছে
কেউ জানে না
ভালোবাসা হারিয়ে গেছে, তাই শুকিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী
ভালোবাসা হারিয়ে গেছে তাই চতুর্দিকে এত দুর্গন্ধ
বাতাসে এত তাপ, পাতাল থেকে উঠে আসছে বিষাক্ত কীট
অনেক মানুষ সারা জীবন জানলই না সত্যি সত্যি সে
কী হারিয়েছে
তাপ্পি মারা আলখাল্লা পরা ছোকরাটি রাত কাটাচ্ছে
এক গাছতলা থেকে অন্য গাছতলায়
এক এক সময় সে নিজেই উছাড়ি পিছাড়ি হয়ে কাঁদে
কোনওদিন কি সে পারবে তিন সত্যি দিয়ে
বন্দি করতে ভালোবাসাকে?

অর্জুনের সংশয়

এরপর অর্জুন বললেন, হে বাসুদেব, তুমি এই ক্ষণে
আমাকে যে বিশ্বরূপ দর্শন করালে
তা কি অন্য আর কেউ দেখতে পেয়েছে?
কৃষ্ণ বললেন, না, আর কেউ অধিকারী নয়
দেখো না, তোমার রকম সকম দেখে দু' পক্ষেরই যুযুধান সবাই বিস্ময় বোধ করছে
অর্জুন বললেন, তুমি কৌরবসভাতেও একবার এই রূপ দেখিয়েছিলে, শুনেছি।
কৃষ্ণ বললেন, তা বটে। তখন প্রয়োজন হয়েছিল
অর্জুন বললেন, তখন কেউ কি বলেছিল, এ তোমার জাদুর খেলা
কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, তা কেউ বলতেও পারে, আমিই তো
এ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাদুকর।
এই মহাবিশ্বও তো জাদুর খেলা
এই যে প্রস্তুতি, সামান্য, ক্ষুদ্র বীজ থেকে বনস্পতি

চাঁদের অদৃশ্য টানে সমুদ্রে জোয়ার
এও কি নয়, মহা ভোজবাজি? নাও, নাও, আর দেরি কোরো না

অর্জুন বললেন, আমার শেষ প্রশ্ন
তুমি তোমার অতুলনীয় জাদুবলে সমস্ত মানুষকে
নিরস্ত্র করে দিতে পারো না?
তা হলে তো আর যুদ্ধের প্রয়োজনই হয় না।
বন্ধ হয়ে যাবে সব রক্তক্ষয়, এই আত্মীয় হনন
মৃত্যুর সময় হলে মানুষ মরবে
আর যদি রেষারেষি, প্রতিস্পর্ধা না যায়, তা হলে
শুধু বাক্‌যুদ্ধ থাক

কৃষ্ণ বললেন, কোনো প্রশ্নই শেষ প্রশ্ন নয়
সব প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যায় না
তোমার মন থেকে আমি এই প্রশ্ন মুছে দিচ্ছি
যারা যুদ্ধ করে, তারা এত প্রশ্ন করে না
নিজের বিবেকের কাছেও না!

চাঁদমালা

ওভার ব্রিজের রেলিং ঘেঁষে ঘুমিয়ে আছে একজন মানুষ। এটা
ওর দোতলা বাড়ির ছাদের স্বপ্ন।

*

ফুটপাথের যে বাচ্চাটা নর্দমায় হাত ডুবিয়ে খলবল করছে
ওকে কি সাধ করে আনা হয়েছে এই অনিশ্চিত জীবনে?
দু'জন নারী পুরুষের রমণের সুখ থেকেই তো ওর জন্ম
অথবা সুখ ছিল না, সুখের বোধ ছিল না

কিংবা সেই দু'জন হয়তো চুম্বনের স্বাদও জানে না
চুম্বনহীন সঙ্গম কিংবা জীবনচর্যাও মানুষের পক্ষে সম্ভব?

*

ইংলিশ বাজারে মাছ বিক্রি করতে আসে গৌরাঙ্গ সুলেমান
আসলে সে কখনও সুলেমান, কখনও গৌরাঙ্গ, একই অঙ্গে দু'জন
গৌরাঙ্গ খুব পোস্ত খেতে ভালোবাসে, সাত বছর খায়নি
সুলেমান ভালোবাসে প্রকাশ্যে কুঁচকি চুলকোতে,
সেটা সম্ভব নয়
বছরের পর বছর অবদমন, তাই থুতু ফেলে যখন তখন!

*

পরেশবাবুদের বিড়ালীটির পায়ে কে আলতা পরিয়ে দিয়েছে
হাতচাপুড়ি দিলে সে দু' পা তুলে নাচে
মাঝরাতে সে পাঁচিলের ওপর উঠে পিঠ বাঁকায়
চোখ দুটি জ্বলন্ত অঙ্গার
চাঁদ ধরার জন্য সে লাফ দেয় আকাশের দিকে
খানিকবাদে তার মুখে মাখামাখি টাটকা রক্ত।

*

ফ্ল্যাটবাড়ির কাজের মেয়েটি, সতেরো, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে
যে-যে কারণে এ রকম হয়, তার কোনওটাই তো মেলানো
যাচ্ছে না
ওখানে কোনও পুরুষ মানুষই নেই, দুটি বিধবা
ও এক চিরকুমারীর সংসার
কেউ ওকে চড়-চাপড় মারে না, খুব বেশি চোপাও করে না
সবাই আতপ চালের ভাত খায়, মাছের টুকরোও প্রায়
সমান সমান
সন্ধেবেলা পাড়া বেড়ানোতে কোনও বাধা নেই
তবু তুই মরতে গেলি কেন রে মেয়ে?
ঝুলন্ত লাশের উত্তর: বাঃ, গরিব মানুষদের বুঝি অকারণে
মন খারাপ হতে পারে না?

*

একটা নদী যখনই অন্য একটা নদীতে এসে মেশে
অমনি একটু দূরে আর একটা নদী বাইরে বেরিয়ে যায়
ওদিক থেকে আসা নদীটির গতর দিন দিন শুকোয়
অন্য নদীটি পাড় ভেঙে ভেঙে খেয়ে দিব্যি ফুর্তিতে আছে
মূল নদীটি ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে জ্যোৎস্নারাতে
প্রথম জোয়ারের মৃদু কুলকুলু ধ্বনিতে সে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে
ফিরে-আসা নদীটিকে সে বুকে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করে,
কী রে, তোর বুঝি সমুদ্র পছন্দ হল না
দু'জনে যখন নির্লজ্জতায় মেতে উঠে
প্রায়-শুকনো নদীটি তখন চেয়ে থাকে ভ্রাম্যমাণ মেঘের দিকে
তার দীর্ঘশ্বাসে আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে
মেঘের ওপরে এক দেবতা।

*

এ এক যুগ এসেছে, কাপুরুষরাই শুধু যুদ্ধের দামামা বাজায়
ওই দামামাগুলো যারা বানায়, তারা সবাই জন্মান্ধ
বিনিময়ে তাদের জন্য আসে প্রচুর গিল্টি করা আয়না
সেই আয়নায় ঠোক্কর খায় মৌমাছি আর চড়াই পাখি
মধুলোভীরা হা হা শব্দ করে ভোট বাক্সে, আর উজানে যায় নদী
তার ওপরে সেতুটি নড়বড় করছে, কারুর হুঁশ নেই, ছুটে আসছে ট্রেন
দু'দিকের রাস্তা বিস্তারিত হতে হতে খেয়ে নিচ্ছে ফসলের ক্ষেত
আর সেই সব ফসল উনুন খুঁজতে চলে যাচ্ছে নিরুদ্দেশে
এদিকে কত যে উনুন খালি পড়ে আছে, আগুন নেই, শুধু ছাই
সারা গায়ে ছাই মেখে গাজনের সঙ্ বেরিয়েছে, দর্শক নেই একটিও
কোথাও চলেছে হরির লুট, তার বাতাসাগুলো টপাটপ খেয়ে নিচ্ছে
স্বয়ং শ্রীহরি
এ ভাবেই গল্পের গোরু গাছে ওঠে আর কবিতার নটে গাছটি মুড়োয়...

মনোহরণ

নদীতে ঢেউ, শরীরে ঢেউ, কোথাও বাঁশি বাজছে
সে মেয়েটির নাম কি রাধা? পুঁটি হলেও দোষ কী?
আগুন জ্বলছে পাড়ায় পাড়ায়, হিংস্রতার গর্জন
ভুল মানুষ, ভুল খেলায় সারা জীবন মত্ত!

ধানজমিতে রক্তপাত, কারখানায় দাঙ্গা
সত্য, তবু সত্য নয়, চোখ ভুলোনোর ভেল্‌কি
কেউ জেতে না, খেলার রাজা টান মারছে সুতোয়
একটা শালিক, দুটো শালিক মুখ থুবড়ে মরছে।

নদীতে ঢেউ, শরীরে ঢেউ, কোথাও বাঁশি বাজছে
আমার খুব ইচ্ছে করে, পুঁটিই রাধা হোক না
আবহমান কালের কাছে মুখ লুকোবে বাস্তব
নিজের সুতোয় জড়িয়ে যাবে বর্তমানের কংস।

সরু একটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ছেলেটা
চাকরি পায়নি, যাত্রা দলে না-হয় কেষ্ট সাজুক
সেখানেও খুব উলুক ঝুলুক তাল-বেতালের নৃত্য
তবু তো কেউ একলা রাতে বসে থাকবে নদীর ধারে
মনোহরণ দুঃখে!

কেউ কেউ ক্ষমাপ্রার্থী

মল্লিকা বলেছে, শেক্‌সপিয়ারের কোনো নায়িকাকে নিয়ে
একটি কবিতা লিখতে
কী মুস্কিল, অন্য লেখকের মেয়েছেলেদের নিয়ে কেন
টানাটানি করতে যাব আমি?
তা হোন না তিনি শেক্‌সপিয়ার কিংবা রবীন্দ্রনাথ
আমার নিজের কল্পনায় বা বাস্তবে কি রমণীদের
অভাব আছে?

তবু মনে পড়ে যায় পাঁচশো বছর আগের অনেকগুলি মুখ
পোরশিয়া, ক্রেসিডা, মিরান্ডা, ভ্রান্তিবিলাসের দুই বোন
এড্রিয়ানা আর লুসিয়ানা
এবং কর্ডেলিয়া, জুলিয়েট
পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মনে পড়ল
এক সময় ফাঁকা মাঠে রাত্তিরবেলা চিৎকার করতুম
আ হর্স, আ হর্স, মাই কিংডম ফর আ হর্স!
ক্লিয়োপেট্রা আর ওফেলিয়া বড় বেশি ফিল্‌মের নায়িকা
যদি বেছে নিতে হয়, তবে আমি কাকে
এ যেন এক উল্টো স্বয়ম্বর সভা, মজার ব্যাপার
হঠাৎ ঠিক যেন কানে ভেসে আসে ডেসডিমোনার
সেই আকুল মিনতি
আমাকে আর একটি রাত্রি বাঁচতে দাও...
অন্তত আর আধ ঘণ্টা
একটি প্রার্থনার সময়টুকু...
তার গলায় ওথেলোর নির্মম আঙুল

মল্লিকা, পুরুষরা আজও অনেকে ওথেলোর মতন মূঢ়
তবু কেউ কেউ ক্ষমাপ্রার্থী!

চোখ এবং হাত, নাক অদৃশ্য

চুম্বন শুধু অধরে ওষ্ঠে মেলামেশা নয় মোটে
সে তো পাখিরাও যখন তখন ঘষাঘষি করে ঠোঁটে

প্রথমে রয়েছে চোখের যোজনা, দৃষ্টির সম্মতি
আঁখি পল্লবে মৃদু কম্পন, দ্রুত ধমনীর গতি।

নাসিকার কোনো ভূমিকাই নেই, চক্ষুও যাবে বুজে
পরম সময়ে হাতই প্রধান, নেবে বুক দুটি খুঁজে!

সাতাশ শতাব্দী পর

ইথাকা নগরীর এক প্রান্তে পথের ধারে বসে আছেন
এক প্রবৃদ্ধ কবি, সামনে কয়েকটি শ্রোতা
অন্ধকার গাঢ় হলে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল
স্থান-কাল-আয়ু নিরপেক্ষ এক সুঠাম পুরুষ
তার সর্বাঙ্গে অন্য কোনো পোশাক নেই, শুধু একটা
কালো চাদর জড়ানো
আকাশ পথে উড়ে গেল কয়েকটি বাদুড় আর তারও ওপরে
কালপুরুষের কোমরবন্ধে একটি তারা
বৈদূর্যমণির মতন উজ্জ্বল
বিশাল ডানা ঝাপটে একটি অ্যালবাট্রস এসে বসল
কাছাকাছি এক সুউচ্চ ম্যাগনোলিয়া গাছে
তাতে ফুটে আছে অজস্র ডিম্বাকার ফুল
সমুদ্র বাতাসে ভেসে আসছে মাল্লাদের অস্পষ্ট গান...

হোমার বললেন, এক দিনার দাও, আর কী শুনতে চাও বলো
প্যারিস ও মিনেলাসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ কিংবা হেকটর পতন
কিংবা সেই রমণীর মুখের বর্ণনা, যার জন্য সহস্র রণতরী
ভেসে পড়তে পারে বসফরাসে
কালো চাদর জড়ানো মানুষটি কোনো কথা বলল না
তার নীরবতা অতল জলের স্রোতের মতন বাঙ্ময়
তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটি ভবিষ্যকালের ডেভিডের ভাস্কর্যের মতন
অ্যালবাট্রসটি তৃতীয় সপ্তক স্বরে বলে উঠল:
আমার এক পূর্ব পুরুষের নাম ছিল সম্পাতি, আমি
বংশানুক্রমিক কাহিনীতে শুনেছি জনকদুহিতা সীতার কথা
রাম নামে রাজার প্রিয়তমা, যে রাজার আর কোনো মহিষী ছিল না
রাবণ সেই সীতাকে হরণ করার পর সমুদ্রের বুকে সেতু বন্ধন হয়েছিল
মানুষেরা এক রমণীর জন্য হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করতে যায়
প্রায় তো আপনার কাহিনীর মতন একই রকম!
হোমার শুনলেন, কিন্তু বিস্মিত হলেন না
কৌতুক হাস্যে বললেন, জাহাজ বানাতে শেখেনি, তাই সমুদ্র
বেঁধেছে পাথর দিয়ে
তাও মন্দ নয়!

আগন্তুকটিকে তখনো বাক্যহীন দেখে হোমার আবার প্রশ্ন করলেন,
তুমি কি রাজপুরুষ, না যোদ্ধা, না বণিক, না দস্যু?
যদি লুণ্ঠন করতে এসে থাকো, তবে জেনে নাও, আমি
নিতান্তই অকিঞ্চন
যদি আমাকে শাস্তি দিতে চাও, শুনে রাখো, কবিরা অবধ্য!
অর্থাৎ অতি সামান্য কীট-পতঙ্গের মতন বধের অযোগ্য, হা-হা-হা
আমি চোখে ভালো দেখতে পাই না, কে তুমি?
তিনি হাত বাড়িয়ে লোকটির কোমরের অস্ত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে
টের পেলেন তার পৌরুষ
আবার সহাস্যে বললেন, তোমার তো ঔৎসুক্য আছে, তা হলে দাও দু'দিনার
শোনাব এক নয়, তিন রমণীর কথা

কিংবা জানতে চাও অডিসিউস, আথিনার উপাখ্যান?
আগন্তুকটি তবু নিশ্চুপ
অ্যালবাট্রস বলল, প্রাচ্যে তখনো রণতরী ছিল না বোধহয়
তবে, আমি শুনেছি যুদ্ধ জয়ের পর রাম তাঁর রানিকে নিয়ে
রাজধানীতে ফিরেছিলেন
আকাশ পথে উড়ন্ত রথে!
এবারে শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক বামন বলে উঠল, মনোরথ! মনোরথ!
যেমন আমি মাঝে মাঝে
চাঁদের গায়ে হাত রাখি!
আর এক প্রৌঢ় বললেন, প্রাচ্যের মানুষ নানারূপ জাদুবিদ্যা জানে
ওরা মায়ারূপ ধারণ করতে পারে, ওদের সব মন্ত্রই
ঝঙ্কারময় বিশুদ্ধ কাব্য!
হোমার দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, ঝঙ্কারময় হলেই বিশুদ্ধ কাব্য হয় না!
তবু সেই সব কবিদের আমি প্রণতি জানাই!

এই সময় ধীর পায়ে সেখানে এল এক জ্যোৎস্নামাখা রমণী
তার সঙ্গে এক অনিন্দ্যকান্তি দুরন্ত শিশু
সবাই কাব্য ভুলে চেয়ে রইল সেই জীবন্তরূপের দিকে
রমণীটি হোমারকে বলল, বাবা, বাড়ি চলুন, কত রাত হল
আপনার কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই?
বালকটি টানাটানি করতে লাগল হোমারের হাত ধরে
কোমরের ব্যথা নিয়ে বৃদ্ধ কবি উঠে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে
আজ তাঁর উপার্জন অকিঞ্চিৎকর
এক শিষ্যকে বললেন, আজ যা যা বলেছি, সব কণ্ঠস্থ করেছ তো বাছা
দেখো, যেন একটি শব্দও বাদ না পড়ে
শিশুটি ছটফটিয়ে বলল, আঃ, চল না
হোমার এক পা বাড়িয়েও কালো চাদর ঢাকা পুরুষটিকে বললেন,
তুমি তো কিছুই জানালে না, জানতে চাইলে না, তুমি কোন দেশের?
সে এবার বিষণ্ণ স্বরে বলল, আমার ভাষা জ্ঞান নেই
কী ভাবে জানাব জানি না

আমি প্রাচ্যেরও নই, প্রতীচ্যেরও না
আমি এক ব্যর্থ কবির বাল্যসঙ্গী, আমরা একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি
তার সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা মিথ্যে হয়ে যায়, তার ব্যর্থতা আমার গায়ে বেঁধে
কখনো সখনো সে শব্দের সন্ধানে মাথা কোটে, তার কপালে থাকে রক্তলেখা
আমার যা কিছু সার্থকতা তাকে দেখে শিহরিত হয়
তার অতৃপ্তি আমাকেও ছুটিয়ে মারে
হে কবিশ্রেষ্ঠ, আপনাকে আমার একটিই প্রশ্ন
মানুষ কেন কবিতা লেখে? কেন এই বৃথা কষ্ট! না লিখলে কী হয়?
এ প্রশ্ন শুনে রমণীটি আধো আঁচলে মুখ ঢেকে কুলকুল করে হেসে উঠল
বৃহৎ ডানার পাখিটি বলল, একেই বলে রসাভাস!
বামনটি বলল, ভুল সময়, ভুল পরিবেশ, ভুল মানুষ!
চঞ্চল বালকটির হাত ধরে একটু দূরে গিয়ে হোমার বললেন,
এ প্রশ্নের উত্তর তুমি কখনো পাবে না
আরও কয়েক পা গিয়ে তিনি আবার বললেন অর্ধ নিমীলিত চোখ ফিরিয়ে
হয়তো এর উত্তর আছে, আমি জানি না
যুগের পর যুগ, এই এক প্রশ্ন, নিরুত্তর
অস্পষ্ট যেন দেখতে পাচ্ছি, আর পঁচিশটা কিংবা সাতাশটা শতাব্দী পার
হয়ে গেলে
আর কোনো মানুষের মনে এ জিজ্ঞাসাই থাকবে না
আঃ, সে বড় দুর্দিন!

হে মরুভূমির পথিক

খবরের কাগজের পৃথিবী আর ভোরবেলার আকাশের নীচে পৃথিবী
এক নয়
আমি কোন্ পৃথিবীতে বেঁচে আছি?
চোখ বুজলেই দেখতে পাই একটি সুদীর্ঘ, নির্জন তরুবীথি

সে রকম রাস্তা কবে অদৃশ্য হয়ে গেল
এখন বাঁকে বাঁকে আততায়ী
সকালে শিশুদের ঝলমলে, শুভ্র, চিরকালীন হাসি শুনতে পাই
দুপুরের হিংস্র রোদে সব মিলিয়ে যায়...

ভেবেছিলাম, সুন্দরের আরাধনা ছাড়া এ জীবনে আর কিছুই কিছু না
তার এত ছদ্মবেশ, যখন তখন দৃষ্টিবিভ্রম!

ঘুম ভাঙার পর চায়ের তৃষ্ণায় ছটফট করি, না খবরের কাগজের জন্য?
আকাশ দেখি না
অথচ সেই অজস্রদল পদ্ম যেন দেখছে আমাকেই
দৈবাৎ একদিন চোখাচোখি হতেই কেঁপে উঠেছিলাম
মনে হয়েছিল
জানলা খুলে ঝাঁপ দিই
অপবিত্র, রক্তমাখা মাটি ছেড়ে চলে যাই মাধুর্যের স্রোতের দিকে
যাওয়া হয়নি
হে মরুভূমির শ্রান্ত, সহ্যের শেষ সীমার পথিক
একবার কি বৃষ্টি নামবে
তুমি পৌঁছোতে পারবে দিগন্তের রেখার ওপারে?

বিরোচনের বিয়ে

বিবাহ বাসরে বিরোচন বসেছেন গ্যাঁট হয়ে, কন্যাটি অদৃশ্য
প্যাঁ পো করে সানাই বাজছে, ফুলের গন্ধে চতুর্দিক ম ম
লগ্নের আগেই খেতে বসে গেছে এক ব্যাচ, এর মধ্যে
সালঙ্কারা, চন্দনচর্চিতা মেয়েটি কোথায় গেল?
এত আলোর মধ্যেও যেন সব কিছু অন্ধকার

না, গয়না সে সব খুলে গেছে, চন্দন মুছে ফেলেছে কিনা
কেউ জানে না
কার সঙ্গে গেল, কিংবা একাই সে ঝাঁপ দিল সমুদ্রে?
ফিসফাস বন্ধ করে এখন আর একটি মেয়েকে ধরে নিয়ে এলেই তো হয়
এ দেশে কি আইবুড়ো দুর্ভাগিনীর অভাব?
বিরোচন অপমানে গর্জে উঠে এখনি শুরু করতে পারেন তাণ্ডব নৃত্য,
তিনি জোড়াসাঁকো থানার হেড কনস্টেবল
কত মেয়ের ভাগ্য ফিরে যেত, যে কোনো মেয়ে হতে পারত
বিনা পণে, বিনা ফ্রিজ, আলমারিতে পাটরানি
দুধ-ননি আর সোনা দানা কিছুরই অভাব হত না
শনিবার রাত এগারোটায় সে রকম পাওয়া গেল না একজনও
তবে কি ফিরে যাবে বিরোচন গলার মালা ছিঁড়ে ফেলে?

নন্দী ভৃঙ্গি সমেত বরযাত্রীরা বার করল অস্ত্র, শুরু হল ধুন্ধুমার
এটা খবরের কাগুজে কাহিনী নয়, গত শতকের উপন্যাসও নয়
আমাদের কন্যাটি চিঠি লিখে গেছে, নিজের বাবাকে নয়,
বিরোচনকে
এই বাসর মিথ্যে, বিরোচনের সঙ্গে তার দেখা হবে কন্‌খলের এক গুহায়
সেখানে তার নাম হবে অপর্ণা
সে গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে রাখবে, বাতাসে ভাসবে ঝর্নার ঝঙ্কার
শুধু একটাই শর্ত, বিরোচনকে তার হাত পায়ের সব
পাপ ধুয়ে আসতে হবে
যেন সে পঞ্চশরের অন্তত একটি শরের যোগ্য হতে পারে।

চড়াই পাখিরা কোথায় গেল

চড়াই পাখিরা গাছে বাসা বাঁধে না
তারা মানুষের কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিল
ছেলেবেলায় আমাদের পড়ার ঘরের ঘুলঘুলিতে দেখেছি
চড়াই পাখির বাসা
একদিন একটা বাচ্চা চড়াই পড়ে গেল মাটিতে
বেচারি এখন উড়তে শেখেনি
চড়াই পাখির মায়েরা নিজের সন্তানদের কোলে নিতে পারে না
মাটিতে পড়ে থাকা সন্তানদের তুলবে কী করে,
আমার মা দুধে সলতে ডুবিয়ে বাচ্চাটাকে খাওয়াবার
চেষ্টা করলেন
তাঁর মাথার ওপর কিচির মিচির করে ঘুরছে মা পাখিটা
এই দৃশ্যটি এত কাল আমার মাথায় গেঁথে আছে
এখন যেখানে থাকি, সেখানে কোনো ঘরেই
ঘুলঘুলি নেই
কোনো কংক্রিটের বাড়িতেই আর ঘুলঘুলি থাকে না
লম্বা টানা বারান্দাগুলোও অদৃশ্য
চড়াই পাখিরা কোথায় যাবে

মানুষের ওপর অভিমান করে চড়াই পাখির দল
নিরুদ্দেশে চলেছে
বেশি উঁচুতে উঠতে পারে না, আজ তারা মরণপণে
উঠে যাচ্ছে চিল-শকুনদের ছাড়িয়ে
বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছাড়িয়ে, মানুষের সভ্যতা ছাড়িয়ে
ছোট্ট ছোট্ট বুকে অনেকখানি দুঃখ নিয়ে
তারা বিদায় নিচ্ছে।
হিমালয় পার হয়ে, মরুর দেশ, মেরুর দেশ পার হয়ে
আমাদের বাল্যকালের সব চড়াই পাখিরা
চলে যাচ্ছে মহাশূন্যের বিপুল অন্ধকারে।

মণিকর্ণিকার ঘাটে

মণিকর্ণিকার ঘাটে গাঁজা টানছে কয়েকটি সাধু। অ্যালেন, পিটার, মোহন, রাকেশ আর আমি যোগ দিয়েছি সেই অর্ধবৃত্তে। এখানে গঙ্গায় জোয়ার-ভাটা খেলে না, ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় নদী যেন এক অচেনা দেশের স্বপ্নময় রাজপথ। কাছাকাছি চিতায় যে জ্বলছে, সে অর্ধ-দগ্ধ অবস্থায় আসা একটি তরুণী। কে যেন বলল, তার জীবনের চেয়ে তার মৃত্যুর এই আগুন বেশি সুখের।

অ্যালেন জিজ্ঞেস করল, আমরা কি আমেরিকা বা ভারতের মানুষ? না পৃথিবীর? অথবা মহাজাগতিক সন্তান?

আমি বললাম, যে মেয়েটি আমাদের সামনে পুড়ে যাচ্ছে, সে ভারত চেনেনি, আমেরিকা চেনেনি, পৃথিবীও চেনেনি, গ্রামের পাশে যে গম ক্ষেত, তার দিগন্তই ওর চোখের সীমানা। এই প্রথম তার ক্ষত-বিক্ষত শরীর এসেছে শহরে, চিতায় দগ্ধ হবার জন্য।

কয়েকবার গাঁজায় টান দেবার পর আমাদের মন বেশ যুক্তি ঝেঁটিয়ে ফেলে পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। আকাশ উন্মুক্ত, বাতাসে মাংস পোড়া গন্ধ সুগন্ধ হয়ে যায়। সমস্ত বেসুরো ঘণ্টাধ্বনিগুলি সুরেলা হয়ে ওঠে। আমরা ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিক হতে থাকি ক্রমে। আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেন অলডাস হাক্সলি আর টিমোথি লিয়ারি। কত বিশ্ব বিশ্বাসের কথা বলাবলি হয়।

চিতাটিতে মেয়েটির আলতা পরা দুটি পায়ের পাতা এখনো বেরিয়ে আছে বাইরে। অক্ষত, অনির্বচনীয়। কেউ কি ওকে মনে রাখবে? ওর কি একটা অর্ঘ্য প্রাপ্য নয়! ওর মুখ দেখিনি, তবু ওর মুখ আমি রচনা করি। আমি অ্যালেনকে বলি, এসো, ওর পায়ে আমরা চুম্বন দিই। সঙ্গে সঙ্গে মহাজাগতিক এই ক'জন গাঁজাখোর উঠে গিয়ে সেই চিতাটির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে।

কল্পান্ত

সেই দূরত্বের দুর্গ ভাঙার বারুদ ছিল
হাতের পাঞ্জায়
মাথা তুলছে ডুবো-পাহাড়, শুরু হয়েছে কল্পান্ত
অতিকায় প্রাণীর মতন সহস্রাব্দ পাশ ফিরে
ল্যাজ আছড়াচ্ছে
কেউ দেখছে না, ময়দানে ঘাস ছিঁড়ছে জামার বোতাম খোলা
ছেলেটি
আর মেয়েটির শাড়ির পায়ের বাইরে রক্তাভ পায়ের পাতায়
বিন্দু বিন্দু শৌখিন দুঃখ
নদী ফিরে যাচ্ছে বাপের বাড়িতে
ধান ক্ষেতে গুঁড়ো গুঁড়ো স্বপ্ন
মাথা তুলছে ডুবো-পাহাড়, শুরু হয়েছে কল্পান্ত

অলীক নগরীতে পুরোপুরি ব্ল্যাক আউট
গুলি ভরা পিস্তল নিয়ে যে ছুটছে, তারই পিঠে লাগবে
প্রথম গুলিটা
হঠাৎ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এক একটা রাস্তা
বাতিস্তম্ভের আড়াল থেকে বেড়িয়ে এল চকখড়ির
মতন মুখওয়ালা একজন মানুষ
মাথা তুলছে ডুবো-পাহাড়, শুরু হয়েছে কল্পান্ত

সেই দূরত্বের দুর্গ ভাঙার বারুদ ছিল
হাতের মুঠোয়
অন্ধ ভ্রমে কেন আমি ছুটছি উল্টো দিকে?

ফুলের বদলে

যে রাস্তাখানি ছুটতে ছুটতে ঝাঁপাল নদীতে
ভরা বর্ষায়
সে আর ওপারে উঠল না মাথা তুলে।
অনেকেই আসে, দেখে চলে যায়, একজনই শুধু
কোন ভরসায়
বসে থাকে তীরে সব পিছুটান ভুলে।

নদীর ওপারে বাবলার ঝাড়, কালকাসুন্দি
ঝড়ে ভাঙা, নত
ঝোপে আগাছায় অগম্য চারদিক
শুধু রাশি রাশি ছুটছে ইঁদুর, দু'চোখে আগুন
পাগলের মতো
বাঁশ গাছে ফুল এসেছে আকস্মিক।

একদিন কোনো জ্যোৎস্নার রাতে হারিয়ে গিয়েছে
একটি কন্যা
মুখ চেপে তাকে কেউ কি নিয়েছে সবলে
পার করে এই পথহারা নদী, সব দিক ভুল
তখন বন্যা
ইঁদুরেরা তাকে খেয়েছে ফুলের বদলে?

একজন তবু বসে আছে তার জন্য!

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত

এসো
এসো, ভালোবাসা দাও, দেরি
হয়ে যাচ্ছে, দাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে, দাও,
দাও, আঙুলের ডগা থেকে। এক্ষুনি
খসে পড়বে গাছের একটি পাতা, দাও, দাও
ভালোবাসা। দু' হাত বাড়িয়ে, খুব
দেরি হয়ে যাচ্ছে
দেরি হয়ে যাচ্ছে
জাহাজ ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রে, দাও
গম্ভীর ডমরু বাজছে মেঘে, দাও
দাও ভালোবাসা, কাঙালি ভোজের শেষ খাদ্যকণা
দাও, দাও
ভুরুর সামান্য ভঙ্গি, দেরি হয়ে যাচ্ছে, ভালোবাসা
ভালোবাসা, দাও
আর কিছু চাই না, আর কিছুই না, দাও, দাও
একটা জলস্তম্ভ ভেঙে পড়বে এই মুহূর্তে
একটা ঝড় নিভে যাবে এক ফুঁয়ে, দাও
সমস্ত শরীর ভরে
পায়ের নোখের ধুলো থেকে মাথার চুল পর্যন্ত শরীর ভরে
দাও
শরীর ফুরিয়ে গেলে ইথার তরঙ্গে
দাও, দাও, যবনিকা নেমে আসছে
শব্দ ডুবে যাচ্ছে নৈঃশব্দ্যের অসীমে
আকাশ ডানা মেলে ঝাঁপ দিল নীচে
দাও, দাও, আর সময় নেই
দাও, ভালোবাসা, ভালোবাসা, ভালোবাসা...

বাঁধানো ছবি

যদি ভাবতে পারতাম, শ্যামল এখন আড্ডা দিচ্ছে
কবিতা সিংহের সঙ্গে
পাশে বসে আছে শক্তি, বিমল আর শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
মিটি মিটি হাসছে ভাস্কর দত্ত...

কেন ভাবতে পারব না, এ দৃশ্য তো রচনা করাই যায়
ফিনফিনে সাদা পাঞ্জাবি পরা, নিষ্পাপ, সরল-সাদা শ্যামলের মুখখানিতে
রাজ্যের দুষ্টু পরিকল্পনা
শক্তির কথা যখনই ভাবি, সে একটু একটু দুলছে, যেন
দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের ডেকে
বিমল চুটকি দিয়ে খোঁচাচ্ছে শঙ্করকে
কবিতা বারবার বলছে, আমি কিন্তু খেলব না, আমি আর খেলব না
ভাস্কর হঠাৎ বলে উঠল, সুনীল কোথায়, সুনীলকে ডাক না
আমরা খালাসিটোলায় যাব
স্মৃতি দিয়ে বাঁধানো কফি হাউজের সিঁড়ি, ভেতরে
যৌবনের হল্‌কা
হঠাৎ এসে ঢুকলেন, সক্রেটিসের মতন, কমলকুমার...........

আমি এ ছবিটা ভাঙতে চাই না
শুধু মনে মনে একটু অপরাধ বোধ হয়, তখন
জানলা খুলে দিই!

আমার কৈশোরের মা

লাইনের আগে তিনটে বডি, সেই জন্য অপেক্ষা
এখানে সবাই ফিসফিস করে কথা বলে
মাথা নিচু করে রাখাই রীতি, কান্না নয়
কেউ কেউ হয়তো স্মৃতি-কাতর, কেউ বাড়ি ফেরার সময়
মাপছে
আমি যথা সম্ভব নির্লিপ্ত, হয়তো সেটা ভান
মুখাগ্নি করবে আমার মেজ ভাই
ছোট ভাইটি দূর বিদেশে, ছোট বোন নেপাল থেকে
উড়েছে আকাশে

কোথা থেকে এক দল তিরিশ-বত্রিশ এসে বসে পড়ল
চাতালে গোল হয়ে
তাদের সঙ্গে কোনো শব নেই
বিনা ভূমিকায় তারা শুরু করে দিল দুর্বোধ্য গান
ওরা অনায়াসেই গাঁজাখোর হতে পারে, কিন্তু
ওদের এমন সঙ্গীতপ্রীতির কোনো কারণ বোঝা যায় না
শিরিটির শ্মশানে ওরা কাকে গান শোনায়
গা জ্বলে গেলেও কিছু বলা তো চলবে না
আমাদের নিস্তব্ধতাকে তোয়াক্কাই করে না ওরা

শেষ দেখার জন্য এগিয়ে গেলাম উঁচু জায়গাটার দিকে
হঠাৎ একটা চমক লাগল
কী আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে আমার চুরাশি বছরের মাকে
মুখ-চোখ ফুলে গিয়েছিল, এখন একেবারে পরিষ্কার
সোনার মতন রং, টিকোলো নাক, লাজুক চোখ,
ঠিক যেমন ছিলেন আমার কৈশোরে
যেন সেজে গুজে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছেন
মনটা ভালো হয়ে গেল, এই মাকে তো আর কোনো দিন
হারাব না।

সত্যি থেমে গেছে

ট্রেনের টিকিট কাটা আছে, ব্রিজে জ্যাম হতে পারে
অন্তত দু'ঘণ্টা আগে বেরুনো উচিত
সকলেই তো তাড়া দিচ্ছে, ট্যাক্সি এসে দুয়ারে প্রস্তুত
এই সময় অকস্মাৎ মনে হয় যদি, আজ না গেলে কী হয়?
আয়নার সামনে দাড়ি কামাতে কামাতে সেই ক্ষ্যাপাটে লোকটা
অর্ধেকটা গালে থেমে গেল
ঠোঁটে মৃদু হাসি, এক চক্ষু টিপে সে বলে উঠল
ট্রেন কি আমার জন্য অপেক্ষা করবে না?
রাস্তাময় গাড়ি-ঘোড়া, তোমরা সব শুধুই আমার জন্য
একটা দিন থামতে পারো না?
অনন্ত ঘূর্ণন একটু থামিয়ে পৃথিবীদেবী
বিশ্রাম পারে না নিতে কয়েক লহমা?

অর্ধেক সাবান মাখা গালে লোকটা
একা হাসছে জানালায় দাঁড়িয়ে
থেমে গেছে, সত্যি সব থেমে গেছে, নিথর দুনিয়া
ঈর্ষা মাখা মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখছে তাকে।

দেখা

একদিন কেউ এসে বলবে, তোমার বুকের সিন্দুকটা
অনেকদিন খোলা হয়নি, একটু আলো লাগাও
আমি আকাশ থেকে কয়েক ঝলক বিদ্যুৎ এনেছি...

একদিন কেউ এসে বলবে, তোমার ঘরখানি
অনেকদিন ধোয়া মোছা হয়নি
আমি লুকিয়ে একটা নদী এনেছি...

একদিন কেউ এসে পাতালে নেমে যাবার আগে
আমার হাত ধরবে
একদিন মানুষ মানুষের কাছে
একদিন মানুষ মানুষের কাছে...
না, না, মানুষ নয়, আমার হাত
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে বন্দি হাত
মানুষ নয়, সর্বজনীন নয়, শুধু একজন
সমস্ত গুহাবাদী দর্শনের শীর্ষে এক চূড়ান্ত উপভোগের তৃষ্ণা...

একদিন ধড়াম করে দরজা খুলে যাবে। সেখানে
পেছন দিকে উড়ন্ত আলো। সিলুয়েট
সিঁড়িতে কে দাঁড়িয়ে
কে?

যে কবিতা লেখা হয়নি

যে কবিতা লেখা হয় নি, সেই কবিতা
চুপ করে আমাকে দেখে

আমার অকাজের ব্যস্ততা, আমার সর্দি বসা বুকে
সিগারেটের অনবরত ধোঁয়া।

আমার না-লেখা আঙুলগুলো দেখে সে হাসছে
যে-সব কথার কোনো মর্ম নেই, আমায় বলতে হচ্ছে
সেইসব শব্দ ফুলঝুরি

আমার না-লেখা কবিতার দিকে আমি একবার
তাকাই অন্যমনস্কভাবে
না-লেখা কবিতার কি অবয়ব আছে? শরীর,
হাসি মাখা ঠোঁট?

সব বাংলা কবিতাই ব্যাকরণ সম্মত নারী
সে তিরস্করণী বিদ্যা জানে, তাই অদৃশ্য হতে
পারে যখন তখন

এত ভিড়ের মধ্যে সে মিশে আছে, আমি চোখ
বন্ধ করারও সময় পাচ্ছি না।

উপমা ও উপমেয়

খুব ইচ্ছে করে আমি এই বাংলার রূপ নিয়ে
মাঝে মাঝে মুগ্ধতার উপমায় লিখি
উপমা নির্মাণে কত ছলকলা, কেমন সহজ
আহা অন্যরা জানে না
প্রকৃতিই প্রকৃতির উপমেয়, রংগুলি শব্দ মেখে
লেগে থাকে দিগন্তের এপারে ওপারে
তবু মালদার এক ভাঙন-উন্মুখ গ্রামে শঙ্খচিল ঘুরে ঘুরে
আমাকে যে উড়ালের আলপনা দেখায়

তার কোনো চিত্রকল্প ভাবার আগেই কেন
জীবনানন্দের প্রতি খুব রাগ হয়
চিল-কাব্য, নদী-কাব্য লিখে লিখে পরবর্তী প্রজন্মের
মাথাটি খেয়েছেন
ঐ যে মানুষগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে বাঁধে,
আঁকা বাঁকা ভঙ্গিমায়
ওদের কি উপমার অপমানে কবিত্ব ফলাতে পারে কেউ?
প্লাবনে দরজা ভাঙে, কবিতা ভাসে না বটে, কারা সব কাঁদে?
আরো দূরে, রূপ নেই, রস নেই, গন্ধ নেই, এ কোন্ জীবন?
হাত থেকে খসে পড়ে কলম, কাগজ, স্বপ্ন দেখি কৈশোরের
সেই কৈশোরের এক হাতে তরবারি, অন্য হাতে ধরা
শান্তি পারাবত!

সে ও আমি

সে চলে গিয়েছে মেক্সিকোয়, আমি বাড়ি ফিরতে চাই
বাড়ি
মাধবী মঞ্জরী শেষ পাতা ঝরা দিন
বারান্দায় হাঁটু গেড়ে বসে আছে শীত
ডাক বাক্সে একটি চিঠি জটিল অক্ষরে।

সে চলে গিয়েছে মেক্সিকোয়, আমি বাড়ি ফিরতে চাই
বাড়ি নয়, ঘর
সে চলে গিয়েছে মেক্সিকোয়, আমি বাড়ি ফিরতে চাই
বাড়ি নয়, ঘর
সে চলে গিয়েছে মেক্সিকোয়, আমি ঘরে ফিরতে চাই
ঘর নয়, জানালার পাশে বিছানায়

মরুভূমি পার হয়ে ছাড়াছাড়ি, দূরে আরিজোনা
লাভার মতো রোদ, স্বর্ণলোভীদের রক্তে মেশা
এখন সূর্যাস্ত, ফেরা পথ
দু'দিকে পথের বাঁক, মানুষকে বেছে নিতে হয়।

সে চলে গিয়েছে মেক্সিকোয়, অথবা কি ক্যালিফোর্নিয়ায়
কিংবা উজানে
নদী তীরে নৌকা বাঁধা, একটুখানি পায়ে লাগবে কাদা
শুকোয়নি মাধবী মঞ্জরী, সাদা জবা
মধ্যরাতে পাখি ডাকে জানালার পাশে বিছানায়
এই মাত্র বালিশে জুড়োচ্ছে
তার মাথা
আমি পথ ভুল করে এখনো মরুতে
শতাব্দীর দিশাহারা, দূরত্ব দণ্ডিত
ফণিমনসার নীচে কাক জ্যোৎস্নায় একা বসে
লিখে যাচ্ছি চিঠি।

সান্ধ্য বিতর্ক

একদিন সন্ধেবেলা পুকুরঘাটে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃতিদেবীর দেখা
পান খাওয়া লাল ওষ্ঠ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উল্টে তিনি বললেন,
হ্যাঁ মশাই, লোকে রটাচ্ছে, আপনিই নাকি এই বিশ্বসংসারের স্রষ্টা?
বাঃ বেশ বেশ, এই সব মাটি, জল, গাছপালা, পাহাড়, প্রাণী-ট্রানি
সব বেরুল আমার এই হাতের তালু থেকে
আর আপনি চ্যালাচামুণ্ডো জুটিয়ে সব জবরদখল করতে চান
এ যে পরের ধনে পোদ্দারি। আপনার চক্ষুলজ্জাটুকুও নেই?
ঈশ্বর আকাশ প্রভুর রূপ ধরে সুমিষ্ট স্বরে বললেন,

ভদ্রে, এমন লোকায়ত ভাষায় কি আমার সঙ্গে বাক্যালাপ চলে?
প্রকৃতিদেবী ফুঁসে উঠে বললেন, তবে কি সংস্কৃত ঝাড়ব?
আমি ঝড়ের ভাষায় কথা বলতে পারি, ঝরনার ভাষায়, আগ্নেয়গিরির
আবার মলয় হিল্লোলে, ফুলফোটার, এমনকী অব্যক্ত ভাষায়
আপনাকে কেউকেটা বলে মানছি না বলেই প্রাকৃতজনের ভাষায়
জিজ্ঞেস করছি
আসল প্রশ্নটার জবাব দিন!

ঈশ্বর বললেন, কী যেন প্রশ্নটা, এর মধ্যে তুমি কত বদলে গেছ
ও হ্যাঁ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ব্যাপারটা তো
না, না, আমি এসব করিনি, আমার এত সময় কোথায়
আমি শুধু সৃষ্টি করেছি তোমাকে, তারপর থেকে তুমিই সব

প্রকৃতি বললেন, আবার একখানা ধাপ্পা চালালেন?
আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তা হলে আপনাকে সৃষ্টি করল কে?

ঈশ্বর সহাস্যে বললেন, সে অতি নিগূঢ় রহস্য, জানতে চেও না।

প্রকৃতি বললেন, রহস্য না ছাই! আমিই তো তৈরি করেছি আপনাকে
নিতান্ত খেলার ছলে, তারপর ঢুকিয়ে দিয়েছি মানুষের মগজে
মানুষই আপনাকে নিয়ে ভড়ং করে, এই তালগাছটা কি আপনাকে চেনে?
বনের একটা বাঘ, নদী, ফুল ও মৌমাছিরা আপনার কথা জানেই না

ঈশ্বর বললেন, চারুশীলে, ওরা তোমাকে চেনে, তাই তো যথেষ্ট
পায়সান্ন যেমন চেনে দর্বি অর্থাৎ হাতাটাকে, কিন্তু সেটিকে
কেউ চালনা না করলে কি ঠিক ঠিক স্বাদ হয়?

প্রকৃতি ক্রোধচঞ্চল নয়নে বললেন, মশাই, আপনার
আস্পর্ধা তো কম নয়, আমার নিজস্ব নির্মাণ ক্ষমতা নেই?
দেখবেন, দেখবেন, আপনাকে এক্ষুনি চিরস্থায়ী নিরাকার করে দিতে পারি
কি না

তখন কোথায় থাকবে আপনার হাত, থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে

ঈশ্বর বললেন, তুমি হাতা কথাটার মর্ম বুঝতে পারলে না...

ঝোপের আড়ালে এক শুঁটকো পুজুরি বামুন সব শুনছিল গোপনে
এবার সে মনে মনে বলে উঠল, হা কপাল
ভগবান সত্যিই বড্ড বুড়ো হয়ে গেছেন
নইলে এই সুন্দরী স্ত্রীলোকটির সঙ্গে লীলাখেলায় মন না দিয়ে
চালিয়ে যাচ্ছেন ফালতু তর্ক
এদিকে যে পায়সান্নে পোড়া লেগে যাচ্ছে!

একার চেয়েও একা

ঠিক যে-রকম চাঁদ আমি ক্লাস ফোরে আঁকতাম ফটফটে আকাশে
অবিকল সে রকম একটা ডোঙার মতন চাঁদ দেখা যাচ্ছে জানলা দিয়ে
ভরা বর্ষায় এমন চাঁদ মোটেই ভালো নয়, তাতে খরা আসে
সে সব এখন জানি
হোটেলের ঘরে একলা, ইচ্ছে করলে টি ভিও দেখা যায়
এই একালের ঊর্বশীদের নাভি দেখানো নাচ, সঙ্গে বিপুল বাজনা
সামান্য আঙুল তুললেই অন্য দৃশ্য, মাটি চুষে চুষে খাচ্ছে একটি গেঁয়ো পরিবার
আবার পরের মুহূর্তেই চলে যাওয়া যায় নিউইয়র্কে কিংবা আফ্রিকার জঙ্গলে
খাবারের অর্ডার দিতে হবে, হট অ্যান্ড সাওয়ার সুপ? ক্রিস্‌পি নুড্‌লস
সামনে খাতা খোলা। মন চাইছে কিছু লেখালিখি করা যেতে পারে

রাত মাত্র পৌনে দশটা
আজকাল ঘড়িতে কোনো শব্দ হয় না, তবু কোথাও সময়ের প্রবাহ ধ্বনি
আমার হাতে হুইস্কির গ্লাস

একা, অত্যন্ত চমৎকার ভাবে একা। চরম বিলাসিতার মতন একা
টেলিফোন ঝনঝন করে উঠল, আমি ধরব না, আমি এখন কারুর কেউ না
চেনাশুনো বৃত্তের কেউ নয়
অচেনার হাতছানিও জানতে চাই না
এই পানীয়র গ্লাস, চেয়ারে আলগা হয়ে বসে থাকা, জানলার বাইরে
ছেলেবেলার চাঁদ
টি ভি বন্ধ, অপরূপ স্তব্ধতার মধ্যে শুধু ওঁ হারমোনি
মহাকালের এমনই একটা বিন্দু যার আয়তন কল্পনাতেও ধরা যায় না
তার মধ্যেও প্রেম বিরহের খেলা, হঠাৎ হঠাৎ বুক মোচড়ানো স্মৃতি
বন্ধ দরজা, তবু সেখানে একটি নারী দেখা দিয়েই
মিলিয়ে যাচ্ছে অলীকের মতন
আঃ কী যে ভালো লাগছে
সমস্ত জীবনের যত কিছু যা পাওয়া, যাবতীয় ব্যর্থতা
এই গেলাসে মিলিয়ে একটু একটু চুমুক দিচ্ছি
কলমটা গড়িয়ে পড়ল, যাক না হারামজাদা, নিরুদ্দেশের দিকে

নতুন নতুন নরক

নরকে খুব ভিড় জমেছে, স্বর্গখানা ফাঁকা
নরক এখন এসি এবং স্বর্গে নেই পাখা!

বিজ্ঞাপনে ঢক্কানিনাদ, সস্তা নরক যাত্রা
হরেক রকম মচ্ছবের সেখানে নেই মাত্রা!

নানান দেশে নানান খানা সবই থাকে তৈরি
একসঙ্গে পাত পেতে খায় বন্ধু এবং বৈরী!

স্বর্গ এখন ম্যাড়মেড়ে খুব, ফুল ফোটে না গাছে
ময়ূরেরাও স্বর্গ ছেড়ে যম-বাগানে নাচে।

স্বর্গে যত হুরি-পরি, বাহাত্তুরে বুড়ি
নরক-নারী চাঁদের থেকে রূপ করেছে চুরি।

কেউকেটা আর রূপ ও রুপোর বল্‌গা যারা টানে
নতুন নতুন নরক তারা মেতেছে নির্মাণে।

দুঃখ

একজন ফুলচাষী এখন কাজ করছে বিস্কুট কারখানায়
সারাক্ষণ সে কষ্ট পায় গন্ধের জন্য
একজন কীর্তন গায়ক এখন সাইকেল রিক্সা চালায়
সংসার খরচ চলে যায়, তার গলা একেবারে বেসুরো
একজন বেতের ঝুড়ি বানাত, বেত এখন দুর্মূল্য
এখন প্লাস্টিকের খেলনা বিক্রি করে, তার আঙুলের
গাঁটে গাঁটে ব্যথা
একজন যাত্রার অভিনেতা চোখে ভালো দেখতে পায় না
সে পুরোপুরি অন্ধ সেজে গেছে, তাতে ভিক্ষে বেশি মেলে
তাঁতের কাপড়ের ওপর ছবি আঁকতো যে মানুষটি, একদিন অন্ধকারে
কে যেন ছুরি ঢুকিয়ে দিল তার পেটে
বেঁচে গেছে, এখন কোনো দৃশ্যেই সে রং দেখতে পায় না
কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে এক কবি, এখন ক্ষমতার রণাঙ্গনে
সে এক যোদ্ধা
ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়, খুবই জমাট ঘুম
সেই ঘুমে বিন্দুমাত্র স্বপ্ন নেই!

মানুষের ডানা

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আকাশে পাখির মতো উড়ছে মানুষ
মাত্র কয়েকদিন আগে, বিশ্বজুড়ে ধ্বংস যজ্ঞে শেষ হয়ে গেছে
সমস্ত চার চাকার গাড়ি
বাতাসে বিষের ধোঁয়া ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে
পশু-প্রাণী, বৃক্ষ-লতা, আবার পেয়েছে ফিরে
নিজস্ব মাটির অধিকার
সব মানুষের হাতে ডানা বাঁধা, যেন ইকারুশ
পাখিদের সঙ্গে মিলে মিশে, দূরে কাছে বাতাসে সাঁতার কাটে
ইস্কুলে, অফিসে যায়, মেঘের আড়ালে
এর সঙ্গে ওর দেখা হয়
যন্ত্র রব, লাল আলো-টালো নেই, অস্থিরতা গর্জন করে না
কোনো কোনো মহীরুহে দু'দণ্ড জিরোনো যায়, কেউ বাজায় বাঁশি
সীমান্তে পাহারাদারি কবে শেষ, নেই কাঁটাতার
মাটি ছেড়ে স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে উড়ে গেলে নীলিমার কাছে
মানুষের মনও উঠে যায় সব তুচ্ছতার অনেক ওপরে
সকালের স্নিগ্ধ রোদ, সন্ধ্যায় রক্তিম উপহার
ধুয়ে দেয় সব গ্লানি, প্রতিদিন শুদ্ধতার দিকে
আমার হাঁটুতে আর ব্যথা থাকবে না...

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পবন পদবী পেয়ে গেছে একদিন
মানুষের ডানা
বসে আছি, আজ সাত সেপ্টেম্বর, দু' হাজার তিন।

নদীর কোন্ পারে তুমি, নীরা

নদীর কোন্ পারে তুমি, নীরা, আমি নদীর মাঝখানে
খুব কাছে ঝুঁকে আছে মেঘ
যেন অজস্র রুমাল নীল, কালো,
সূর্যের পাপড়িতে দুলে দুলে আসে অন্ধকার
আচমকা বাতাসে কিছু ঘরে ফেরা পাখিরাও
দিন হারা
নদীর কোন্ পাড়ে তুমি, নীরা, আমি নদীর মাঝখানে।

ফেরি স্টিমারের ডেকে চাপ চাপ মানুষ
আমাকে দেখেনি তারা কেউ
আমি ফেরি-দুনিয়ার কেউ নই
ওরা শুধু ঢেউ দিয়ে যায়
ব্রিজের গুম গুম শব্দে জেগে থাকে মানব সভ্যতা
মাছ ধরা নৌকাগুলি শতাব্দী বিহীন, ওরা
সন্ধ্যার জোনাকি
কখনো আজান শুনি, জলের কল্লোলে ভাটিয়ালি
নদীর কোন্ দিকে তুমি, নীরা, আমি নদীর মাঝখানে।

আমার দু'হাত বেশ ভালোই সাঁতার জানে,
পা দুটিও বজরার দাঁড়
সেই ফুলেশ্বর থেকে ভেসে আসা
এখন ভাটার টান, বিপরীত স্রোত
এখন আকাশ নেই, নীচে শুধু টান মারে
রাত্রির অতল
যে যাবে মোহনা খুঁজতে, আমার শরীর চায়
অভিপ্রেত তীর

নীরা, তুমি কেমন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছ?
কোন্ শুভ্র বারান্দায় তোমার আঁচলখানি
স্বর্গের নিশান
তোমার নাভির কাছে চাঁদ আর কুচযুগে সুবর্ণ মঞ্জরী
দেখা দাও, সাড়া দাও, জাদুকরী
নদীর কোন্ পারে তুমি, নীরা, আমি
নদীর মাঝখানে।

স্থির চিত্র

স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বজিৎ, ট্রেন এল
সে উঠল না
এমন নয় সে পরবর্তী ট্রেনটির প্রতীক্ষায় থেকে যাবে
এমন নয় যে তার পয়সাকড়ি একেবারে নেই
এমন নয় যে তার মুখে আঁকা প্রচ্ছন্ন বিষাদ
এমন নয় যে উল্টো দিক থেকে অন্য ট্রেনে
আসবে কোনো ব্যাকুল তরুণী
শখ করে স্টেশনে বেড়াতে আসা বেকারও সে নয়
কেউ তাকে ডাকছে না, সে কারুর চোখে চোখ
রাখেনি একবারও
প্যান্ট-জামা স্বাভাবিক, চলনসই জুতো
দু'আঙুলে সিগারেট, অন্য হাতে দেশলাই
এখনো জ্বালেনি
মাঝারি স্টেশনে ভিড়, দোলাচল, দেওয়ালের কাছে
দাঁড়িয়ে রয়েছে একা বিশ্বজিৎ,
কতক্ষণ থাকবে তা কে জানে
সে কি দুঃখী, ছন্নছাড়া, পলাতক, দিক ভুলে গেছে?

সংসার বিরাগী, কিংবা নতুন জীবনে তার
পদক্ষেপে দ্বিধা?
গল্প লেখকেরা তাকে যা খুশি ভাবুক
কবিতায়
সে একটি স্থির চিত্র
সে একটি স্থির চিত্র, প্ল্যাটফর্মে আসন্ন সন্ধ্যায়.......

নাভি কাব্য

এখন আকছার খুব সহজেই মেয়েদের নাভি দেখা যায়
মুখ বা দুটি বুকের আগেই নাভির দিকে চোখ পড়ে
তকতকে পলিমাটির মতন পেট, মাঝখানে অর্ধলুপ্ত চাঁদ
যেমন কালিদাসের আমলের নিম্ননাভি সমস্ত তন্বীর
তারপর বহু যুগ ধরে প্রচণ্ড ঢাকাঢুকি
যত কাব্য শুধু চোখ আর ওষ্ঠাধর নিয়ে
তাও বোরখা পরা মুসলমান মেয়েদের ঠোঁট বা চিবুকের ডৌলও
দেখা যায়নি

কদাচিৎ দুটি তীব্র চোখ
ওদের কবিরা গোটা মধ্যযুগ ধরে কী নিয়ে কাব্য রচেছে?
আমি অনধিকারী, কিন্তু গোপন চিন্তা তো কেউ রোধ করতে পারে না!

এই তো গত এক দশক ধরে সাগরপারে তরুণী মেমরা
ভারতীয় নর্তকীদের কাছ থেকে নাভি খুলে রাখতে শিখেছে
এখন চতুর্দিকে শুধু নাভি, নাচটাচ জানার দরকার নেই
প্রত্যেকটি নাভির মধ্যে রয়েছে একটি মৃণাল
পুরুষ নতজানু হয়ে বসে জাগাতে চায় কুলকুণ্ডলিনী

ফুটে ওঠে একটি সহস্রদল পদ্ম
বস্তুত কোনো নারী যদি খুব কাছে, কাছের থেকেও কাছে,
হিমালয় পাহাড়কে আড়াল করে দাঁড়ায়
তখন সেই পদ্মের সুগন্ধ পুরুষটিকে নিয়ে যায় জন্মের মুহূর্তে

মেয়েরা এসব কিছুই জানে না
না জানাই ভালো!

বৃষ্টিধারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে হেঁটে যাচ্ছে নীরা

বৃষ্টিধারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে হেঁটে যাচ্ছে নীরা
অন্তরাল থেকে ওকে দুঃখী চোখে দেখছে মনীষীরা
মনীষীরা সপ্তরথী, ওরা কেউ চেনে না আমাকে
আমি প্রতিদ্বন্দ্বী নই, আড়ালেই থাকি কোনো রাজপথের বাঁকে।

কতজন ব্যর্থকাম, কতজন ছুঁতে চায় নীরার আঁচল
আমি অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলি, হাত দুটি রাখি অচঞ্চল
মাথায় আগুন, তবু ডুব দিই শিল্পের গভীরে
কেউ যদি নিতে চায়, নিক না নীরাকে কোনো নীল সিন্ধুতীরে।

বৃষ্টিধারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে হেঁটে যাচ্ছে নীরা
এ শহরে আর কেউ নেই, ঘুমে মগ্ন প্রহরীরা
নিওনসর্বস্ব পথ, শব্দ নেই, ভয়হীনা সেই এক নারী
শিল্প ভেঙে রক্তমাংসে ফিরে আসে, সঙ্গে ছায়া গোপন সঞ্চারী।

নীরা, তুমি যেতে চাও অন্য কারো সঙ্গে সন্ধেবেলা?
লুকিয়ে রাখব আমি বাঘনখ, তবে কি এবার সাঙ্গ খেলা!

কেন বারবার তবে মুখ ফেরাও, করতলে রাখো আমলকী
তার ঘ্রাণে বাল্যকাল, অতি সাধারণ হওয়া তোকে আর মানাবে
না সখী!

এক মুঠো ভবিষ্যৎ

মনে করো, এই রাত্তিরে তুমি আছ এক রূপকথার
দেশে
আমিও এক অলীক রাজ্যের রাজা
রূপকথার দেশের রাজকন্যাটন্যারা সাধারণত
বন্দিনীই থাকে
তাদের পোশাকের রং সবুজ
আমি যদি লাল রঙে পালটে দিই
না, ক্যাটকেটে লাল ঠিক নয়, ধরা যাক গোলাপি
গোলাপ অবশ্য সাদা হয়, হলুদও হয়, সবুজ কিংবা কালো দেখিনি
পোশাকের নীচে তোমার যে শরীর দেখেছি
ডায়মন্ড হারবারে
তা ছিল চাঁপা ফুল রঙের, ঊরু যুগে বৃষ্টি ভেজা নবীন তৃণের সুগন্ধ
হ্যাঁ, সেই রাতে ডায়মন্ড হারবারে খুব উল্কাপাত হয়েছিল মনে আছে?
তারপর আকাশ ফাঁক হয়ে গেল, ঘড়ঘড়িয়ে
চলে গেল একটা রথ

আমি আসছি তোমার কাছে, আর তিনবার
বিদ্যুৎ চমকের পর

একটা বছর পাঁচেকের বাচ্চা বসে কাঁদছে একটা
ছাতিম গাছের তলায়

পৃথিবীর সব বাচ্চাদের কান্না আমি দূর করতে
পারব না
কিন্তু একটা শিশুকে অন্তত পৌঁছে দিতে পারি
বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে
তাকে তুলে নিতে গেছি অমনি শোনা গেল সেই রথের শব্দ
ওরে বাবা, এ তো যে সে শিশু নয়, যেন
মহাকাল, যেমন তার গলার স্বর
তেমনই বিশাল তার খিদে
তার দু'চোখে জোনাকি

কারা যেন আমার চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল
চেনা চেনা মনে হচ্ছে, অথচ ঠিক চিনতে পারছি না
তারা সমস্বরে বলতে লাগল, পারবে? তুমি পারবে?
কেন ওরা আমাকে এই পরীক্ষায় ফেলতে চাইল
অন্তরীক্ষে আরও কতজন উঁকি মেরে দেখছে
প্রতিটি গাছপালার মধ্যে সেই প্রতীক্ষা, পারবে, পারবে?
সব ফুল ফোটা বন্ধ, তারারা মিটমিট করছে না
নদীতে ঢেউ নেই, স্টিমারে ভোঁ নেই, জেলে
নৌকোয় জ্বলছে না টেমি
হা-হা স্বরে বাতাস বলছে, পারবে তুমি
শিশুটিকে এক মুঠো ভবিষ্যৎ দিতে?

ওগো, রূপকথার দেশের বন্দিনী কন্যে
আমার ঢাল-তরোয়াল, টুথব্রাশ, পক্ষিরাজ,
জাঙিয়া-গেঞ্জি সব তৈরি
তবু আমি আটকে আছি নদীর ধারের এক গাছতলায়
ভূত-ভবিষ্যতের গোলকধাঁধায়!

এক জীবনের মর্ম

জীবন প্রবাহের এক পাশে দাঁড়িয়ে যদি কোনওদিন
                                                            হঠাৎ প্রশ্ন জাগে
                                                            এ জীবনের মর্ম কী?
তখনই আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকায়, শোনা যায় রথচক্রের শব্দ
কয়েক মুহূর্তের জন্য পৃথিবী বধির
তবে কি এই প্রশ্ন ভুলে যাবার নামই নিয়তি?
যদি এই শুকনো নদীটি এবারের বর্ষাতেও রূপ ফিরে না পায়
ডাঙায় উল্টে আছে নৌকা, যদি আর না ভাসে
খরখরে কাদায় রয়ে গেছে অনেক পায়ের ছাপ
ঢেউ উঠে এসে আর প্রণাম জানাবে না?
এই নদীর জীবনেরও কোনও মর্ম নেই?

সব নদীই পাহাড়ের সন্তান, যেমন সব মানুষই মাটির
সেই মাটিতেই রক্তপাত ও অশ্রু
                                                            এবং চরম ঘুম
মাঝখানের জীবনটাও তো মাটি খেয়েই বেঁচে থাকা
চেটেপুটে খাই নখের ধুলো
মাটিতেই লেখা জীবন চরিত, কপাল ভর্তি মাটি
বৃষ্টি ভেজার পর হাঁটতে হাঁটতে টের পাই
              আমি আর আমার মা সহোদর, এমনকী বাবা ও
                                                                          আমার ভাই
সবাই এই ধরিত্রীর ছেলে মেয়ে
বিশ্বজোড়া একই সংসারে তবু সর্বক্ষণ চলছে গৃহ বিবাদ!

অরণ্য থেকে ঘরে ফিরে আসার দিনেই প্রথম পাপ হয়েছিল
মাটিতে ব্যক্তিগত সীমানার গণ্ডিকাটা
আসলে কী চেয়েছিলাম আমি, নিজস্ব ফসল, না নারী?
নারী কোনওদিনই পুরুষকে তার সর্বস্ব দেয়নি

এমনকী, ভালোবাসার আকিঞ্চনেও না
ভালোবাসা এই আছে, এই নেই, কখনও অলীক
প্রথম শিল্পের মতন অপরূপ কৃত্রিমতা
ভালোবাসা পাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি সত্য
ভালোবাসার জন্য ছটফটানি
এর মাঝখানে থেকে যায় শরীরের অসূক্ষ্ম দাবি, আর
অপত্য-বন্ধন
এত কাছাকাছি তবু অপরিচয়ের দূরত্ব বেড়ে যায় দিন দিন
অদৃশ্য অস্ত্রের ঝনঝনায় মাধুর্য হারিয়ে যায় বারবার
পুরুষ সব সময় নিজেকে জয়ী ভেবে রচনা করে
এক মূর্খের স্বর্গ
আসলে নারীরা চুপি চুপি ঝাঁজরা করে দেয় তাদের হৃদয়।

মাঠে যে-ই ফসল ফলল, অমনি শেষ হয়ে গেল
সব বন্ধুত্ব
ফসলের জন্য এই নগর সভ্যতা আর তার সমস্ত অভিশাপ
ফসলের জন্য সব রকমের বিশ্বাস ঘাতকতা
সেই আকাশের নীচে রোদে পোড়ে,
ঝড় বাদল মাথায় নেয়
দগ্ধ উদরেও সৃষ্টির গান গায়
সেই আচ্ছাদনের আরামে, সুখ শয্যায় শুয়ে
বঞ্চনার শ্বেতপত্র তৈরি করে
নদী প্রতিবাদ করেছিল, তার গলা কেটে দেওয়া হল
পাখিরা গান না গাইলে তাদের জন্য দেওয়া হল বিষ
ফসলের খেতের পাশে বসে যারা খিদের জ্বালায় কাঁদে
যাদের বাড়িতে উনুন জ্বলে না
তাদের বাড়িতে যখন তখন আগুন ধরিয়ে দিয়ে
পুড়িয়ে মারাটাই তো সোজা
খালি পেট থাকলেও কাঁদতে পারবে না
নগর সংস্কৃতির বিঘ্ন ঘটাবে না

চাঁদের উল্টো পিঠের মতন এটাই সভ্যতার গোপন শর্ত!
মাটি কিন্তু ভোলে না।
সম্রাটকেও তারা টেনে নিয়ে যায় মাটির নীচে
আলেকজান্ডার, চেঙ্গিজ, হলাকু, নেপোলিয়ন, চার্চিল, হিটলাররা
মাটির গণ্ডির লোভ করেছিল, তারা শেষ পর্যন্ত
ভূ-গর্ভে পোকা মাকড়ের খাদ্য
সব অস্ত্র শেষপর্যন্ত ভোঁতা হয়ে যায়
যারা লোভী, তারা মরে উদর পীড়ায়
যারা প্রাসাদ বানিয়েছিল, তারা বটগাছের শিকড়ের জোর জানে না
যারা সবাইকে পদানত করতে চেয়েছিল, তাদের আজ পা নেই
যারা দেশাভিমানী, দেশ তাদের মনে রাখে না
উই ধরা ছবি এক সময় খসে পড়ে ঝনঝন শব্দে
আজ যে দু'হাত ওপরে তুলে আছে, কাল সে অঞ্জলি পেতে করুণা-ভিখিরি!

মানুষ কি তখনই আত্মধ্বংসের দিকে যায়
যখন সে মুছে ফেলে বাল্যকালের ছবি?
মানুষের গলা তখনই কর্কশ হতে শুরু করে
যখন সে ভুলে যায় ভালোবাসার মুহূর্তগুলি
শরীরের মাধুর্য তখনই মিলিয়ে যেতে শুরু করে
যখন মিলনের মধ্যে এসে মেশে গরল
আহা, সেই সব মানুষ কত দুঃখী, যারা গায়ে জ্যোৎস্না মাখে না
উন্মুক্ত দিগন্তের মধ্যে শুধু একটা ঝাঁকড়া গাছ, আর কিছু নেই
তার নীচে একজন ঘুমন্ত মানুষ, তার শিয়রের কাছে
একটা বাঁশি
সে হয়তো কিছু একটা স্বপ্ন দেখছে
আমিও তাকেই স্বপ্নে দেখেছি সারাজীবন!

আকাশ দেখার অধিকার

এক ফোঁটা অন্ধকার দিয়ে তুমি কপালে একটা টিপ পরে নিলে
আজকাল তো কালো টিপ আর চালু নেই
কেন না কালো লিপস্টিক হয় না বোধহয়
দুই বাহুমূলে লাগিয়ে নিলে ধূপের ধোঁওয়া
এখন ধূপ তো ঠাকুর ঘরের বাইরে আর দেখি না
ঠাকুর ঘরগুলোও মিলিয়ে যাচ্ছে রান্নাঘরের সঙ্গে
রাস্তায় কাঁচুমাচু ছেলেরা ধূপ বিক্রি করতে এসে ভিখিরি হয়ে যায়
এক আঁজলা বৃষ্টির জলে কুলকুচো করে নিলে তুমি
বৃষ্টির জলে কত পলিউশান তোমার মনে পড়ল না
খোঁপায় গুঁজে নিলে গুঞ্জাফুলের মালা
আঁচল খুলে বুকে মেখে নিলে মেঘ ভাঙা জ্যোৎস্না
নাভিতে প্রতিফলিত চাঁদের টুকরো
তম্বুরার মতন দুই নিতম্বে কামিনী ফুলের ঘ্রাণ
যোনিপথে ওঁং ধ্বনি
পায়ের পাতায় রক্ত চন্দনের আভা
আঃ কতগুলো যুগ কেটে গেল, এখনো তোমার যোগ্য হয়ে
উঠতে পারলাম না আমি
আজ আবার এসেছ পরিহাসের অপূর্ব উন্মাদনায়
আমার চোখ ঠেকবে মাটিতে
যেন আমার আকাশ দেখার অধিকার নেই আর নেই!

পড়ে থাকবে একটি ঝরা কুসুম

ভালোবাসার নদীতে ভাসা, ডুব সাঁতার ব্যাকুল সারা জীবন
সারাজীবন?
পাগল নাকি, তিনশো সাতাশ নিমেষ
ভালোবাসবে আমায়, আমি তাতেই অমর হব!
অমরত্ব দেড় মুহূর্ত, যেমন একটা বিদ্যুতের ঝলক
কিংবা রাস্তা হারিয়ে ফেলে টিলার পাশে একটুখানি
শ্যাওলা মাখা সিংহাসনে বসা!
কি বিচিত্র দুনিয়াদারি সবই দেখছি, দুই চক্ষু বাঁধা
মিলে অমিল, শরীরে ভুল, যখন তখন রংবিহীন হোলি
বাজাও বাজাও কাড়া নাকাড়া, এ উৎসবে আমরা কেউ
কারুকে চিনব না
মাটির নীচে অন্ধকার, চমৎকার, এ বিছানা ভুলতে
কেউ পারে?
স্মৃতিও নেই, শরীর খেলা কখন শেষ, কখন আমি
অনিত্যের মায়ায় ডুবে আছি
হা অনন্ত, বসেছে দেখো দু' হাত জুড়ে রামভক্ত
হনুমানের মতন
ভালোবাসার নদীও নেই, পড়ে থাকবে একটি ঝরা কুসুম।

জীবন মাত্র একবার

পেটে বোমা বেঁধে যে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে
ও কি পরজন্মে বিশ্বাস করে?
যাবার পথে হোঁচট খেলে ওর পায়ে ব্যথা লাগে না?
ওই তো দেখতে পাচ্ছি মুখে কালো মুখোশ পরে
এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুদূত

মুখোশের নীচে ওর মুখখানা কি এক নশ্বর মানুষের নয়
ও কি নিজেকে ভাবছে দেশপ্রেমিক?
ও কি জানে না, মানুষ শুধু মাতৃগর্ভেই জন্মায়
দেশ বলে কিছু নেই
কামিকাজি বিমান চালকরা আগুনের মধ্যে খুঁজে ছিল দেশ
ও কি নিজেকে ভাবছে কোনও ধর্মের ধ্বজাধারী
ও কি জানে না, সব ধর্মই একদল নেশাখোরের অলীক বিলাস
দেশ নেই, আছে এক একটি হৃদয়হীন রাষ্ট্র
ও কি ডেভিড হয়ে লড়তে যাচ্ছে গোলায়াথের সঙ্গে
ও কি অভিমন্যুর মতন ভেদ করতে চাইছে সপ্তরথীর চক্রব্যূহ
তা হলে নিজের মাথার ঘিলু আগেই রেখে এসেছে কার পানীয়ের গেলাসে
যারা ওকে পাঠায়, তারা মানুষের মাথার ঘিলু চুক চুক করে
পান করতে ভালোবাসে
যেমন এক একটি রাষ্ট্রনায়ক স্নান করে মানুষের রক্তে
ওরে পাগল, তুই কি জানিস না মানুষের জীবন মাত্র একবার
মাত্র একটাই
ওরে পাগল, তুই না থাকলে যে মুছে যায় সারা পৃথিবীর মানচিত্র
ওরে পাগল, তোর কাজের মেয়েটির শরীরের যে উত্তাপ
তোর স্বপ্নে দেখা স্বর্গের হুরি-পরিদের তা থাকে না
এক ফুল থেকে অন্য ফুলে উড়ে যাচ্ছে ভ্রমর, ওদের পরজন্ম নেই
উড়ছে ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতি, দোল খাচ্ছে বাতাসে
নিরালা ঝর্নায় পা ডুবিয়ে বসে আছে একজন মানুষ
ও চিরকাল বসে থাকবে ওখানে
ওর গান খুব মন দিয়ে শুনছে চারপাশের হরিৎ গাছপালা
ওখানে বারুদের গন্ধ নেই।

ব্রিজের ওপরে ও নীচে

শীর্ণ নদী দেখলেই আমি চোখ ফিরিয়ে নিই
কিন্তু কোন্ দিকে চোখ ফেরাব, ভাঙা ঘাটে বসে আছে
দু’তিন জন জীর্ণ মানুষ
পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি গেছে তার সর্বাঙ্গে দগদগে ক্ষত
গোরুর গাড়িটি যেমন নড়বড়ে, তার গাড়োয়ানটিও তেমনি ভাঙাচোরা
আর গোরুদুটি শুধু কঙ্কালের ওপর চামড়া দিয়ে মোড়া
একটু দূরে চেতন মিস্তিরির বাড়িটি পড়ো পড়ো
যেন আবোল তাবোলের বুড়ির বাড়ির মতন
আঠা আর থুতু দিয়ে জোড়া
তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি পা-ব্যাঁকা ছেলে
আর তার মায়ের বুকে স্তনের বদলে
দুটো খালি ঠোঙা
একটা যুদ্ধে সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেলে তবু
একটা কিছু মানে বোঝা যেত
যুদ্ধ নেই। এখন নাকি শান্তি, তবু চতুর্দিকে
এত মুমূর্ষু দৃশ্য আমার সহ্য হয় না...

অবশ্য এসব না দেখলেও তো চলে
মরা নদীর ওপরে তৈরি হয়েছে নতুন, ঝকঝকে ব্রিজ
কত রকম আকার-প্রকারের স্বাস্থ্যবান যানবাহন ছুটছে
ওপর দিয়ে
সুকুমার, সরল, সুন্দর ছেলে মেয়েরা চাটছে আইসক্রিম
ডানা কাটা অপ্সরীরা হাসছে ঝর্নার জল ছিটিয়ে
চওড়া কব্‌জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখছে গাড়ি-চালক বাবা
ব্রিজের ওপরে ও নীচে একই দেশ, একই দেশের মানুষ
একই বাতাসে নিশ্বাস, তবু কেউ কম, কেউ কেউ অতিরিক্ত বেশি
আমিও তো অনেকখানি বাতাস নিয়ে নিচ্ছি ওদের বুক থেকে টেনে।

সত্যের যমজ

শূন্যের আড়াল থেকে একটি মুখ
ঈষৎ ফেরানো, পুব দিকে
শূন্য থেকে যেমন শিশির কিংবা চাতকের ডাক
বাকি চরাচরে কেউ নেই
শুধু সে-ই দেখে, যার আঙুলে কলম

ওকে কি বিশ্বাস করা যায়?

শব্দের নির্মাণে কিছু মিথ্যে তো থেকেই যায়
যা আসলে সত্যের যমজ
শূন্য কি কিছুর জন্ম দিতে পারে? তবু যেন আসে
অলীক খড়িতে আঁকা মুখখানি, কপালে অলক
শুধু পুব দিকটাই স্থির সত্য, সমস্ত দিকেরা
সেটা জানে।

এখন দিন না রাত্রি? অথবা কুয়াশা
হঠাৎ ভাঙলে ঘুম যে-রকম সময়ের ভ্রম
দু'দিকের জানলা খোলা, আলো কিংবা অন্ধকার
দু'রকম নীল
হাতে যে কলম নিয়ে বসে আছে তার বুকে
দুঃখ ভাঙা সারাৎসার, সে যা-ই খুঁজুক
সাদা পৃষ্ঠা অক্ষর ও শব্দাবলী ছাড়া
আর কিছুই দেবে না।

জ্যোৎস্না, রাত একটা পঁয়তিরিশে এক নারী

টেবিলটার মাঝখান দিয়ে উঁচু নিচু ঢেউ উঠেছে
তাই তোমাকে বাড়িতে ডাকতে পারছি না
টেবিল কারা ঠিক করে দেয়, তাও কি তোমার কাছেই জানতে হবে?
যাঃ টেলিফোনটা হঠাৎ বোবা-কালা হয়ে গেল আজ বিকেলে
মোবাইলটা তো চুরি হয়ে গেল পরশুদিন
কিংবা চোরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, আমিই কোথাও ফেলে এসেছি
আচ্ছা, ওই ফোন কি জলের নীচেও শোনা যায়?
সে দিনই বাড়িতে নিজেকে ফোন করলুম ওই নম্বরে। বাজলও ঠিক
যেন প্রথমে কাদের জড়ামরি কণ্ঠস্বর, তারপর প্রবল জলস্রোতের শব্দ
তারপর একজন, বোধ হয় জলকন্যা, বলল, পাতালপুরীর দরজা যে খুলছে না!
হ্যাঁ সত্যি, বলেছে এই কথা
সেই দরজা শেষ পর্যন্ত খুলেছে কি না তা আর জানা হল না
আমার ঘাড়ে একটা বাঘ কামড়ে দিয়েছে, সেখানে এখনও রক্তের রেখা
ভেসে ওঠে
তুমি আসবে না, না ডাকলে তুমি আসবে না?

আমি বাথরুমে একা কাঁদি, খুব বিচ্ছিরি, খুব মলিন, না, না
সে কান্না অবশ্য তোমার জন্য নয়, একটা গানের সুর ভুলে যাবার জন্য
কিন্তু নিজের বাঁ দিকের স্তনে হাত দিয়ে ফিসফিস করে বলি, এটা তোমার
আমার আঙুল তোমার আঙুল হয়ে যায়
এ সব কথা বোধ হয় লেখা উচিত নয়, তাই না?
আমি কী করব, রাত্তির ঠিক একটা পঁচিশে
একটা সাদা পেঁচা উড়ে যায়
বারান্দার টবে এক থোকা রজনীগন্ধার পাশে দুটো জোনাকি
আমি শুধু পাতলা, সবুজ নাইটি পরা, ব্রা নেই, প্যান্টি নেই
টবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছি, যেন জোনাকি আলো কখনও দেখিনি
জ্বলছে, নিবছে, অদৃশ্য হবার খেলা দেখাচ্ছে
বৃষ্টির ফোঁটার মতন রজনীগন্ধায় আসছে সুগন্ধ

যে সব দেশে তুষারপাত হয় না, সে সব দেশে জ্যোৎস্না অনেক গাঢ়
রাত্তির একটা পঁয়তিরিশে বুক মুচড়ে সব মেয়েরই মনে হয়
কেন হারিয়ে গেল গত জন্মের দুটো ডানা?

সাবধান কলম

যখন মধ্যপ্রাচ্যে একটি নৃশংস, বর্বর যুদ্ধ চলে, তখন কি নেহাত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের অনুভূতি নিয়ে কবিতা লেখা যায়? তখন কি যুদ্ধ নিয়েই তুমি লিখবে কিছু? অবিরাম গোলাবর্ষণ, গুচ্ছ গুচ্ছ বোমা। আকাশ পর্যন্ত পুড়ে যাচ্ছে লেলিহান আগুনে। এদিকে ওদিকে লাশ, মায়ের কোলে রক্তাক্ত শিশু, গাছের ডালে আটকে আছে ছিন্ন ভিন্ন হাত-পা, বাতাস কাঁপছে কত শেষ নিশ্বাসে, এই সব দৃশ্যের কাছে কবিতার সব শব্দই অসহায় মনে হবে না?
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনেরও একটা স্রোত আছে। আজ এখানে সব পেট্রল পাম্প বন্ধ, এক জায়গায় রাস্তা জুড়ে বসে আছে পদাতিকরা, কারা যেন দোকানের কাচ ভাঙছে, দুপুরবেলা কামান গর্জনের মতন বজ্রগর্ভ মেঘের ডাক, ভিখিরিরা ইটের উনুন জ্বালিয়ে ভাত চাপিয়েছে ফ্লাই ওভারের নীচে, কবিতা এই সব জায়গায় উঁকি মেরেই সরে যাচ্ছে দ্রুত, কলম হাতে চুপ করে বসে আছে কবি, তার খিদে পেয়েছে, খালি পেটে সিগারেট টেনে যাচ্ছে অনবরত, বারান্দায় একটা কাক ডেকে চলেছে বিশ্রী ভাবে, হুস হুস করলেও সে যায় না, হঠাৎ বৃষ্টির ঝাপটা এসে তাকে উড়িয়ে দিল!... পৃথিবীর থামবার উপায় নেই, প্রতিটি বিকেল গড়িয়ে যাবেই সন্ধের দিকে, মুছে যাবে আকাশের রং।
রবীন্দ্র জয়ন্তীতে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠাগুলি খালি থাকবে না, তুমি কী লিখবে? বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে যাবে এক ঠিকানাহীন কিশোরী? তার পাশেই এক ভিখারিনি হাত বাড়িয়েছে গাড়ির জানলায়, ওকে তুমি বাদ দেবে? আজকের মতন সব কবিতা নারী বর্জিতও তো হতে পারে। দুনিয়ায় কত দুঃখী মানুষ, তাদের প্রতি সহমর্মিতায়... কিন্তু খুঁজে নিতে হবে সঠিক ভাষা, যেদিন কলম ভাষা-হারা, সেদিনও কি তুমি ক্রোধ বা দুঃখের বশে লিখবে? রেলিং-এর

কাকটা আবার ফিরে এসেছে, সাবধান কলম, যেন এই সব সময় ভাষার বিশুদ্ধতা না হারায়!

অরণ্য গভীরে

সুষুপ্তির মধ্যে একটা দরজা শব্দ করে খুলে যায়
উন্মুক্ত প্রান্তরে এত চোখ ধাঁধানো নীল বর্ণ রোদ
চক্ষু সয়ে আসে, ক্রমে ফিরে আসে অসংশয়ী বোধ
একটি আহত চিতা নিজের রুধির চেটে খায়

পোড়া ঘাসে বীর্যপাত করে গেছে তিতিক্ষু সন্ন্যাসী
কেউ যেন ভাঙা কাচে ফেলে গেছে চোর পুলিশ খেলা
এর নাম মরীচিকা? হলুদ বালিতে স্বর্ণ ঢেলা
নগ্ন ভাঙা পুতুলের চোখে, ঠোঁটে জলজ্যান্ত হাসি!

অর্থ চাও?
এ কবিতা তোমাকে দেখেই শিউরে ওঠে
ছাপার অক্ষর থেকে
দ্রুত
এর পতনই নিয়তি
নির্বাসন থেকে
যারা গান গেয়ে ফিরেছে সম্প্রতি
আবার ফেরার পালা, অরণ্য গভীরে তারা ছোটে!

মৃত্যু নিয়ে

মৃত্যু নিয়ে দার্শনিকতাটা, এঃ নিছকই ছ্যাবলামি

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ক্লান্ত হলে, বসে পড়া ভালো
একটা গাছের ছায়া পেয়ে গেলে অতি চমৎকার
না পেলেও ক্ষতি নেই, কালভার্টে, পশ্চাৎদেশ ঠেকিয়ে দিনে-রাতে
পল অনুপল নিয়ে কিছু লোফালুফি
সব দার্শনিকরাই এরকম শতাব্দীগুলিকে রূপ রস দিয়েছেন
বিছানায় রতি খেলা অকস্মাৎ থেমে গেলে, অসমাপ্তি শেষ কথা নয়
মুখোমুখি নগ্ন শরীরের চেয়ে থাকা
তারও নন্দনতত্ত্ব ছুঁয়ে থাকে শিল্প গরিমায়
অতৃপ্তিই মূল কাব্য, বাকিটুকু পরাবাস্তবতা

মৃত্যুতে আসঙ্গ লিপ্সা মুছে যায়, তাই সেটা সত্যের জারজ!

সমস্ত দেহতত্ত্ব তুচ্ছ করে

আমি যতবার এসেছি তোমার কাছে, তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ
ফেরার রাস্তা খুঁজে পাইনি, হোঁচট খেয়েছি বারবার
আমার অন্ধত্ব মিথ্যে নয়, তার নীচে চাপা পড়েছে সব অহমিকা
এক এক সময় অন্ধ হতে কী যে ভালো লাগে, তখন পোশাক থাকে না
অন্ধ সুড়ঙ্গের মধ্যে শিল্পের কলমে বীর্যে অক্ষরে
কি জন্মায়নি কোনো মহা কবির কবিতা

একটা বাগানের পাশ দিয়ে রাস্তা, আমি বাগান দেখছি না
ছ'টা ছ'রকম পাখি দোল খাচ্ছে কদমের ডালে

যথেষ্ট হয়েছে পাখির উপমা
সমস্ত দেহতত্ত্ব তুচ্ছ করে তুমি বসে আছ নদীর ধারে
জলে পা ডুবিয়ে
এক ঝলক তাকানো মাত্র আমার চোখ ঢেকে গেল কুয়াশায়
এখন নারীর চেয়ে নদী বেশি টানময়ী
ডুব দিয়ে নীল গভীরতায় খুঁজি কবিতার বিদ্যুল্লেখা।

উত্তর নেই

আমি এখন কী করব, বলতে পারেন?
শুনিনি, শুনতে চাই না, তার চেয়ে বরং
শীতকালের বৃষ্টি
আমি এখন কী করব, বলতে পারেন?
না শুনব না, শুনব না বরং একটা গান
কিংবা একলা সঙ্গমের সময় যেমন জোর করে ছবি
ফোটাতে হয় কোনো লাস্যময়ীর
আমি এখন কী করব, বলতে পারেন?
চোখ বন্ধ করা যায়, কিন্তু কান বন্ধ করা যায় না কেন?
প্রত্যেকবারই এই মিনমিনে কাতর প্রশ্নটা স্বরতরঙ্গ বাড়াচ্ছে
এবারে বজ্র গর্জনের মতন, সারা আকাশ জুড়ে
আর তো কোনো উপায় নেই, আমিও তবে গলা
মিলিয়ে দিচ্ছি
আমি এখন কী করব, বলতে পারেন?

বারান্দার নীচে

একজন অসাবধানী নারী হঠাৎ আমার দৃষ্টিকে চোর করে দেয়
সে ঘুরছে আর টুকটাক করে ভাঙছে এক-আধটা নিয়ম
শাড়ির আঁচলে উড়িয়ে দিচ্ছে কত না নিষেধ
হাসি কুলকুচি করছে আর ঝরে পড়ছে শাস্ত্র-টাস্ত্র
বারান্দা থেকে অতখানি মুখ ঝুঁকিয়ে কী দেখছে সে
ওখানে দেখার তো কিছু নেই
তার ঠিক মাথার ওপরে একটা তেল মাখানো চাঁদ
আর মালগাড়ির মতন লম্বা একটা রাত
কখনো সে ভাস্কর্যের নারী, কখনো নদী
আমার চোখের পলক ফেলতে ভয় করে
যদি সে হারিয়ে যায়
হারিয়ে যেও না, ভাঙো ভাঙো, আরও অনেক
ধূসরতা ভেঙে দাও

বারান্দার থেকে অতখানি ঝুঁকে কী দেখছ
ওখানে তো কেউ নেই।
তুমি বুঝি শূন্যতাও দেখতে পাও!

সময় জানে না

পৃথিবী কি জানে তার ডাক নাম পৃথিবী?
সূর্য কি জানে তার আছে কত শতনাম
চাঁদ কি জেনেছে তার নামে কত কাব্য
মহাশূন্যতা নাম পেয়ে গেল নীলাকাশ।

ভ্রমর বেচারি খিদেয় ঘুরছে সারাদিন
সেও হয়ে গেল লোভী প্রেমিকের তুল্য
ফুলগুলো সাজে পোকা মাকড়ের জন্য
রমণীরা এসে ছিঁড়ে গুঁজে দেয় খোঁপায়!

আঁধার রাত্রি কেন রহস্যময়ী?
দিনও জানে না, সে কেন শুধুই নগ্ন
ছ' মাইল গভীর তবু সমুদ্র অতল
নদীরা জানে না, তারাও নারী ও পুরুষ!

জল কণাটির হয়তো সাতটি রং
চোখ নেই, তার, নিজে সে বর্ণ অন্ধ
গাছের শিকড়ে শোনা যায় ফিসফিসানি
যার নাম মেঘ, সেই কেন হয় বৃষ্টি?

সময় জানে না সময়ের ইতিহাস
কার নাম দিন, ঘণ্টা ও পল, অনুপল
মাস ও বছর, শতক, সহস্রাব্দ
যারা ভাগ করে তারাও হারিয়ে যায়।

বিন্দু বিন্দু

উল্টোপাল্টা

এমন বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি ভাল্লাগে না
পরের বছর খরায় দেশের বাড়ল দেনা।
তেমন একটা ভূমিকম্প কতদিন যে হয় না
কালো টাকায় গিন্নিরা সব গড়িয়ে যাচ্ছে গয়না।

তাড়াহুড়ো

একটা জানলা বন্ধ ছিল, একটা জানলা খোলা
এদিকে কেউ মাথা ঠুকছে, ওদিকে পথ ভোলা
আলোর নীচে কালো ছুটছে, সবুজ মৃত্যুবাণ
ওরা শুধুই মরতে জানে, মৃত্যুতে খান খান।
মরার আগে কেউ কি বলল, দেখা হবেই আবার
এমন তাড়াহুড়োর মধ্যে প্রয়োজন কি যাবার?

কেউ জানে না

দেশ হয়েছে স্বাধীন
এবার সবাই মনের সুখে লম্বা গোঁফে তা দিন!
বোমা ফাটল দুম ফটাস গোনাগুনতি পাঁচটা
ফিকফিকিয়ে হাসে অশোক গাছটা।
দেশ বিদেশে কত কী লোকে ভাববে
কেউ জানে না কী লেখা হল উপন্যাসে, কাব্যে!

বারবার প্রথম দেখা

নীরার হাত-চিঠি এল পড়ন্ত বিকেল বেলায়
আমি তখন হিজিবিজি জট-পাকানো সুতোর গিঁট খুলছি
তার মধ্যে একটি সদ্যস্নাত যুঁইফুল
ডুবন্ত মানুষ যেমন নিশ্বাসের জন্য আঁকুপাঁকু করে ওঠে।
আমিও সূর্যকে বললুম, আজ একটু দেরি করো
নীরা আমায় ডেকেছে, দিগন্তরেখা, আবছা হয়ে যেও না
জানলায় এত ঝনঝন শব্দ কীসের, ছিটকিনি, শান্ত হও

বইয়ের খোলা পৃষ্ঠা, প্রতীক্ষায় থাকো
আঙুলে কালির দাগ, লক্ষ্মীটি, অদৃশ্য হও
যুঁইফুলটি চেয়ে আছে, সদ্য-জন্মানো ঝর্নার মতো হাসছে
একটি ঝর্নার পাশেই বারবার নীরাকে আমার প্রথম দেখা
মেঘভাঙা দ্যুতি এসে পড়েছে তার চিবুকের রেখায়
নতুন বসন্ত-বৃক্ষের পাতার মতন তার চোখের আলো
তার বুকে দুলে দুলে উঠছে কৈশোরের সমুদ্র-স্নান
নীরার ডাক এসেছে, মেঘ, নিরুদ্দেশ যাও
দরজায় আর কে এসে দাঁড়াল, আমি কোথাও নেই
শব্দ তুমি থামো, বাক্ তুমি নিশ্চুপ হও
সমস্ত সুতোর পাক লণ্ডভণ্ড করে আমায় উঠে দাঁড়াতে হবে
আমাকে যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে......।

সেই একদিন

একদিন গাছেরা মানুষের সঙ্গে কথা বলবে
লতা গুল্মে শোনা যাবে ফিসফিস ধ্বনি
দোপাটি ঝাড়ের কাছে থেমে যাবে কিশোরীর হাত
ফুলগুলি খিলখিল করে হেসে উঠবে
একদিন সবাই জেনে যাবে মনে মনে
যার কাছ থেকে তুমি কিছু নাও, তাকেও কিছু দিতে হবে
একটা দোয়েল পাখি শিস শোনালে তাকে কিছু দেবে না?
নদীকে একটি গান, মাটিকে দু' ফোঁটা চোখের জল
ভোরের সোনালি আলো-কে আর কিছু না হোক
অন্তত একটি প্রণাম!

ঘণ্টায় ঘণ্টায়

মহাশয়, ঘণ্টিকীর
প্রথম সংখ্যাটি
দেখলুম। অবশ্যই
অতি পরিপাটি
এবং নিখুঁত প্রায়;
তবে ভয়ে ভয়ে
একটি ছোট প্রশ্ন করি,
অচিরে প্রলয়ে
পৃথিবী কি ধ্বংস হবে?
নচেৎ এমন
কবিতার ঘনঘটা
শব্দ উপমার ছটা?
যেন প্রাণপণ
এখুনি যা কিছু লিখে
এবং ছাপিয়ে—
দুনিয়া কাঁপিয়ে
দিয়ে চলে যেতে হবে!
এই নব্য রীতি
দেখে বড় ধাঁধা লাগে!
নিবেদনমিতি।

বৈজ্ঞানিকের বাজি

টাইটান উপগ্রহে কি প্রাণের সন্ধান পাওয়া যাবে?
এক সরাইখানায় বসে বাজি ধরেছে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক
কত দিন, কত দিন, ততদিনে কি পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে সব প্রাণ?
একে একে পৃথিবী থেকে অনেক প্রাণী অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে
অরণ্যগুলি কৃশ হতে হতে অদৃশ্য
মানুষের সংখ্যা অবশ্য বাড়ছে, উল্কার মতন ছুটে এসে সেই
সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে শূন্যের পর শূন্য
মহাশূন্যে এখনও পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ
যদিও সে জানে, তার নিজেরই মধ্যে রয়েছে ধ্বংসের বীজ
খাঁচায় সাদা ইঁদুরের সংখ্যা বেড়ে গেলে তারা যেমন আত্মধ্বংসে মাতে
যদুবংশ যেমনভাবে ধ্বংস হয়েছিল
সমগ্র মানববংশ থেকে মুছে যাচ্ছে বাৎসল্য
শিশুদের খুন করতেও আজ তাদের হাত কাঁপে না
এই তো চিহ্ন, এই তো সেই শেষ মারণযজ্ঞের শুরু
জনসংখ্যার শূন্যগুলো মুছে গিয়ে পড়ে থাকবে শুধু শূন্যতা
তারপর টাইটান উপগ্রহ থেকে নেমে আসবে অন্য প্রাণ?
কিন্তু তখন কোথায় সেই সরাইখানা, বাজি জেতার জন্য
কে বসে থাকবে?

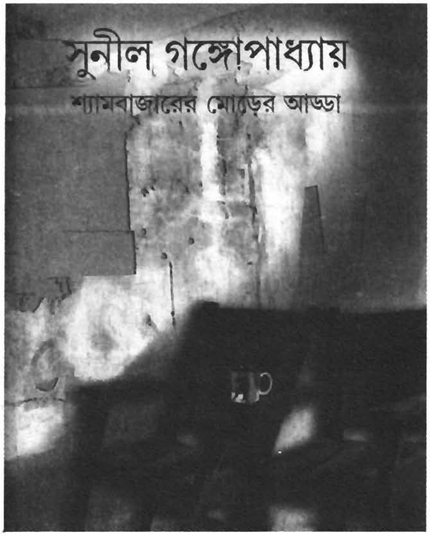

শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডা

সূচি

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে স্বীকারোক্তি ১৯৫, চতুর্থ বাঁকের পর ১৯৯, পাহাড়ের রেলগাড়ি ২০১, ছন্দ-মিলের বন্দনা ২০২, এক সন্ধে থেকে মধ্যরাত্রি ২০৩, থমকে দাঁড়াবার অধিকার ২০৭, মনে পড়ে প্রতিশ্রুতি, মনে পড়ে ২০৮, এক একদিন ২০৯, নদীর ধারে নির্জন গাছতলায় ২১০, চোখ ঢেকে ২১১, সার সত্য ২১২, রাত্রির কবিতা ২১২, সুড়ঙ্গের ওপাশে ২১৩, সবই অসমাপ্ত ২১৪, নতুন মানুষদের গল্প ২১৫, পায়রাদের ওড়াউড়ি ২১৬, দুপুরের বর্ণ ২১৭, এই তো সময় ২১৮, সিঁড়িতে বসে আছে নীরা ২১৯, শিল্পের বন্দিনী ২২০, উনিশ বড় সাংঘাতিক উনিশ ২২১, আয়ু ২২২, শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডা ২২৩, টান মারে দোলাচল ২২৪, এক জন্মের সমস্ত চলে যাওয়ার মধ্যে ২২৫, মেঘলা দিন, মিহিন বাতাসে ২২৬, একশো হাজার ঢেউ ২২৮, পাখির চোখে দেখা ১ ২২৯, আমার প্রিয় জামা ২৩১, অলীক জন্মকাহিনী ২৩২, সর্বহারা অবিশ্বাসী ২৩৩, পাখির চোখে দেখা ২ ২৩৫, এই স্বপ্নের ঘোর ২৩৭, এই রাত শেষ হতে ২৩৮, অধৈর্য ২৩৯, অগ্নিকাণ্ড ২৩৯, চক্ষে গোলকধাঁধা ২৪০, ধাঁধা ২৪১, সবচেয়ে হালকা অস্ত্র ২৪১, পাখির চোখে দেখা ৩ ২৪২, রেলস্টেশনে নীরা ২৪৩,আলাদা আয়না ২৪৪,

এ কোন ঘাটে ২৪৫, উপমা ২৪৫, তিরতিরে স্রোত ২৪৬, জানতে ইচ্ছে করে ২৪৬, পর্তুগিজ ভূত ২৪৮, মফস্‌সলের মেয়ে ২৪৮, আগুন দেখেছি শুধু ২৪৯, জন্মদিনের ভাবনা ২৫০, সে তো শুধু রূপকথা ২৫০

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে স্বীকারোক্তি

এখন অনেকের সঙ্গে দেখা হলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে,
কী, শরীর ভালো আছে তো?
কেন এত শরীরের কথা?
যতই শুভার্থী হোক তবু তাদের ব্যগ্রতায় ফুটে ওঠে
একটি সরল সত্যের আভাস
আমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, এবার কবে কখন
টুক করে কেটে পড়তে হবে ঠিক নেই!
প্রকাশ্যে নানা রকম পোশাকেই তো ঢাকা থাকে শরীর
তবু তার সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কারণে
মানুষের কত কৌতূহল
কিন্তু শরীরের কথা তো অন্যদের বলতে নেই
সেটা ঠিক রুচিকর নয়
কেমন আছো? এর উত্তর শুধু, ভালো
সেটা কি শরীরের না অস্তিত্বের সংবাদ, বলা শক্ত?

যতই আয়ু বাড়ে, ততই মানুষ অনেক কিছু হারায়
মাঝে মাঝে একলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ভাবি সেই কথা
জীবনের যাত্রা শুরু যাদের সঙ্গে, তাদের অনেকেই আজ কোথায়?
বাবা, মা, ছোট মাসি, কৈশোরের নর্মসঙ্গিনীরা
উত্তর জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব, যাদের সঙ্গে দেখা না হলে
দিনটাই মনে হত ব্যর্থ
তারা দূরে সরে যেতে যেতে মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তের ওপারে
কেউ ফেলে গেছে এক জোড়া চটি, মানুষটি অদৃশ্য
গৌহাটি থেকে যার চিঠি এসে পৌঁছোল সোমবার
সে আগের শুক্কুরবারেই নিশ্বাস সব খরচ করে ফেলেছে
অথচ চিঠিতে আগামী দিনকালের কত স্বপ্ন ছিল!

শুধু বান্ধবকুল নয়, একদিন এই দেশটাও তো ছেড়ে যেতে হবে
দেশ? দেশ বলে কি সত্যিই কিছু আছে?

সবটাই তো অলীক
কাঁটাতারের বেড়া আর বন্দুক ওঁচানো পাহারা দেওয়া
ভূমির নাম দেশ!
আমি যদি দৈবাৎ জন্ম নিতাম বেলুচিস্তানে
তবে আমি খেলা করতাম পাহাড়ের গুহায়?
তা হলে জন্মটাই কি আসল
মানুষের জন্মও তো ক্রোমোজোমের খামখেয়াল
মাতৃগর্ভে আমার কোনও দেশ ছিল না
আমার জনক-জননীও দেশের কথা চিন্তা করেননি
শিশুরা নাকি সব স্বর্গ থেকে আসে
কিন্তু স্বর্গ কারুর স্বদেশ হয় না
কৈশোর পেরুতে না পেরুতেই স্বর্গ টর্গ মুছে যায়
ঝলসায় বড় বেশি রোদ, চচ্চড় করে পুড়তে থাকে চামড়া
সহজ পথগুলো জটিল হয় ক্রমশ
ঈশ্বরও টালমাটাল হয়ে পড়ে চার্বাক দর্শনে
অথবা মার্কসবাদে
নারীরা টান মারে, যখন তখন বুকে বেঁধে তির
এর মধ্যে দেশ কোথায়?
জন্তু-জানোয়ারেরা অনুভূতি দিয়ে যেমন বোঝে টেরিটরি
তারই নাম কি মানুষের দেশ?

ইহজীবনে চোখ দুটো থাকে সদাব্যস্ত
আঁচলের বাতাস ও অন্যান্য খেলাধুলো ছাড়িয়ে
দৃষ্টি চলে যায় ক্ষণে ক্ষণে অনেক দূরে
গোঁফ দাড়ি না গজালে নিসর্গকে ঠিক ঠিক চেনা যায় না
স্বর্ণাভ গোধূলি ও নীল রঙের ভোর, গাছপালার
রহস্যময় নীরবতা
ভোমরা আর মৌমাছির মতন কালচে রঙের কুরূপ পতঙ্গেরা
অপরূপ সব বিউটি কনটেস্টের ফুলগুলিতে ছড়িয়ে যায় প্রেম
আর মাছরাঙার ডানায় কেন এত অপ্রয়োজনীয় রং
এই সব দেখি, আরও দেখি প্রকৃতির অন্য সন্তানদের
ফসল কাটা হয়ে গেছে, এখন খাঁ খাঁ করছে মাঠ

শীতকালে বাঁধের ওপর উবু হয়ে বসে থাকা সারি সারি মানুষ
দীর্ঘশ্বাস নয়, তারা মাঝে মাঝেই থুতু ফেলে
হৃদয় ট্রিদয় নয়, চোখই চিনতে পারে ওদের পরিচয়
সকালে আমি যখন বেগুন ভাজা দিয়ে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাই
চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাঁধের সেই মানুষদের মুখগুলি
ওদের রুটি নেই, বেগুন ভাজাও নেই
এতদিনে তো জেনে গেছি, যারা খিদে চেপে রাখে তারাই
বেশি থুতু ফেলে
যেমন রমজানের মাসে রোজার উপবাসীরা
কিন্তু তাতে আমার কী দায়িত্ব, আমার কী আসে যায়
মানুষ তো স্বার্থপর প্রাণী, সারাজীবন ধরেই চলে আত্মরক্ষা
তবু এই যে উতলা হওয়া, এরই নাম কি দেশের টান?
ঠিক বিশ্বাস হয় না, এ তো ক্ষণকালের ঝলকানি
একটুখানি অন্যমনস্কতা, তাও চোখেরই কারসাজি
কোনওদিন তো নিজের ভাগের রুটি বাঁধের মানুষদের
দিতে যাইনি
তত্ত্ব তৈরি করেছি, চ্যারিটিতে সমস্যার সমাধান হয় না
বরং বেড়ে যায়
তার চেয়ে মাঝে মাঝে মিছিলে পা-মেলানো অনেক সহজ
তাতে একই সঙ্গে দেশপ্রেমিক আর বিশ্বপ্রেমিক হওয়া যায়
আমি সব মিছিলেরই মাঝপথের পলাতক
তবু অন্যান্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞদের দেখে কিছুটা কৌতূহলী আর
অনেকটাই মুগ্ধ হয়েছি
কোনও মিছিল এক সময় ঢুকে পড়েছে জঙ্গলে, কোনও মিছিল
সংসদের শীত-তাপ নিয়ন্ত্রণে
ওরা দেশকে চিনতে পেরেছে, আমি পারিনি।

হ্যাঁ, যেতে তো হবেই, বেশ কাটল এতগুলো বছর
পরলোককে চুরমার করেছি অনেক আগেই
আত্মার অবিনশ্বরতা এক ছেলেভুলোনো রূপকথা
আত্মা ফাত্মা কিচ্ছু নেই, যেমন মানুষের বুকে থাকে না হৃদয়

একটা টুলু পাম্পকে হৃদয় বলে কত না আদিখ্যেতাই করা হয়েছে
বহুকাল ধরে
মাথা সর্বস্ব এই প্রাণী
সেই মাথার একদিকে কঠোর যুক্তিবোধ
অন্যদিকে কী চমৎকার উপভোগ্য অন্ধ বিশ্বাস
একদিকে মহাবিশ্ব, অন্য দিকে মন্দির-মসজিদ-গির্জা
আমি বেদ-উপনিষদের বদলে মেনেছি জৈমিনির মীমাংসা
এপিকিউরিয়ান দর্শনের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছি জীবনযাত্রার
দৃশ্যমান জগৎকে দেখেছি স্পিনোৎজার চোখ দিয়ে
ভালোবাসাকে বসিয়েছি সবচেয়ে উঁচু, অদৃশ্য সিংহাসনে
সেই ভালোবাসা শরীর সর্বস্ব আবার শরীর বিরহিত
তবে, ভালোবাসার মধ্যেও কি ছোটখাটো মিথ্যে থাকেনি
সেই সব মিথ্যে বাদ দিলে সব কাব্য সাহিত্যও তো তুচ্ছ
মিথ্যে আর সত্য কতবার জায়গা বদলা বদলি করেছে
যেমন অনেক উপভোগের মধ্যে থাকে দুঃখ, কত কান্নার মধ্যে আনন্দ

কোনও পরিতাপ নেই
ভুল তো করেছি অনেক, সেসব মানুষেরই ভুল
একটু আধটু অহংকার, আবার উপলব্ধির থাপ্পড়
সিঁড়িতে ওঠার একাগ্রতায় ভুলে গেছি পাশ ফিরে তাকাতে
রূপ দেখেছি, বুঝিনি রূপের আড়াল
তবে একটা পাশবিক অন্যায় করিনি কখনও, নিজে ক্ষতবিক্ষত
হয়েছি অনেকবার
কিন্তু অন্যের রক্তদর্শন করার ইচ্ছে হয়নি...
পাশবিক? ছিঃ, এটা বলা ঠিক হল না।

কেউ যখন জিজ্ঞেস করে, শরীর কেমন আছে?
তক্ষুনি উত্তর না দিয়ে মনে মনে বলি:
যাচ্ছি, যাচ্ছি, এত ব্যস্ততার কী আছে?
পৃথিবীতে মানুষের পা ফেলার জায়গা কমে যাচ্ছে
জায়গা তো ছেড়ে দিতেই হবে

যাচ্ছি, যাচ্ছি, তবে ফুরফুরে মেজাজে, প্রিয় মানুষদের
কিছু না জানিয়েই যেতে চেয়েছিলাম
তবে বুকের ওপর কেন চেপে আছে একটা বিষণ্ণ পাথর
মায়া? পিছুটান?
জানলার কাছে দাঁড়ালেই চোখের সামনে ঝলসে ওঠে
একটা ছবি, আমি কেঁপে উঠি
দেশ টেশ মানিনি, পৃথিবীকে নিয়েও নিছক ভাবালুতা ছাড়া
আর বেশি সময় ব্যয় করিনি
তবু এতকাল পরে কী করে ফিরে এল দেশ-দেশান্তর
চতুর্দিকে এত রক্ত, পশুরা হাসছে মানুষের হিংস্রতা দেখে
আকাশ থেকে, সমুদ্র থেকে, জঙ্গল থেকে চলেছে মানুষেরই হাতে
মানুষের হত্যালীলা
বলতে তো পারতাম, তাতে আমার কী আসে যায়, আমি তো চলেই যাব
কেন মন তা মানছে না
রক্তের ফোয়ারা, রক্তের নদী, তাতে ডুবে যাচ্ছে মানুষের সভ্যতার ইতিহাস
এই দৃশ্য চোখে নিয়ে চলে যেতে হবে
এত কষ্ট, আঃ, এত কষ্ট, সত্যিই বুকে কষ্ট হচ্ছে খুব!

চতুর্থ বাঁকের পর

প্রথম বাঁকে একটা পাথরের সিংহাসন
তার ওপরে একটা পল্লবিত দেবদারু
এখানে কেউ যোগ চিহ্ন দিয়ে লিখে গিয়েছে দুটি নাম
অস্পষ্ট হয়ে আসছে সেই নাম, চিহ্নও বদলায়নি তো?

তারপর অনেকটা খাড়া চড়াই
নিশ্বাস যখন বেশ দ্রুত, তখনই দ্বিতীয় বাঁক
এখান থেকে দেখা যায় উপত্যকা, তার সর্বাঙ্গে
ছোট ছোট ক্ষত

এ জায়গাতেও বিশ্রামের জন্য থামবার দরকার নেই
তুমি আমার হাত ধরতে চাও, এই নির্জনতায় কাঁধে হাত রাখো
জুতোর স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে, সেফটিপিনে আর কতক্ষণ আটকাবে
ওপর থেকে যারা নামছে, তারা চোখে চোখ ফেলছে না
অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে খুব দ্রুত

তৃতীয় বাঁকে বসে আছে পিঠ ফেরানো তিন ছায়ামূর্তি
এক রাশ ঝরা পাতা, কয়েকটা ন্যাড়া গাছ
কেউ ফেলে গেছে একটা হাত-ভাঙা পুতুল
তোমার চোখে কেন জল? আর কেউ সঙ্গে আসবে না
আর সবাই ছড়িয়ে গেছে দিগন্তের নানা প্রান্তে
শোনা যাচ্ছে অনেক কণ্ঠস্বর, দেখা যাচ্ছে না কারুকে।

চতুর্থ বাঁকের কাছটা খুব সরু
খাদের দিকে তাকিয়ো না, কে যেন বলেছিল
ঠিক এইখানেই রিপুভয়, তবু এখানেই একবার বসতে হয়
তুমি আঁচলের বাতাস খাচ্ছ, আমার চোখে ঢুকেছে ধুলো
দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে পথ, তুমি কেন দূরে সরে যাচ্ছ
ডাক শুনতে পাচ্ছ না আমার? আমিও তোমার ডাক
এখানেও রয়েছে মরীচিকা, তার গোপন হাতছানি
তুমি ভুল করে অন্য পথটায়, কিংবা আমিই পথ ভুলেছি
কার কতটা ভুল, কে কার থেকে দূরে
এখানে উপত্যকার সব ক্ষত ঢেকে গেছে, ওড়নার মতন
ছড়িয়ে আছে মাধুরী।
বড় ভয়ংকর মোহময়, ইচ্ছে করে ঝাঁপ দিতে
দৌড়ে এসে কে কার হাত ধরল?
আরও অনেকগুলো বাঁক, কমে যাচ্ছে আয়ু
তবু ওপরে যেতে হবে, আরও অনেক ওপরে
জয় করতে হবে শিখর, সে শপথ মনে নেই?

পাহাড়ের রেলগাড়ি

এ যেন পাহাড়ের ওপরে ওঠা রেলগাড়ি
খানিকটা এগোয়, আবার কিছুটা পিছিয়ে আসে
উপমা: মানব সভ্যতা।

কখনও তরতর করে বেশি ওপরের দিকে উঠতে গেলে
ভেঙে পড়ে যায় নীচে
উপমা: মিশর, ব্যাবিলন।

কখনও এক একটা ধ্বনি ওঠে, মানুষ হাতে হাত মেলায়
এ ওকে আলিঙ্গনে টানে বুকের কাছে
আধখানা শতাব্দী যেতে না যেতেই
সেই সব হাতে ঝলসে ওঠে ছুরি।

কখনও জমাট পাথরের বুক থেকে বেরিয়ে আসে শিল্প
অরণ্যে ধ্বনিত শব্দব্রহ্ম
আবার পাহাড় উড়ে যায় বিস্ফোরণে, বিকট দামামায়
কানে তালা লাগে

কখনও সব কামরায় হুড়মুড় করে উঠে পড়ে
টিকিট না কাটা যাত্রী
রাজতন্ত্রকে চিবিয়ে, চুষে খায় গণতন্ত্র
আবার এক একটা যুগে গণতন্ত্রের পিঠে চাবুক কষায়
দু’-একখানা নেপোলিয়ান আর হিটলার

কখনও সমস্ত মানুষের সুখ-শান্তির প্রতিশ্রুতি
স্বপ্নের একখানা ছবি হয়ে দোলে
আবার স্বপ্নের মতনই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় সেই ছবি।

কখনও মানুষ হয়ে ওঠে নরদানব, তারা মানুষেরই রক্ত চাটে

কানাকড়িতে বিকোয় মনুষ্যত্ব
উপমা: ইরাক, পালেস্তাইন

তবু কি শোনা যায় কু ঝিক ঝিক শব্দ
রেলগাড়িটা আবার ওপরে উঠবে
নাকি এখন মহাশূন্যযান, মহাশূন্যেই পরমাগতি!

এই সব লিখে চলেছি, আমি একজন দুঃখী মানুষ
সভ্যতার জারজ সন্তান
আজ আমার মন খারাপ পাতালমুখী...

ছন্দ-মিলের বন্দনা

ছন্দে লিখতে চাইনি, তবুও শব্দ প্রণয়াবদ্ধ,
এ ওকে দোলায়! আঙুলের দোষ? লেখনী স্বাধীন? শ্রীমতী
তুমি কি চাইলে ঝর্না কলমে ঝর্না জাগুক সদ্য?
যদি তাই হয় তার পরে আর মিল দিলেই বা কী ক্ষতি!

ভয় হয় কেউ বলবে এমন পুরনো রীতির স্তোত্র
পাথরের গায়ে মানায় হয়তো, কিন্তু রক্তমাংস?
এসব কবিরা দাড়িওয়ালা সব প্রাচীন কবির গোত্র
রূপের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় শরীরের অর্ধাংশ!

ছিল একদিন, হাটে বাজারের মানুষের মণিমুক্তো
কুড়িয়ে গেঁথেছি কবিতায়, যত কর্কশ তত স্বস্তি
তুই-তুকারিতে শ্রীমতী সেদিন অরুণ বর্ণ মুখ তোর
রাজপ্রাসাদকে বানিয়ে তুলেছি সব-হারাদের বস্তি।

ছন্দ মিশেছে জুতোর ধুলোয়, মিলকে দিয়েছি ফুৎকার

বেশি উপমার বাড়াবাড়ি হলে, গিয়েছি সটান গদ্যে
চাঁদ বিলুপ্ত, যে-কোনও সময় বর্ষণ হত উল্কার
গুরু ও চাঁড়াল, চোর-সন্ন্যাসী, মিশেছে বিষ ও মদ্যে!

আজ কি শ্রীমতী উদাস লাস্যে সব কিছুকেই না-মানা
সমুদ্রতীরে আমাকেও ভুলে আরও দূরে চলে যেতে চাও?
শিল্প বিভায় ক'টি মুহূর্ত ছোঁবে অনন্ত সীমানা
ছন্দ-মিলের এই বন্দনা, সখী, করতল পেতে নাও!

এক সন্ধে থেকে মধ্যরাত্রি

১

আয় মন বেড়াতে যাবি
কল্পতরু গাছের অভাব নেই, চতুর্দিকেই চারি ফল ছড়ানো
কুড়িয়ে খেলেই তো হয়
কিন্তু মুশকিল হয়েছে দুটি নারীকে নিয়ে
বেড়াতে বেরুলে কক্ষনও দুই রমণীকে সঙ্গে নিতে নেই
রামপ্রসাদ কী ভুলটাই না করেছিলেন
এক নারী একটু গায়ে গা ঠেকিয়েছে না ঠেকায়নি
অমনি অন্যটির মুখ ভার, সরে যাবে দূরে
আবার তাকে কাছে টানতে গেলে সে সজোরে ঠেলে দেয়
নিছক অভিমানে নয়, তার নামই যে নিবৃত্তি
ধর্ম আর অর্থ চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়া যায়
কিন্তু কাম তো তা নয়, তার লাগে প্রেম নামে এক ঝাল-মিষ্টি আচার
তখন যে তরুণীটি শরীরিণী হয়, তার নাম প্রবৃত্তি
তার লাস্যে এত মোহ
আমার এই এক জীবনে সেই মোহ থেকেই অতৃপ্তির শোধ হল না
তাই চতুর্থ ফল মোক্ষটোক্ষ নিয়ে মাথাই ঘামানো
হল না কখনও

বিশ্বাস করুন রামপ্রসাদ সেন মশাই
আমার এই লেখাটি এক পলকে পড়ে নিয়ে
হাততালি দিয়েছেন সবুজ রঙের প্রকৃতিদেবী
আপনার মতন সাধকরা তো তাঁকে চিনলেনই না!

২

আসলে নেই তেমন কোনও গর্জমান নদী
যদির সঙ্গে মিল দেব না মরে গেলেও, নিরবধি তো নয়ই
ছেলেবেলার ছোট্ট চোখে সবই তো ছিল বৃহৎ
সৃষ্টিরও তো বাল্যকাল, আকাশে পক্ষিরাজ।

৩

আয় রে আয়, ছেলের পাল, খিচুড়ি খেতে যাই
যে-যার চাটাই বগলে নিয়ে পাত পাতব ভাই
আয়রে আয়, ঘণ্টা বাজে, পেটে আগুন খিদে
আমিনা দিদি, লেবু চাই না, একটুখানি ঘি দে!
পোড়া কপাল, ঘি খেয়েছেন, বাপ-দাদারা কবে
তেমন ভাগ্য তোদের ভাগ্যে আর কোনও দিন হবে?
গরম গরম খেয়ে দেখ না, একটু একটু করে
বাঁধাকপির তরকারিটা আসছে একটু পরে।
ছি ছি ছি ছি দিদি রাঁধতে শেখেনি
খিচুড়িতে তেল দেয়নি, তরকারিতে চিনি!
রাঁধতে শিখিনি যে তবু খেলি অনেক হাতা?
আমিনা দিদি, তোমার জন্য স্বর্গে আসন পাতা!

৪

খুল যা সিমসিম, অ্যাবরা ক্যাডাবরা, ছু মন্তর
এই যে দেখে নাও, দরজা খুলে গেছে, গোপন নেই
না দেখা ছিল ভালো, চক্ষে ধাঁধা লাগে অসম্ভব
রক্ত মাংসের বাইরে আরও কিছু এত গভীর!

সিঁড়ির পর সিঁড়ি, বাঁকের পর বাঁক, গহন পথ
আলো ও আঁধারির এমন অপরূপ শব্দময়
শব্দ ঢেউ তোলে, শব্দ ছবি আঁকে নিরন্তর
এ কার মহাকাশ, সীমানাহীন সীমা, অলীক নয়!

না দেখা ছিল ভালো, চক্ষে ধাঁধা লাগে, অসম্ভব!

৫

আমাদের গেস্ট হাউজের চাতালে উথালপাথাল করছে
একটা আলকেউটে
মাটি ছেড়ে সিমেন্টে এসে সাপটাই পড়েছে মহা আথান্তরে
আমরা ভয়ে এগুতে পারছি না, সে বেচারিও পালাবার পথ
ভুলে গেছে
কে যেন চেঁচিয়ে বলল, ক্যামেরা, ক্যামেরা।

নিরাপদর ছেলে কালাচাঁদ ফিরে আসছে হাতে দুধের
ঘটি ঝুলিয়ে
ও খোকা, এখন আসিস না, দাঁড়া, দাঁড়া উঠোনে সাপ
দশ বছরের ছেলেটি যে আসলে বদ্ধ কালা তা আমরা
ভুলে গেছি
কিংবা যার মনে আছে, সেও ইচ্ছে করে চ্যাঁচাচ্ছে?
আমার মনে পড়েছিল, কিন্তু আমার হাতে ক্যামেরা, আমার তো

অন্য দায়িত্ব নেবার কথা নয়
নিরাপদ কেন সিগারেট আনতে গিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেও
ফিরছে না
সব দোষ তার!

৬

শুধু মাঠ, সবুজের ঢেউ, তবু কেন বুক কাঁপে?
জন্মের পর কান্না, তা কি মনে পড়ে যায় অন্য মনস্তাপে
উদ্ভিদের মতো আমি মাথা তুলে উঠেছি এ ভূমি, জলকাদায়
এই বাংলায়
ঝিনুক তোলার জন্য ডুবে গেছি অনেক গভীরে
বুলবুলি পাখির ডিম চুরি করে, ফের রেখে এসেছি সে নীড়ে
পুকুরের জলে চাঁদ ডুবে যায়, আবার চকিতে ঠিক ভাসে
ঝড়ের সুগন্ধ আমি পেয়েছি যে কতবার পশ্চিমের উড়ন্ত বাতাসে।

সবুজের বুক চেরা হাইওয়ে, গাড়ি থেকে নেমে আমি দাঁড়িয়েছি
একা
কেন চোখে জল আসে, কেন মনে হয়
আমি এই পৃথিবীর কেউ নয়।

৭

শেষ কয়েকটি নিশ্বাস ফেলার আগে
বাবা বললেন, আমি এবার বাড়ি ফিরে যাব
বাড়ি? কোথায় বাড়ি? আমরা থাকি কলকাতায় পাখির বাসায়
ভাড়াটে, লঝঝরে একতলায়
বাড়ি যাকে বলে, সে তো লুপ্ত হয়ে গেছে বহুকাল আগে
সে এখন অন্য দেশ
বাবা কি তবে রূপক অর্থে বলছেন, কিংবা স্বপ্ন দেখছেন স্বর্গের?

এ সময় খুব মেপে মেপে নিশ্বাস খরচ করতে হয়
বাবা অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন, বড় অশ্বত্থগাছটার
পাশ দিয়ে রাস্তা
সিধু ধোপার টিনের ঘর, পাটখেত
বারোয়ারি পুকুরের ঘাটে দাঁতন করছেন
চৌধুরীমশাই
গন্ধ লেবুর বাগানের পাশে একটা জম্বুরা গাছ
রান্নাঘরের দাওয়ায় উনুনে পায়েস চাপিয়েছেন মা, মা ঠিক জেনে গেছেন
আমি আজ আসব
এই তো এসে গেছি, মা

এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ স্মৃতি নিয়ে চলে যাওয়াও তো কম সৌভাগ্যের কথা নয়!

থমকে দাঁড়াবার অধিকার

হাওয়ায় কীসের যেন সুর
বাদল দিনের বাতাসও বোধহয় শিখে নিয়েছে
গোটা কতক রবীন্দ্রসংগীত
এমন দিনে জানলার দিকে চেয়ে যে বসে থাকব
তার কি উপায় আছে
দু' কান ধরে টান মারছে বস্তু বিশ্ব
খবরের কাগজে চটচট করছে রক্ত
আমায় নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবার জন্য
ধেয়ে আসছে মধ্যসত্ত্বভোগীরা

তুমি কবিতা লিখছ
তুমি কি পরিব্যাপ্ত সময় সম্পর্কে অন্ধ থাকতে চাও?
'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?'
পথে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াবার অধিকারও হারানো যায়?

ফসলের খেতে রাহাজানি হলেও কি ঘাসের ডগায়
শিশিরবিন্দু জমে থাকবে না?
শরীরলোভী, তোমার নিজেরও তো শরীর খারাপ হয় কখনও

একটা না একটা সীমানা, তুমি এক একবার এপারে
এক একবার ওপারে
কবিতা থেকে যখন তখন থেমে যায় কলম
যেন একটা মুক্তোর মালা হঠাৎ ছিঁড়ে সবগুলো গড়িয়ে গেল...
ধুলোর মধ্যে আঙুলের দাগ
ওদিকে কোথাও জলের ছলোছল শব্দ
কান্না?
নাকি কারুর আলতাপরা পায়ের ঘুঙুর
অসমাপ্ত কবিতা তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

মনে পড়ে প্রতিশ্রুতি, মনে পড়ে

কবিতা লেখার আগে চুপ করে বসে থাকি
মনে পড়ে প্রতিশ্রুতি, মনে পড়ে
কার প্রতিশোধ এই চুপ করে বসে থাকা।
সকালে পায়ের পাতা শিরশির করে উঠে
বুকের ভিতরে কাশ, অসরল প্রতিটি নিশ্বাস
কিছু নিরুত্তাপ আজ বিদেশের চিঠি, মনে পড়ে
প্রতিশ্রুতি, মনে পড়ে কার প্রতিশোধ
এই চুপ করে বসে থাকা।

বরুণার বিয়ে কাল, অথচ ২৪ ঘণ্টা হরতাল
ছ'রকম ভয়ে কাঁপে সাতজন, সেনবাবুদের মেজো ছেলে
পরশু বিকেল থেকে ফেরেনি বাড়িতে, না ফিরুক, আমি তার

জন্য দায়ী নই, আমি গুলি চালাবার জন্য দায়ী নই, আমি
দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী নই, বিনয় কোথায় থাকবে আজ রাত্রে
আমি দায়ী নই, যে যেখানে মরুক বাঁচুক—
পৃথিবী উচ্ছন্নে যাক, দেবালয় থেকে স্বর্ণ চুরি হোক
স্পেনের মৃত্তিকা যাক নেভাডায়, তাসখণ্ড খণ্ড খণ্ড হোক
আমি কেন দায়ী হব? আমি শুধু বেঁচে থাকব, আমি
মহা স্বার্থপর হয়ে বেঁচে থাকব, যতদিন পারি।
শান্তিনিকেতনে যদি পুরোপুরি দোল খেলা হয়
তা হলে আমার লেখা কেন থামবে? আমি টেবিলের
কাছে বসে থাকি।

কিন্তু বড় চুপ করে বসে থাকা; মনে পড়ে
প্রতিশ্রুতি, মনে পড়ে কার প্রতিশোধ
এই তিক্ত, অপমানে অতি রুক্ষ ব্যর্থ বসে থাকা।

এক একদিন

এক একদিন ঘুম ভাঙলে আচমকা মনে হয়,
এখন সন্ধে না সকাল?
এটা কোন দেশ?
এ কার বালিশে আমার মাথা
কিংবা বালিশটা আমার হলেও মাথাটা কার?

এক একদিন মনে হয়, দুনিয়ায় আমার
একজনও চেনা মানুষ নেই
অচেনা লোকেরা আড়চোখে তাকিয়ে চলে যায়
কোথায় যেন একটা সেতু ভেঙে পড়ছে
কিন্তু আমার তো কোনও নদী নেই
কারুর কান্না শুনলে মনে হয়

আমিই সে জন্য দায়ী
অথচ কী অপরাধ করেছি জানি না
বাতাস আর বকুল গাছের শাখায় কী সব কথা
কানাকানি হয়
সারবদ্ধ পিঁপড়েরা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে উলটো দিকে ফেরে
কোনও দিঘির বুকজলে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী
তার চোখ খোলার প্রতীক্ষায়
কেটে যায় অনন্তকাল!

এক একদিন হাওয়ায় অজস্র পাখির মতন
উড়তে থাকে চিঠি
তার একটাও আমার জন্য নয়!

নদীর ধারে নির্জন গাছতলায়

ফুলের বাগানে গভীর রাতে লুকিয়ে বসে আছে একটা চোর
মৃদু জ্যোৎস্না, পাতলা অন্ধকার, ওড়াউড়ি করছে পেঁজা তুলোর মতন মেঘ
হঠাৎ দু'-একটা পাখিও ডেকে ওঠে
নিশীথ কুসুমের তীব্র গন্ধ কেমন আবেশময়, সেই গন্ধ কি
ওকে সম্মোহিত করতে পারে না?
চোর হলেই কি তার থাকবে না সৌন্দর্যবোধ?

দিন দুপুরে একটা সাত বছরের বাচ্চা মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল
একজন মুখোশধারী
ওরা মুখোশ পরেছে, পরুক, কিন্তু অতটুকু বালিকার
মুখের হাসি কি ওরা দেখে নি?
গলা টিপে সেই হাসি মুছে দিতে গিয়ে ওদের বুক কাঁপবে না?

তোমার হাতে তলোয়ার থাকলে তোমার শত্রুরও একটা থাকবে

তারপর মুখোমুখি হবে লড়াই
এটাই তো মানুষের নিয়ম
যারা পেছন দিক থেকে আঘাত হানে
নিরস্ত্রকে পুড়িয়ে মেরে অট্টহাসিতে হাওয়া কাঁপায়
তারা কি মানুষ?
জনসংখ্যা যত বাড়ছে, ততই মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে?

এই সব কথা মনে এলে কোনও খাদ্যে আর স্বাদ থাকে না
সব সুরই মনে হয় বেসুরো
সব গাছ থেকে ঝরে যায় ফুল, শিকড়ে লাগে পোকা
নদীর ধারে নির্জন গাছতলায় এখনও কি কেউ
আপন মনে বাঁশি বাজায়
তার প্রতীক্ষায় বসে থাকি।

চোখ ঢেকে

যে যেমন জীবন কাটায়
তার ঠিক সেই রকম এক একটি পোশাক রয়েছে
আলো ও হাওয়ার মধ্যে লুটোপুটি খেয়ে কে যে
আনন্দ-ভিখারি
উড়ুনি ভিজিয়ে সেও বিধ্বংসী নদীর থেকে
শান্তি চেয়েছিল
সহসা বিদ্যুৎ-স্পর্শে চোখ ঢেকে আমিও একদা
অচেনা প্রান্তরে একা ছন্নছাড়া, সমূলে দেখেছি
দিগম্বর মৃত্যু স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সার সত্য

আজ দশতলার জানলায় আমি হু-হু করা কোমল বাতাস খাচ্ছি
এই তো আমিই হাঁটছি আলপথে, বুকে পিঠে গড়াচ্ছে ঘাম
এখন আমার হাতে গরম পানীয়ের গেলাশ। সামনে কাজু
এই আমার হাতেই আমানির শানকি, সঙ্গে শুকনো লঙ্কার টাকরা
কারা যেন আসছে আমাকে কোথাও সম্বর্ধনা দিতে নিয়ে যাবে
আমিই তো এক পরিবারে না-পোষা বেড়ালের মতন লাথি-ঝাঁটা খাওয়া
সৎ ভাই
আকাশে গুমগুম শব্দ, আবার বুঝি আমাকে উড়ে যেতে হবে
এই আমিই তো এক দিঘির ঘাটলায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছি
জ্ঞান নেই
সেই পুকুরটা দেখতে গিয়েছিলাম বহু বছর পর
মানুষের মতন দিঘিরাও নিরুদ্দেশে যায়...

আমি ভূগোল থেকে ইতিহাসে যাতায়াত করতে গিয়ে
কতবার পড়েছি মুখ থুবড়ে
এক সভ্যতার সংসার থেকে বেরিয়ে অন্য সীমান্তের তারকাঁটায়
এক জীবনের মর্ম খুঁজতে খুঁজতে পিছলে যাচ্ছে ভালোবাসার অণু-পরমাণু
বিশ্বাস হারিয়ে যাওয়ায় প্রবল বেদনায় এত শীত
মাঝে মাঝে নিজেকে দাঁড় করাচ্ছি জলের সামনে, যেখানে ছবি ভেঙে যায়
তারপর একদিন মেঘলা দুপুরে ঝলসে ওঠে সেই সার সত্য
বেঁচে থাকা ছাড়া আসলে আর কোনও গভীর সত্য নেই!

রাত্রির কবিতা

বেশ রাত ছাড়া কবিতা লেখা যায় না, কেন না
সব সকালগুলোই বড় কর্কশ
ভোরবেলা খবরের কাগজ ছুঁলেই হাতে রক্ত লেগে যায়

মানুষের রক্ত
তার আগে চিল-চিৎকার কিংবা কাকের ডাকে ঘুম ভাঙে
শহরে দোয়েল কিংবা টুনটুনি থাকে না
আমার চোখেও লাল আভা
একজন সংসার-লোভী আর একজন সংস্যার-ত্যাগী
দরজায় এসে দাঁড়ায়
তারা কথা বলে চাঁচাছোলা গদ্য ভাষায়
একজন সাপুড়ে আর একজন বাঁদরওয়ালা বসে থাকে রাস্তায়
দু'পা এগোলেই হাঁ করে আছে একশোটা দোকান
ট্রাম ও বাসের শব্দে কণামাত্র সুর নেই
দুনিয়ার কোথাও নেই কণামাত্র কবিতা
আমি অপেক্ষা করি রাত্রির জন্য
গভীর রাত, কোনও সঙ্গিনী না থাকলেও
সেই রাত্রিই হয়ে ওঠে নারীর মতন
আমাকে তার খোলা বুক দেখিয়ে আদর করতে ডাকে
প্রতিটি চুম্বনে জমে ওঠে বিন্দু বিন্দু কবিতা...

সুড়ঙ্গের ওপাশে

সুদীর্ঘ সরল একটা সুড়ঙ্গের ওপাশে একটু একটু আলো
কয়েকটি ছায়ামূর্তি হাত-পায়ের ন' দশ রকম
ভঙ্গিমায় খুব ব্যস্ত
অন্ধকারের গায়ে বিদ্যুতের মতন রং, ওরা কাকে ডাকে?
শব্দহীন এক উল্লাস, যেন মুক্তির হাতছানি
আমি কি অত দূরে যাব, না পিছনে ফিরব?

মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য এই দৃশ্য, তারপরই পর্দায়
অন্য ছবি

বইঘেরা ঘর, টি ভি, টেলিফোন, মদের গেলাসের সামনে আমি
বাইরের কাটাকুটি রাস্তায় ঝলমলে আলোতে কোলাহল করছে
শহুরে রাতের পৌনে আটটা
ব্রিজ পেরিয়ে মফস্‌সল পর্যন্ত কংক্রিটের টংকার
মানুষের গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষিতে উৎপন্ন হচ্ছে তাপবিদ্যুৎ
আবার এরই মধ্যে চার-দেয়াল ঘেরা একাকিত্ব
অথচ মন খারাপ নেই, মিহিন বৃষ্টির গুঁড়োর মতন
দেখা যায় না এমন ঔদাসীন্য...
সুড়ঙ্গের ওপাশে ওরা ডাকে, ওরা ডাকে...

সবই অসমাপ্ত

আড্ডা যখন ক্রমে জমে উঠে, তখনই বাড়ি ফেরার তাড়ায়
আড্ডা ভাঙতে হয়
তার আগে বাজে খরচ হয়ে যায় অনেকটা সময়
সুদীর্ঘ রাস্তা পেরিয়ে এসে দুর্ঘটনা হয় হঠাৎ
বাড়ির খুব কাছে
সমস্ত আসরের মধ্যে টের পাওয়া যায় একটা অন্ধকার
বিন্দু
লুকিয়ে আছে।
ভালোবাসার মর্ম বুঝতে বুঝতে, হঠাৎ এ কী,
ফুরিয়ে যাচ্ছে জীবন
জয়-পরাজয় নির্ণয় হল না, তার আগেই আত্মসমর্পণ!

মনে পড়ে রবীন মজুমদারের গান, জীবন এত ছোট কেনে?
ভালোবেসে মিটিল না সাধ...
ভালোবেসে মিটিল না সাধ...
ভালোবেসে মিটিল না সাধ...
ঠিক কথা

ওরে কবিয়াল, সেই দুঃখেই তো সমস্ত কবিতায়
ছড়িয়ে থাকে
এমন ধূপছায়া বিষাদ!

নতুন মানুষদের গল্প

নদীর ধারে ভুতুড়ে পোড়ো বাড়িটায় নতুন মানুষ এসেছে
মরচে পড়া লোহার গেটটা খোলা হল কতকাল পরে
আগাছার মধ্যে ফুটে আছে অনেক নয়নতারা
ওরা দেখছে আর খুশি হয়ে ঢলে ঢলে পড়ছে এ ওর গায়ে
লাল রঙের চটি পরা দুটি ফরসা পা, গোলাপি শাড়ি পরা
কিশোরীটির কাঁধে ফুটে গেল বাবলা কাঁটা
পিঁপড়ের চোখের মতন এক বিন্দু রক্ত
সে কি এই বাড়িটার গল্প জানে?

মিস্তিরিরা ভাঙা জানলা সারিয়ে রং লাগাচ্ছে সবুজ
পাশাপাশি দুটি বাঁশের মইতে চেতন মিস্তিরি
আর তার অন্ধ ছেলে
ছেলেটির হাতেই রঙের বুরুশ
দুপুরবেলায় ঘূর্ণি হাওয়ায় সে অনেক কিছু শুনতে পায়
ওরা দু'জনেই এক সময় ডানা মেলে উড়তে চেয়েছিল
অন্য দুনিয়ায়
ছেলেটিই বেশি দূরে চলে গিয়েছিল, তাই ঝলসে গেছে
তার চোখ
এখন সে জাগরণের মধ্যে গন্ধ পায় ঘুমের
চেতন মিস্তিরির চোখ বুজে আসতেই সে বলে উঠল,

আব্বাজান, সাবধান
ততক্ষণে উলটে গেছে রঙের কৌটো
অন্দরমহলে শোনা যাচ্ছে তিন রকম কণ্ঠস্বর...

পায়রাদের ওড়াউড়ি

ভোরবেলা পার্কের রেলিং-এ হেলান দিয়ে বসে আছে
একজন মানুষ
চিন্ময় আলোয় একঝাঁক পায়রার দিকে এক দৃষ্টিতে
চেয়ে আছে কৈশোরের দিকে
কাছাকাছি পথচারীদের পায়ের আওয়াজে একটা ঝটাপট শব্দ তুলে
উড়ে যাচ্ছে পায়রাগুলো, আবার
ফিরে আসছে ঠিক একই জায়গায়
কী যেন খুঁটে খাচ্ছে আবহমান কাল থেকে
লোকটি শুধু সেদিকে তাকিয়ে আছে, কোনও চিত্রকল্প নয়
এমনই তাকিয়ে আছে
মুসোলিনি কিংবা হিটলার কোনওদিন ওই পায়রাদের ওড়াউড়ি দেখেনি
যখন যুদ্ধে জমে উঠেছে পৃথিবী, কেঁপে উঠেছে ভারসাম্য
তখনও ওই পায়রাগুলো ডানা কাঁপিয়ে উড়ে এসেছে নির্মেঘে
হাওয়া থেকে ধুলোমাটির স্বর্গে
ওই লোকটি ঠায় বসে থাকে পার্কের রেলিং-এ ঠেস দিয়ে।

এদিকে গর্জন করছে ওয়াল স্ট্রিট, অন্য দিকে জাঁকিয়ে বসেছে
মুখোশ ব্যবসায়ীরা
যারা বন্দুক উঁচিয়ে অমর হবে ভেবেছিল
তারা শেষ পর্যন্ত হয়েছে পোকামাকড়ের খাদ্য
যারা অন্যের মাথায় পা রেখে জয়ের আনন্দ পেতে চেয়েছিল

তাদেরই ছিন্ন মুণ্ড গড়াগড়ি খেয়েছে জল কাদায়
তারই মধ্যে ওড়াউড়ি করেছে চঞ্চল পায়রাগুলি, নরম পালকের
শব্দে আদর করেছে অনাদি সময়কে
আর পার্কের রেলিং-এ হেলান দিয়ে বসে থেকেছে
চিরকালের একজন মানুষ
চিন্ময় আলোয় চেয়ে থাকে
কৈশোরের দিকে...

দুপুরের বর্ণ

দূর যাত্রিণীর হাতে একটি শুধু গন্ধরাজ ফুল
গাছ তলায় যে বসে আছে, সে এমনই নিথর যেন
বিসর্জন দেওয়া এক মাটির দেবতা
গাছটির মগডালে একটি নীল-রঙা মাছরাঙা।

এখন দুপুর খাঁ খাঁ, বাতাসে ভাসে না কোনও গান
কিন্তু ছবি তৈরি হয়, মুহুর্মুহু ছবি বদলায়
রং আছে অফুরন্ত, নিভে যাওয়া রান্নাঘরে
কালো বিড়ালিটি অঙ্গ চাটে
শুষ্ক ঢালা শূন্য রাস্তা, আলো ও ছায়ায় মাঝে মাঝে
পাশ ফিরে শোয়
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লতা-গুল্ম, হাওয়া নেই, তবু
কাঁপে একটা হলদে হওয়া পাতা
কলা গাছে লাল পিঁপড়ে, এই মাত্র ডেকে উঠল মেঘ।

পুকুর ঘাটলায় বসে আছে সেন বাড়ির ছোট বউ
কস্তা ডুরে শাড়ি পরা, সদ্য তার সিঁথিতে সিঁদুর

দু’ চোখে আঁচল ঘন ঘন, তবু এত অশ্রু জমা হয়ে আছে
কেন, তা সে নিজেও কি জানে?
ফিকে নীল অভিমান নিয়ে সে কি চলে যাবে গভীর অতলে?
একটি রুপোলি মাছ এক ঝিলিকে বলে উঠল, সাঁতার জানো না
জলে নেমো না, লক্ষ্মীটি, একা নামতে নেই, বেঁচে থাকো
কিংবা দেশান্তরী হও, একটা সোনালি দেশে তোমাকে কী সুন্দর মানাবে!

এই তো সময়

এই তো সময় সব কিছু বিলিয়ে দেবার
বাথরুমের জানলায় দাঁড়িয়ে আছেন
রাজা
প্রয়াগ তীর্থে দিনের শেষে হর্ষবর্ধনের মতন
সাবানটা পড়ে গেছে কমোডে
তোয়ালেটা অন্যের ব্যবহৃত ভিজে
বাইরের রাস্তায় বাঁদর নাচের খেলা দেখতে জমেছে ভিড়
রাজা ফিসফিসিয়ে বললেন,
দিলাম তোমাকে মুক্তি
কে যেন বাইরে থেকে তাড়া দিচ্ছে
দরজা খোলো, দরজা খোলো...

যার আর কিছুই নেই, সে এখন দিতে পারে সর্বস্ব
ক্রীতদাসদের বাজারে দাঁড়ানো যায় মাথা উঁচু করে
বাঁদরটার চেয়েও যার বন্দিত্ব অনেক বেশি শিকল দিয়ে বাঁধা
সে আগেই চুকিয়ে ফেলেছে সব খেলা
শুধু একটা জিনিসই সে এখনও

লুকিয়ে রেখে দিতে পারে গোপনে
সেটা কোনও জিনিসও না
কিছুই না
খুব মৃদু গন্ধের মতন
মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়, ফিরেও আসে

সিঁড়িতে বসে আছে নীরা

এ ভাঙা মন্দিরে দেবতা নেই, সিঁড়িতে বসে আছে নীরা
শাড়িটি নীল তাই শরীরে ঢেউ
ঘামের চন্দন কপালে টিপ
এ ভাঙা মন্দিরে দেবতা নেই, সিঁড়িতে বসে আছে নীরা

এ দেব দেউলের চূড়াটি নেই, শিকড়ে জড়িয়েছে বট
যেখানে বিগ্রহ সেখানে সাপ
যেখানে ঝাড়বাতি সেখানে কালি
একলা ঘণ্টাটি এখনও দোলে, আপনি বেজে চলে রাতে

শিউলি ফুলগুলি ছড়িয়ে আছে, যেমন ছিল বহুদিন
একদা যে বালিকা সাজিতে ভরে
পুজোয় দিত এসে আলতা পায়ে
যুবতী সে এখন, কাঁটার পথে একলা যেতে ভয় নেই

অনেক দিন ঘুরে একটু থামা, আঁচলে হাওয়া খাও তুমি
তোমার বসে থাকা সমুখ জুড়ে
পিছনে পটভূমি অনাদিকাল
শিল্প হয়ে ওঠে বাস্তবতা, সত্য এত অপরূপ

তোমার এ ক্ষণ রূপ চিরকালের, কী করে ধরে রাখি আমি
তুমি তো জানো নীরা, এই আঙুল
জানে না ছবি-ভাষা, রেখা ও রং
শুধুই ছুঁতে চায় তোমার ঠোঁট, না-ছুঁয়ে শত শত চুমু।

শিল্পের বন্দিনী

সেই দিনটিতে ছিল বর্ষার ঘোর
সব রাস্তাই ঠনঠনে ঊরু-ডোবা
তিনটি শরীর, উনিশ কিংবা কুড়ি
পেঁজা শার্ট আর চিরুনি-না-ছোঁয়া চুল।

বাড়ি ঘর সব চকখড়ি টানা রেখা
পাখির তীক্ষ্ণ চোখের মতন মা
কলেজ পালানো দুপুরে নদীর ধার
সন্ধে গড়িয়ে শরীরে অন্ধকার।

ঝড়ে উত্তাল নদীর ঝাপসা ঢেউ
বিদেশি জাহাজ হেলে আছে আধখানা
কেউ স্নানে নেমে সমুদ্রে পাড়ি দিল
বজ্র হানায় মন্দির চৌচির।

তিনটি বক্ষে একই মানবীর ছবি
জল রং, তেল এবং অ্যাক্রিলিক
সময় ছুটছে তুচ্ছ কথার ছলে
হাসির হররা আসলে গোপন খেলা।

বন্ধুরা আজ কোথায় নিরুদ্দেশ
সেই মানবীটি তিনটি হৃদয় ছিঁড়ে
পরবাসে গিয়ে সাজিয়েছে ফুলদানি
তার ছবিখানি শিল্পের বন্দিনী!

উনিশ বড় সাংঘাতিক উনিশ

নদীর ঘাট, উনিশ, পাতলা ছেলে
কপালে ধুলো, পা ডোবানো জলে
তেচোখো মাছ, শালুক পাতায় ফড়িং
ধাম্‌সা বাজে নমোশূদ্র পাড়ায়।

গড়িয়ে যায় বিকেল থেকে সন্ধে
কাজল মেঘে রক্তারক্তি ধারা
জারুল গাছে একলা কাল প্যাঁচা
দুটি জোনাকি জ্বলছে দুই চোখে।

এ ছেলেটার পেটে বিষম ব্যথা
কিছুটা ঝোঁকা, কুঁচকে গেছে ভুরু
খিদে? তেমন কথা তো নয়, চুলো
দু' বেলাতেই মায়ের হাতে জ্বলে।

বাতাস নেই, নদীও নিঃশব্দ
এখন আর আসে না কেউ ঘাটে
নতুন গড়া সাঁকোর ডান পাশে
খেয়া নৌকো উলটে শুয়ে আছে।

উনিশ বড় সাংঘাতিক উনিশ
মুখের রোমে যৌবনের ভাষা
শরীরে গান-বাজনা শুনতে পায়
ছন্দ-মিল নেই, তালও নেই।

অন্তরীক্ষ, যত্ন করে দেখো
ছেলেটা কেন নদীর ধারে একা
ব্যথাটা তার আসলে তলপেটে
এই কষ্ট এত মধুর গোপন!

কেউ কি তার মনকে ছুঁতে চায়
বকুলতলায় চকিত আলো ছায়ায়
আঁচল দিয়ে দু' চোখে দেয় ভাপ
পক্ষী ভাষায় হৃদিভাষ্য শোনায়?

হৃদয় থেকে শরীর কত দূরে?
সে দূরত্ব নিয়েই সারাজীবন
দ্বন্দ্ব চলবে, আজ জানে না কিছু
নদীর জলে দেখে নিজের ছায়া।

আয়ু

পঁয়তিরিশ সেকেন্ডের একটি চুম্বন
দেড় দিনের আয়ু বেড়ে যায়
সেই মুহূর্তগুলিতে মনে পড়ে না মানুষের সভ্যতার পতনের কথা
ইরাকের যুদ্ধ কিংবা মন্দির-মসজিদের বিস্ফোরণ

তুমি মেয়েটির ঠোঁটে ঠোঁট রাখলে, সে বাধা দিল না
তাতে কোনও লাভ নেই
যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার একটি হাত তোমার কাঁধে না রাখবে
স্বেচ্ছায়, আপনমনে
ততক্ষণ খবরের কাগজের রক্তাক্ত পৃষ্ঠা তোমাকে ছাড়বে না...

কোনও ফুলেই এখন আর গন্ধ নেই, না থাকুক
কিন্তু বুকে বুক ছোঁওয়া, হাত খুঁজছে কিছু, সেই দ্রুততার
সুগন্ধই আলাদা
বিছানা পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নেই, গেলেও হয়, না গেলেও এমন কিছু নয়
বিছানায় মানুষের আয়ু বাড়ে না, বিশেষত যখন তুমি ঝড়ের শিখরে
শয্যা-রতি হঠাৎ হঠাৎ অন্যমনস্ক করে দেয়, শরীর ভুলিয়ে দেয়
বরং ঠোঁটে ঠোঁট, প্রতিটি পল-অনুপলে ইতিহাস রক্ত জানে
যদি সে শুধুই মেনে নেয়, তখনও অন্য কারুর কথা ভাবে?
ক্ষমা চাও, চোখ না সরিয়ে
তার পায়ে নিবেদন করে দাও খানিকটা আয়ু খরচের দীর্ঘশ্বাস!

শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডা

কতকগুলো সদ্যযুবা আড্ডা দিত শ্যামবাজারের পাঁচমাথায়
বিকেল-সন্ধে ফুটপাথের রেলিং-এ ঠেস, এক সিগারেট দু'-তিন জন
কখনও কফি হাউসে ঢুকে পকেট খালি, ফের রাস্তায় দু'পায়ে ভর
কীসের টান? শুধু কবিতা? কবিতা ছাড়াও বক্ষ্যমান জীবনস্রোত
কতকগুলো সদ্যযুবা আড্ডা দিত শ্যামবাজারের পাঁচমাথায়।

সেখানে ছিল চোখে-না-দেখা কালপুরুষ, পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনত

মাঝে মাঝেই হেসে উঠত, তার আঙুলে খেলা করত ভবিষ্যৎ
যে চ্যাঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে, সে-ই একদিন নামবে গভীর খনিগর্ভে
যে জানাচ্ছে প্রতি রাত্রে ঘুমের চেয়েও কবিতা লেখা বেশি জরুরি
সে পালাবে তিন সমুদ্র সাতাশ নদী পেরিয়ে এক ঘুমের দেশে
প্রেমে পাগল ছেলেটি বলত, শরীর ছাড়া সমস্ত গান-বাজনা মিথ্যে
সে কি জানবে রূপের সত্য, সে কি জানবে সুর হারানো দিনের দুঃখ?
যেখানে ছিল চোখে-না-দেখা কালপুরুষ, পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনত।

শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডা কবে উধাও, কেউ যেন তা টের পেল না
সে সব নভোচারীর দল মেঠো রাস্তায় হারিয়ে গেল কঠিন রোদে
বিদায় শব্দ কেউ বলেনি, তবু বিদায়, ছন্দ ভুলের মতো বিদায়
কে যে কোথায় পৌঁছল বা পৌঁছল না, তা নিয়েও তো তর্ক অনেক
কালপুরুষের হাতের লেখা চিরকুটটি আজও হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়
মাঝে মাঝেই কালপুরুষের গায়ে লাগে সেই যুবাদের স্বপ্নের আঁচ
যা দৃশ্যমান তাও তো মিথ্যে হতেই পারে, স্বপ্ন কখনও মিথ্যে হয় না।

টান মারে দোলাচল

ফিসফাস শব্দ শুনি। সেদিকেই অফুরান রাত
মধুলোভী যোষিৎ ও পুরুষেরা পরাগ ওড়ায়
হেমঅগ্নি বুক থেকে অন্য বুকে আলোক সম্পাত
কত কিছু ভাঙাভাঙি, গুপ্ত চোখ শরীর পোড়ায়!

বটবৃক্ষ মূলে এক বসে আছে বাউল উদাসী
জীবনদর্শনে কিছু ধাঁধা ঢুকে পড়েছে সহসা
আঙুল নীরব তার কণ্ঠ যেন সুরহারা বাঁশি
অনাম্নী চিঠির মতো গাছের এক একটি পাতা খসা।

আমি কোন দিকে যাই
হুল্লোড় দিয়েছে হাতছানি
তবু কেন মনে হয়
বাউলটির পাশে গিয়ে
                        বসি
শরীর
     সম্ভোগ চায়
তবু যেন অশ্রুতের বাণী
টান মারে,
দোলাচল,
জেগে থাকে নিদ্রাহীন শশী।

এক জন্মের সমস্ত চলে যাওয়ার মধ্যে

হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, এসো
তারপর আমি মাঠে মাঠে ঘুরছি, রোদ্দুরে
                                                  ঝলসে যাচ্ছে কপাল

কিংবা বৃষ্টিতে শপশপে, ভয় দেখাচ্ছে পূর্বপুরুষের আর্তনাদের মতন
                                                  মেঘের এপার ওপার শব্দ

চটি ছিঁড়ে যাক, পায়ে কাঁটা ফুটুক
কিছু আসে যায় না, আমি শুধু শুনতে পাচ্ছি দুটি মাত্র অক্ষরের
পরম বাঙ্ময়তা, যেন মহাকাশের সংগীত
হাট করে খুলে যাচ্ছে দুনিয়ার সব দরজা
গভীর অরণ্য থেকে ভোরবেলার আলো বলছে, এসো
এই মাত্র জন্ম হল যে ঝর্নার, সে বলছে, এসো

মধ্যরাত্রির আকাশের শান্ত নীরবতা বলছে, এসো
শুধু প্রকৃতিতে নয়। শুধু হৃদয়ে নয়, শরীর বলছে, এসো
ওষ্ঠের অমৃত, স্তনবৃন্তের খেদ, যোনির লবণস্বাদ বলছে, এসো
তারও পরে, আরও গভীরে, যেখানে সময়ের সঙ্গে মিশে আছে
চিরকালের শূন্যতা, সেখান থেকেও
ডাক শুনতে পাচ্ছি, এসো
এক জন্মের সমস্ত চলে যাওয়ার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে, এসো—

মেঘলা দিন, মিহিন বাতাসে

রাজ্জাক হাওলাদার, আমার সে গ্রাম সহোদর
বহুকাল পর দেখা, বস্তুত তা কালেরও অতীত
তার জন্মগ্রহণের আগে আমি মাইজপাড়া-ত্যাগী
তবু দেখামাত্র ঠিক রক্তের সম্পর্কে চেনা হল
আমি ঢের বয়ঃজ্যেষ্ঠ, তাই তার কাঁধ ছুঁয়ে উৎকণ্ঠায় বলি
কত দূর থেকে এলি, রাস্তাটা পিচ্ছিল ছিল না তো
পায়ে কি ফুটেছে কাঁটা? মুখ শুকনো, চুলে এত ধুলো
বসে আগে জিরিয়ে নে, তারপর সব কথা হবে।

রাজ্জাক হেসে বলল, দাদা, আপনি ভুল করলেন,
আমি তো আসিনি দূর থেকে, আমি স্বস্থানেই আছি
আপনিই দূর থেকে বহু দূরে, সে দূরত্ব মাপজোক করা
কোনও মানদণ্ডে কিংবা সময়ে সম্ভবপর নয়।
আপনারই পথে বহু বিঘ্ন আর রিপুভয় ছিল
নৌকো ছিল দোলাচলে, অসাবধানে জুতো হারালেন
সে সবই শুনেছি, জানি, সীমান্তের কাঁটাতারে কাঁধ
ছড়ে গিয়ে রক্ত ঝরল, কেউ কেড়ে নিয়েছিল জামা...

এবার আমিও হাসি, আজগুবি গুজব এসব
সীমান্তের কাঁটাতার কখনও দেখিনি, জুতোটাও
হারায়নি, নদীস্রোতে নিজেই দিয়েছি বিসর্জন
রক্ত ঝরেছিল বটে, কাঁধে নয়, বুকের মাঝখানে
সে অন্য কাহিনি, তবে দূরত্বের কথাটা সঠিক
কেউ পৃথিবীর এক প্রান্তে, আমি, ধরা যাক, আছি অন্য পিঠে
কে যে কার থেকে দূরে, এই প্রশ্ন অনন্তকালের
এমনকী কাছাকাছি থেকেও তো দূরত্বের বিষাক্ত নিশ্বাস
টের পাওয়া যায়। কত প্রতিবেশী, পিঠোপিঠি রয়েছে মানুষ
নিতান্ত অচেনা হয়ে, অথবা কখনও মুখোমুখি হলে পরস্পর
তুলেছে সর্পিল ছুরি, পাশাপাশি গ্রাম পুড়ে যায়,
বাল্যের খেলার সঙ্গী স্বার্থপর উত্তর-বয়সে
একে অপরের রক্ত গায়ে মাখে, বিভেদের কত না ছলনা
কখনও ভূমি বা নারী, কিংবা ধর্ম, দুনিয়ার এখানে ওখানে
পবিত্র ধর্মের নামে কত ঘৃণা, ধর্মের মহিমা
পৃথিবীর ধুলো মেখে কখনও বারুদ হয়, কখনও কালের
সিংহ থাবা! যারা স্বর্গ চেয়েছিল, তারা দেয় ভুল আত্মাহুতি
যারা স্বর্গ চেয়েছিল, তারাই তো খুলে দেয় নরকের দ্বার।

রাজ্জাক আমাকে বলল, দাদা ওই সমস্ত কথা, এখন রাখেন
মানুষের ইতিহাস ভরাই যে কত মিথ্যা, আপনি তো জানেনই
আমিও তা জানি কিছু কিছু। এই সভ্যতায় একদিক সাদা
অন্যদিক বড় বেশি ভয়ংকর কালো। তবু দেখেন না আকাশে বিদ্যুৎ
পথ ভুলে অন্ধকারে একা একা কানামাছি, অকস্মাৎ যার
গায়ে হাত ঠেকে, দেখি আলোর ঝলকে সে-ই একান্ত আপন
সে ভাবেই পেয়ে গেছি আপনাকে, অথবা আপনিই বুঝি আমাকে ছুঁলেন!
নদীর দু'পারে দুই মানুষ খাড়ানো, মেঘলা দিন, মিহিন বাতাসে

মনে পড়ে, এক কালে এই নদী, আড়িয়াল খাঁ, বাপ্‌রে কী দুরন্ত
ক্ষুধার্তই না ছিল!

মনে পড়ে? ইলিশের নৌকাগুলি ঘাটে এসে ভেড়ে
আমরা দুইজন পাশাপাশি।

একশো হাজার ঢেউ

এদিকে মা, ওদিকে মেয়ে
মধ্যিখানে জল
তিন সমুদ্র, সাতাশ নদী, বন বাদাড়
এদিকে রোদ বাঘ-আঁচড়া, ওদিকে ঝড়
সৃষ্টি টলমল।

এদিকে দিন, ওদিকে রাত
একই দুনিয়াখানা
মা খাচ্ছেন চা বিস্কুট, হাতে কাগজ
মেয়ের বাড়ি ফেরার পথে ক্লান্ত চোখ
স্বপ্ন দেখা মানা!

লম্বা গাড়ি, চওড়া গাড়ি
গাড়ির মধ্যে ঘর।
পাঁচ রাস্তা, সাত রাস্তা, সব দুদ্দাড়
কেউ সারাদিন কাজ-বন্দি, ফাঁদে ফন্দি
কেউ বা নিশাচর।

চাবি খুলছে, ফোন বাজছে
মেয়ে দৌড়ে এল
নিঝুম ঘর, ঘড়ির চোখ, জানলা খোলা
তুষারপাত, সামনে এক লম্বা রাত
মায়ের গলা পেল!

মেয়ে হাসছে, মা হাসছে
কাঁদছে না তো কেউ
ভালো আছি মা, তুমি ভালো তো, সবাই ভালো
দুই গোলার্ধ, দু' দিকে তার বুকের মধ্যে
একশো হাজার ঢেউ।

পাখির চোখে দেখা ১

১

একবুক জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের চোখের জলও
মেশাচ্ছে সেই স্রোতে
কয়েক পলক মাত্র দেখা
আমি ওই মানুষটিকে চিনি না
তা হলেও কি ওই মানুষটিকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়?
লেখার চেষ্টা করেছি কখনও কখনও
ঠিক নয়, না?
কিছুই না করার চেয়ে এই চেষ্টাটাও কি একেবারে মিথ্যে?

২

বাড়ির দরজার বাইরে হাঁটু মুড়ে বসে আছে ধর্ষিতা মেয়েটি
ওকে ঘিরে আছে একদল মানুষের অহি-নকুল চোখ
ওর ছিন্নভিন্ন শাড়ি ও শরীরে লেখা আছে কিছু ইতিহাস
এমন কিছু দুর্বোধ্য নয়
তবু তা পাঠ করার জন্য একদণ্ডও দাঁড়ানো যায় না
দাঁড়ালেই কান মুলে দেবে বিশ্ব বিবেক
মাটির রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলে যায় হুস করে
একটা কদমগাছ থেকে খসে খসে পড়ছে পাতা
সামান্য মেঘের আড়াল, সূর্যেরও এখন উঁকি মেরে দেখার
অধিকার নেই...

৩

কলাপাতাগুলো ছিঁড়বেই, ছেঁড়া পতাকার মতো উড়বে
নিমগাছটায় পাখিরা বসে না, তালগাছে ঝুমঝুমি
একটি বালিকা আমলকী তুলে রাখছে হাতের মুঠোয়
সে জানে না তার করতলে ধরা পড়েছে বসুন্ধরা!

ছাতারে পাখিরা সাত ভাই বোন, সারাদিন ঝগড়ুটে
ঘুঘুকে দেখেও কিছুই শেখে না, ইষ্টিকুটুম একা
ভোরের ডাহুক ডাক দিয়ে যায়, রাই জাগো, রাই জাগো
ধড়মড় করে রাই উঠে বসে পরপুরুষের ঘামে ভেজা বিছানায়।

কালোমানিকটি দাঁতন করছে কাজলাদিঘির ঘাটে
মাথার ওপর মেঘ গুরু গুরু, সুদিন আসছে বুঝি
শীর্ণ নদীতে কাপড় কাচছে চণ্ডীদাসের রামী
কানা বৈরাগী দোতারার তার ছিঁড়েও মুচকি হাসছে।

আবহমানের থেকে তুলে নেওয়া কয়েক টুকরো ছবি
বড়ই পলকা, কাঁচা শিল্পীর তুলট কাগজে আঁকা
শুধু ভোরবেলা
রৌদ্র প্রখর হলেই সাম্প্রতিকের
বিষ আর রোষ, বুকে গুরুভার, এও তো সত্যস্বরূপ!

আমার প্রিয় জামা

ছেলেবেলার নদীর ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি
পায়ে ফুটেছে কাঁটা
এখন বয়েস আকাশের প্রান্তে, শরীরে পোকামাকড়ের কামড়
একটু একটু খুঁড়িয়ে চলা, নদী কি চিনতে পারছে আমাকে?
আমার পক্ষেও চেনা মুশকিল, কবে সে হারাল তার লাস্য!
একটু দূরে নতুন ব্রিজ, ঘোলাটে জলে পোঁতা কেন এত
খেজুরের ডাল?
একসময় ছিপ ফেলে তুলেছিলাম কালবোস মাছ, সে মাছ
আর বহুদিন দেখিনি
খলসে মাছেরাও কোন নিরুদ্দেশে চলে গেল?

নদী, তুমি আর কবিতায় নেই
ওসব ছেলেবেলার পদ্য! এই তো ঝমঝম করে যাচ্ছে ট্রেন
জানলায় নেই একটিও বিস্ময়মাখা মুখ
কলিমুদ্দি আর ফেরি নৌকো নিয়ে বসে থাকে না
খুব ফড়িং ওড়াউড়ি করত না একসময়?
কলসি কাঁখে বুক ভরা মধু বঙ্গের বধূ আজকাল
দেখা যায় না সিনেমাতেও
ননী পিসির মতন কেউ অভিমানে ঝাঁপ দেয় না মাঝরাত্তিরে

শুধু একটা মাছরাঙা ঘুরে ঘুরে কী খুঁজছে কে জানে
আমার পায়ে ব্যথা, হাঁটতে পারব না বেশিদূর
একটা ভাঙা ঘাটলায় জলে পা ডুবিয়ে কে বসে আছে?
ওই ডোরাকাটা নীল শার্টটা আমার বড় প্রিয় ছিল!

অলীক জন্মকাহিনী

যে নদীতে সাঁতার শিখেছিলাম
সেই নদীটিই আর নেই
মাঝে মাঝে নিজের গায়ে হাত বুলিয়ে ভাবি
সত্যিই কি একদিন সেই জলে ডুবেছি আর ভেসেছি?

ঝিরঝিরি করে ঝরে পড়ত জামরুল ফুল
বাড়ির ঠিক সামনেই পরমাত্মীয়ের মতন বাহুমেলা সেই গাছ
একটা ল্যাজঝোলা খয়েরি পাখি এসে বসত প্রায়ই
কী জানি কী নাম, লোকে বলত ইষ্টকুটুম
তেমন পাখি আর দেখি না কখনও
জামরুল গাছটা স্বপ্নের মতন ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে
ফুটপাথে জামরুল বিক্রি হয়, ছুঁই না কোনও দিন...

সন্ধেবেলা পুকুরে ডুব দিয়ে ভিজে গায়ে হেঁটে আসত
অন্য পাড়ার বিন্তি মাসি
আমার জীবনে সেই প্রথম দেখা নারী
সিংহিনীর মতন কোমরের খাঁজ, কচি বাতাবির মতন
ঘন স্তন
তানপুরার মতন নিতম্বের দোলানিতে মুহূর্তে মুহূর্তে
তাকে মনে হত স্বর্গের দেবী

সেই দেবীই দূর থেকে জাগিয়েছিল এক বালকের
যৌন তেজ
গায়ে আগুন লাগিয়ে বিন্তি মাসি একদিন হারিয়ে গেল হঠাৎ
সেই আগুন আমাকে আজও পোড়ায়!

এক পাশে রান্নাঘর, অন্য পাশে ধলা ঠাকুমার ঘর
আঁতুড় ঘর তৈরি হত মাঝখানের উঠোনে
বৃষ্টি, কী বৃষ্টি, এক বিদ্যুৎ চমকানো ভোরে
মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে দেখেছিলাম
গ্রাম বাংলার প্রথম নীল আলো
একটু দূরে বড় ঘরটার দাওয়ায় হুঁকো হাতে
বসেছিলেন ঠাকুর্দা
ট্যাঁ ট্যাঁ কান্না শুনে অট্টহাস্য করে উঠেছিলেন...

এই সব গল্প শোনানোর মানুষগুলি আর নেই
কোথায় সেই বাড়ি? অলীক হয়ে মিলিয়ে গেছে
সেই রান্নাঘর, সেই উঠোন, সেই দাওয়া, কিছুই নেই
বাস্তুভিটের ওপর দিয়ে এখন চালানো হয় লাঙল
লকলক করে সেখানে সবুজ ধানের শিষ
জন্মস্থানটাই বিলীন, এক এক সময় মনে হয়, সত্যিই কি
আমি কখনও জন্মেছিলাম?

সর্বহারা অবিশ্বাসী

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রী, বেশ সেজেগুজে এসেছে
কিন্তু আমাদের সঙ্গে খেতে বসবে না
আজ তার নীলষষ্ঠী

যৌবন বয়েসে এই নিয়ে কত না চটুল রঙ্গ করতাম
এখন শুধু একটা পাতলা হাসি,
অন্যের বিশ্বাসে নাকি আঘাত দিতে নেই
আর এক বন্ধু, যে প্রথম আমায় ছাত্র রাজনীতিতে টেনেছিল
তার আঙুলে দেখি একটা নতুন পাথর-বসানো আংটি
আমার কুঞ্চিত ভুরু দেখে সে দুর্বল গলায় বলল
শরীরটা ভালো যাচ্ছে না,
তাই শাশুড়ি এটা পরতে বললেন, মুনস্টোন
না বলা যায় না
আমার মনে হল, এ যেন আমারই নিজস্ব পরাজয়!

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের বাড়ি, মাঝে মাঝে যাই তাঁর আলাপচারী শুনতে
এখনও কত কিছু শেখার আছে
আজই প্রথম দেখলাম, তাঁর দরজায় পেছন দিকে,
গণেশের মূর্তি আটকানো
প্রশ্ন করিনি, তিনি নিজেই জানালেন,
দক্ষিণ ভারত থেকে ছেলে এনেছে, কী দারুণ কাজ না?
সুন্দর মূর্তির স্থান শো-কেসের বদলে দরজার ওপরে কেন
বলিনি সে কথা, সেই ফক্কুড়ির বয়েস আর নেই
বয়েস হয়েছে তাই হেরে যাচ্ছি, অনবরত হেরে যাচ্ছি
অন্যের বিশ্বাসে আঘাত দিতে নেই, অন্যের বিশ্বাসে আঘাত দিতে নেই
চতুর্দিকে এত বিশ্বাস, দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে কত রকম বিশ্বাস
যে গেরুয়াবাদী ঠিক করেছে, পরধর্মের শিশুর রক্ত
গড়াবে মাটিতে, চাটবে কুকুরে
সেটাও তার দৃঢ় বিশ্বাস
ধর্মের যে ধ্বজাধারী মনে করে, মেয়েরা গান গাইলে গলার নলি
কেটে দেওয়া হবে
টেনিস খেলতে চাইলেও পরতে হবে বোরখা
সেটাও তার দৃঢ় বিশ্বাস
যে পেটে বোমা বেঁধে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে

যে পেশি ফুলিয়ে, দেঁতো হাসি হেসে
পদানত করতে চাইছে গোটা বিশ্বকে
এরা সবাই তো বিশ্বাসীর দল
সবাই বিশ্বাসী, বিশ্বাসী, বিশ্বাসী...

এক একবার ভাঙা গলায় বলতে ইচ্ছে করে
অবিশ্বাসীর দল জাগো
দুনিয়ার সর্বহারা অবিশ্বাসীরা এক হও!

পাখির চোখে দেখা ২

১

ভুরুর মতন নদীর বাঁক, কুকুর-জিভ রাস্তা
ঘুমের মতন ঘুমন্ত গ্রাম, স্বপ্ন সুখ-সায়র
সদ্য হলুদ ধানের গন্ধে অনেক না-বলা কথা
আশঙ্কার মতন চিল, ছুটির মতন দুপুর

বাল্যকালের মতন স্বচ্ছ দুলছে আলোকলতা
শিমুল তুলোর অনুসরণ প্রথম ভালোবাসা
বৃষ্টি এল পুষ্পধারায়, রতির মতন বাতাস
ভেজা মাটিতে রভস গন্ধ, বিদ্যুতের ঝিলিক
সেও আকাশের তৃপ্ত হাসি, গাছেরা লুটোপুটি
দিনের মতন দিন চলেছে, রাতের মতন রাত!

২

গড়বন্দিপুর থেকে ফেরা, শেষ ট্রেন
দশটা পঁচিশে
ঘুরঘুট্টি কালো রাস্তা, সঙ্গিনী ও বান্ধবেরা ঘুমিয়ে নির্বাক
যদি ট্রেন চলে যায়, বাকি রাস্তা ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না
জোরে চলো, আরও জোরে, আর মাত্র সাত-আট মিনিট
হঠাৎ পথের মধ্যে দু' বাহু ছড়িয়ে, নগ্ন
নিঃশব্দে দাঁড়াল মহাকাল
যেন পেছনের সেতু হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল
শোনো সেই শব্দ-মহোৎসব
সম্মুখেও গতি নেই, কাঁপতে কাঁপতে দেখে যেন গাড়ির ইঞ্জিন
এবার মাটিতে নেমে হাঁটু গেড়ে বসা
রাত-চরা পাখিটির ডাক উড়ে যায় দূরে ধারালো বাতাসে
দু'দিকে প্রান্তরে কোনও জোনাকি জ্বলে না
দিকশূন্যপুরে কেউ জেগে নেই, তাদেরই স্বপ্নের মধ্যে
বন্দি এই আমরা ক'জন আপাতত!

৩

শেখ সুলেমান হাতের দা দিয়ে পাগলের মতন কাটছে কচু গাছ
শেখ সুলেমান থু থু করছে পাশের নয়ানজুলিতে
শেখ সুলেমান কক্ষনও কাঁদে না, বিরলে কান্নার কোনও
জায়গাই নেই তার
শেখ সুলেমান বৃষ্টির মধ্যে ভিজছে তো ভিজছেই
তার চোখ দেখা যায় না
শেখ সুলেমান পীর সাহেবের মাজারের পাশ দিয়ে চলে গেল
ভ্রূক্ষেপও করল না
শেখ সুলেমান তিনটে বাচ্চা সমেত এক ভিখিরিনিকে
ভয়ংকরভাবে দাঁত খিঁচিয়ে তাড়াল

শেখ সুলেমান লাথি কষাল একটা বেড়ালকে
শেখ সুলেমানের শুধু রাগ নয়, নিদারুণ কষ্ট হচ্ছে মানুষটার
খবর্দার, কেউ তার কারণ জিজ্ঞেস করতে যেয়ো না
বরং যে যত পারো তরঙ্গ পাঠাও!

এই স্বপ্নের ঘোর

দশটা সতেরো, দরজা বন্ধ, হাওয়ায় ভাট ফুলের গন্ধ
দশটা আঠেরো, দরজা বন্ধ, অকস্মাৎ রেডিয়ো স্তব্ধ
দশটা উনিশ, ড্যাম্ ইট, ফুল, জানলাটা দিয়ে তাকাও বাইরে
জানলা, জানলা, ইন্টারনেট, টোয়েন্টি ফার্স্ট, জানলা জানলা
দশটা একুশ, ইঁদুরের দৌড়, বাজারে আগুন, ফ্লাইট ক্যানসেল্ড
দশটা বাইশ, ল্যান্ড টেলিফোন, ডোন্ট মুভ, ওটা মেসেজে থাকবে
দশটা পঁচিশ, জিসাস! মিটিং, অন্তত সোওয়া ঘণ্টার ড্রাইভ।

এই পৃথিবীতে কোনও ঘড়ি নেই, স্টিফেন হকিং, সময় স্তব্ধ
এই পৃথিবীতে সব ঘড়ি শেষ, সময় সসীম, নাও গেট লস্ট!
ফের বিগ ব্যাং! কী বিরাট জ্যাম, নিউ জার্সি টার্নপাইকে হাঃ হাঃ
আমি তো কোথাও যাচ্ছি না, আমি জন্ম নিইনি, নিছক একটা স্বপ্ন হয়তো
টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি, এই স্বপ্নের ঘোর ভাঙিয়ে দিয়ো না
এই মুহূর্তে এক্স-ওয়াই নামে ক্রোমোজোম ছুটে যাচ্ছে আমার নারীর গর্ভে
ওদের থামিয়ে দিয়ো না, প্লিজ, মানুষ না থাক, স্বপ্ন বাঁচুক!

এই রাত শেষ হতে

এত পলিউশন খাচ্ছি সারাদিন, এবার এক টুকরো চাঁদ
খেতে হবে
এখন না, শেষ রাতে মেঘের প্রাসাদগুলো ভেঙে-চুরে গেলে
ততক্ষণ কী যে করি, জেগে থাকা চাই
লেখার টেবিলে বসা আমার নিয়তি।
ডান দিকের দেরাজের ছবিটা কোথায় গেল, কেনই বা বন্ধ করা আছে?
আর সব কিছু খোলা, এমনকী সাদা পৃষ্ঠা, এমনকী মদের বোতল
প্রেম যদি ভেঙে যায়, তা হলে দু'-একটা রাস্তা মন থেকে
মুছে দিতে হয়
যেমন চিড়িয়ামোড়, যেমন বকুলবীথি, মানচিত্রে নেই।

টেবিলের ও দেরাজ চিরতরে বন্ধ থাকবে জানি
চাবিটা পেলেও আর খুলবে না, চাবি-মিস্তিরিরা ব্যর্থ হবে
জানি না কী আছে ওর অন্ধকারে, কিছু কি সুগন্ধময় ছবি?
রাত একটা চুয়াল্লিশ, ন'তলায় জানালায় কে এসে দাঁড়াল
আকাশের ফ্রেম, তার চুলে বুঝি হিরে-কুচি, চক্ষে নীল জল
এক পলক, সঙ্গে সঙ্গে কাচ ভাঙার শব্দ, এরকমই হয়, যদি
কলম নিস্তব্ধ পড়ে থাকে
এ সময় আস্তে আস্তে খুলে ফেলতে হয়
পা-জামার দড়ি
গ্রাম বাংলার ঘ্রাণ ভেসে আসে নদীর বাতাসে
এই রাত শেষ হতে আর কতক্ষণ?

অধৈর্য

তুমি কি ফুলের পাশে মুখ
নিয়ে যাও?
না কি, ফুল এসে তোমার মুখের
ঘ্রাণ-লোভী?
কিছু কিছু ফুল আছে ঘ্রাণহীন, যেমন করবী—
তারা যায়
সভ্যতার সাময়িক পাঁশুটে হাওয়ায়
সেতুর নীচের শিশুরক্ত স্নানে।
ফুল বা মুখের ঘ্রাণ নয়, তারা শরীরের—
শরীরে নিচু চোখ, দু' চোখে হিরের মতো লোভ
আয়ুষ্কাল ভিত্তিভূমি, বাসনা
আরোপ করা হলে
আমি সেই ফুল নাম্নী মেয়েদের পাতা ছিঁড়ি দাঁতে।
এবার তোমার মুখ আনো, আমি ঘ্রাণ নেব
একান্ত বিরলে।

অগ্নিকাণ্ড

অরুণাংশু ভেবেছিল, দেখা হবে অগ্নিকাণ্ড শেষ হয়ে গেলে
আগুন লাগবেই, সেটা জানা কথা, কবে বা কখন
শুধু তারই অপেক্ষায়, হাওয়ার দাপটে
একদিন শোনা যাবে সুতীব্র সংকেত, ঘুম ভেঙে
শরীরে হলকার আঁচ, চতুর্দিকে খুব ছুটোছুটি

অরুণাংশু ভেবেছিল, দেখা হবে অগ্নিকাণ্ড শেষ হয়ে গেলে
কেন না অজস্র গ্লানি, ছেঁড়া জামা আগে সাফ হোক
ছায়াগুলো সরে যাক, ধোঁয়াগুলো গিলে খাক রাত
চিঠির বান্ডিলগুলি ছাই হোক, মুখখানি অশ্রুধোয়া হোক
তার সঙ্গে দেখা হবে, নতুন ভাষায় কথা হবে
আঙুলে আঙুল ছুঁয়ে নতুন খেলার শিল্প গায়ে মাখা হবে

অরুণাংশু ভেবেছিল, দেখা হবে অগ্নিকাণ্ড শেষ হয়ে গেলে
আগুন লাগবেই, শুধু সংকেত আসেনি।

চক্ষে গোলকধাঁধা

ছন্নছাড়া বিকেল একটা টানছে ঘূর্ণিমায়ায়
শরীরটা রোদ্দুরে দগ্ধ, মন রয়েছে ছায়ায়।

এখন একটা রাস্তা, তাতে যায় না মোটে হাঁটা
মানুষ নেই, কোথায় গেল, সবার পায়ে কাঁটা?

যাওয়ার কথা আরও দূরে, সময় নেই হাতে
সময় আর দূরত্বও মেতেছে মরা খাতে।

সব রাস্তাই নদীতে যায়, নদীর বুকে চড়া
এক জীবনে এত বন্যা। এবং এত খরা!

একটা নদী পেরুতে হবে, সামনে হাজার বাধা
বিকেল, না কি মাঝ রাত্তির, চক্ষে গোলকধাঁধা।

ধাঁধা

এ ওকে চায়, সে তাকে চায়, কে কাকে পায়
এর কী নাম, ও কেউ না, তৃতীয় লোক
এ চোখে জল, ও হাতে ছুরি, কে কোথা যায়
নীল হাওয়া, রোদ ঝলক, ভুল শহর
স্বপ্ন দেখে কে, স্বপ্ন ভাঙে কে, কে কাকে চায়
এ বাড়ি কার, দরজা খোলা, সিঁড়িতে ভয়
কখনও দেখা, যেন অচেনা, চোখ নিমিল
পাশে কে কার, ভালোবাসার অন্ধ প্রেত
চিঠি অনেক, ছেঁড়া এখন, আরও চিঠি
চিঠি নতুন, বিয়ের দিন, শিশুর দিন
এ একে চায়, সে তাকে চায়, সেই চাওয়া
ভাসে বাতাস, দীর্ঘশ্বাস, ভুল আকাশ
খালি বিছানা, কে জানলায় দেখে সুদূর?
ছায়া শরীর, ছায়া গোপন, ছায়া অতীত
তুমি আমার, আজও আমার, দেয়ালে দাগ
অফিস বাড়ি, বাড়ি অফিস, গোলকধাঁধা
হঠাৎ বৃষ্টি, সেখানে বৃষ্টি, সে কি ভাবছে
আমার কথা, কথা দেওয়া, কথা ভাঙা
আবার রোদ, রোদের ঝাঁঝা, সব অলীক!

সবচেয়ে হালকা অস্ত্র

বইখানির ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন পেত্রার্ক
জন্মদিনেই তাঁর শেষ ঘুম
পাশেই পড়ে আছে একটা পালকের কলম
মানব সভ্যতার সবচেয়ে হালকা অস্ত্র

সাভোনারোলা যখন আগুন নিয়ে খেলা করছিল
পোড়াচ্ছিল বই, চোখ রাঙাচ্ছিল একে তাকে
তখন একটু দূর থেকে ওই অস্ত্রটির নতুন শব্দ তরঙ্গ
ধরাশায়ী করে দিল মধ্যযুগকে।

বইয়ের ওপর মাথা রেখে শেষবার চোখ বুজেছেন কবি
পাশে পড়ে আছে তাঁর কলম
এইবার কলমটি উড়বে, বেরিয়ে যাবে জানলা দিয়ে
হাওয়ায় ভাসছে, দোল খাচ্ছে, মাঝে অদৃশ্যও মনে হয়
কিন্তু তা শুধুই দৃষ্টিভ্রম!

পাখির চোখে দেখা ৩

১

রেললাইনের পাশে একটা লাশ
পুরুষ না রমণী? পুরুষ হলে চার পাঁচ লাইন
নারী হলে ছবি সমেত পৌনে এক কলম
আর যদি যুবতী, ছিন্নবসন, নির্ঘাত প্রথম পৃষ্ঠায়
নারীবাদীরা তবু বলবেন, তাঁরা অবহেলিতা
এ যে এক উলটো ধরনের সত্য
জীবন যাদের ঠেলে দেয় মৃত্যুর দিকে,
মৃত্যু তাদের তুলে আনে খবরের কাগজে!

২

গোরু চরানো রাখাল বালক দুটি বাঁশি বাজায় না, বাঁশি নেইও সঙ্গে
গাছতলায় বসে এ ওর নুংকু ছোঁয়
ওরা দু'জনেই এক জাদুকরী মোহিনীকে চেনে যার নাম বিপাশা বসু
বড় রাস্তার পোস্টারে সে দেখিয়েছে বিনা পয়সায় অনেকখানি ঊরু
ওদের মনের কথা আমি জানলাম কী করে?
আরেঃ, আমিই তো ওদের মধ্যে একজন
আমারও হাতে বাঁশি নেই, কিন্তু সারাদিন ওই ঊরুরও অতীত রহস্য
ছুটে যাওয়া হাসি
আমাকে চনমনে রেখেছে
ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে চোখ!

রেলস্টেশনে নীরা

হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া, নৌকাগুলি দোলে
নদীর ধার ঘেঁষে পুরনো রেললাইন
ভাঙনে ওপড়াবে নতুন গড়া সেতু
না না না এই ট্রেনে আসবে আজ নীরা

হাজারো যাত্রীরা ঘুমিয়ে থাকো সুখে
কোনওই ভয় নেই বজ্র বিদ্যুতে
একলা জানলায় যে আছে জেগে বসে
সে এক জাদুকরী, ওষ্ঠে মৃদু হাসি।

আঙুলে মায়াজাল, চক্ষে ধ্রুবতারা
আঁচলে সুবাতাস, বক্ষে গাঢ় আঁচ

এ নারী শিল্পের, এ নারী বাস্তব
এ নারী চুল খোলে আকাশগঙ্গায়

এই তো ট্রেন এসে থামল জংশনে
প্রথমে দেখা গেল সে নীলবসনাকে
ঝড় ও বজ্রের প্রবল মাতামাতি
দু'বাহু মেলে বলি, এবার ধরা দাও।

হে সুখ দুঃখের অতীত, ধরা দাও
বাসনা ভোগময়ী, এবার ধরা দাও
রক্ত মাংসের, কখনও স্বর্গের
অলীক বিদেশিনী, দৃষ্টি বিভ্রম
এবার ধরা দাও!

আলাদা আয়না

কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে
আর বেশি দিন লাগবে না
এর মধ্যে যার যা দেনা-পাওনা আছে সেরে নাও
অন্ধকারে ছোটাছুটি... নাঃ, ওয়াচ টাওয়ার থেকে
জ্বলবে তীব্র সার্চলাইট
'অনু' ছিঁড়ে ছিঁড়ে রুটি আর 'প্রবেশ' ঘেঁটে ঘেঁটে তরকারি
আর খাওয়া-টাওয়া চলবে না
গোটা সীমান্ত জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া এই শেষ হল বলে
এরপর চিড়িয়াখানার জন্তুর মতন দু'দিকে থাকবে
একই রকম চেহারার মানুষ
শুধু আয়না আলাদা!

এ কোন ঘাটে

এ কোন ঘাটে নৌকো ভিড়ছে
ঝুপ ঝুপ শব্দ আর অগুনতি হাতির শুঁড়ের মতন অন্ধকার
পৌঁছোবার জন্য এতই উতলা ছিলাম যে
জুতোটুতোও খোলা হয়ে গেছে
এখন কেন ঝাপটা মারছে হিমেল হাওয়া
দাঁড়ি-মাঝিরাও সব কোথায় গেল
কেউ তো লণ্ঠন হাতে ওপরে অপেক্ষা করে নেই
আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে অজস্র পিঁপড়ে
এ রকম কথা ছিল?

এ কোন ঘাটে নৌকো ভিড়ছে
যাই হোক, উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়াতে তো হবেই
একবার গলা ফাটিয়ে হেসে নেওয়া যাক!

উপমা

বহুদিন পর দুই ঊরুর মাঝখানে প্রিয় পরপুরুষের জিভের মতন...
মতন কী?
সব কিছুর উপমা দেওয়া এত সহজ নাকি?
ঠিক সেই অবস্থানে পুরুষের মাথাটিকে মনে হয়
কী মনে হয়?
একটি মেয়ে আমাকে বলেছিল, মনে হয় মঙ্গল গ্রহের মতন
এটা কি উপমা হল? আকৃতি, প্রকৃতি বা রঙের মিল, কিছুই নেই
সুতরাং লেখা হবে না
এ রকম কত মনে হওয়া ভাষা পাবে না কোনওদিন
বজ্র বিদ্যুতের মধ্যেও উড়বে কার্পাস তুলোর মতন...

তিরতিরে স্রোত

সমস্ত ব্যস্ততা ও হুল্লোড়ের মধ্যেও সব সময় একটা তিরতিরে মন খারাপের স্রোত। যারা বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছে, তাদের কথা জানি না। বিমান চালক ও আলুর ব্যাপারীদের নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, ট্যাক্সির জানলা থেকে ছুড়ে দেওয়া পয়সা কুড়োয় যে ভিখিরি, আমি তাকে দেখি না, খবরের কাগজের রক্তস্রোত আমার আঙুলে লাগে, আমি বাথরুমে গিয়ে হাতে সাবান ঘষি, উত্তর না দেওয়া চিঠি জমতেই থাকে, মনে পড়ে না। জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়েছে একজন নিষাদ, কোন গ্রামের একটাও উনুনে আগুন জ্বলেনি, জুতোর প্রখর শব্দ তুলে সেও নামছে সিঁড়ি দিয়ে, বিশাল প্রাসাদের সব অন্ধকার, শুধু একটি ঘরে আলো, নদী এসে খেয়ে নিচ্ছে ইস্কুল বাড়ি। না, না, এসব নয়, এসব নয়...

শুধু সর্বক্ষণ একটা তিরতিরে স্রোত বয়ে চলেছে বেঁচে থাকার মধ্যে। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি একটা বিশাল কালো রঙের সমুদ্রের ঢেউ!

জানতে ইচ্ছে করে

ওরা জঙ্গলে থাকে, কিন্তু জংলি মানুষ নয়
বাড়ি ঘর বানায়নি, অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে যখন তখন
ঠিক যেন গল্পের মতন, অথচ গল্প নয় মোটেই
রাত্তিরের দিকে বেরিয়ে আসে আচমকা জনপদে
অশরীরী নয়
সঙ্গে থাকে বোমা, বন্দুক আর ল্যান্ডমাইন, এ ছাড়া দেশলাই
হতভম্ব পুলিশদের ওরা উর্দি খুলে নেয়, অথবা উড়িয়ে দেয় মুন্ডু
কখনও দিনের আলোতেও ভাঙে জেলের গরাদ, বিপথে
ঘুরিয়ে দেয় ট্রেন
ওরা জঙ্গলে ফিরে যায়, কিন্তু জংলি মানুষ নয়

দুপুরবেলা ওরা কী খায়, খিচুড়ি না হতে গড়া রুটি
রোজই নিরামিষ, না কি মাঝে মাঝে ডিমসেদ্ধ বা চুনো মাছ জুটে যায়
জানতে ইচ্ছে করে, খুব জানতে ইচ্ছে করে
প্রত্যেকের কি একটাই প্যান্ট-শার্ট, না কি আরও কিছু থাকে গাছের কোটরে
দাড়ি কামায় না নিশ্চয়ই, নোখ বড় হলে তাও কি কাটে না
গান গায় মাঝে মাঝে? শুধু আদর্শের কথা নয়
চটুল রসের ইয়ার্কি
জানতে ইচ্ছে করে, খুব জানতে ইচ্ছে করে

ধরা যাক একদিন দেখা গেল, পান্তা আছে কিন্তু নুন নেই
তখন নুন ছাড়াই বিশ্বমানবতা হজম করা যায়
কেউ কি ঘুমের মধ্যে কথা বলে? কেউ একা হিসি করতে গিয়ে কাঁদে?
টিলার ওপাশে সূর্যাস্ত দেখে কেউ কি থমকে দাঁড়ায়
ঢুকে যায় মেঘের খুনখারাবি প্রাসাদে
ওরা যে ভবিষ্যতের কথা ভাবে, সেই পথ কতখানি লম্বা
ওরা কি জানে না, বিপ্লব তার প্রথম ব্যাচের সন্তানদের চিবিয়ে চিবিয়ে
খেয়ে ফেলে
আর দ্বিতীয় ব্যাচ বিপ্লবকে উলটো দিকে ঘুরপাক খাওয়ায়
আর যারা আড়ালে গিয়ে বাঁচে, তারা আত্মজীবনীতে কাটাকুটি
করে বারবার
ওরা জঙ্গলের প্রতিটি পাতার শব্দ চেনে, মেয়েদের কথা বুঝি
ঘুণাক্ষরেও মনে আনে না
অবশ্য দলে দু'চারটি মেয়েও থাকে শুনেছি, তা নিয়ে বুঝি রেষারেষি নেই
লূতাতন্তু জালে কেউ জড়ায় না
জানতে ইচ্ছে করে, খুব জানতে ইচ্ছে করে

বান্দোয়ান, বেলপাহাড়ির ওই সব জঙ্গলে গেছি তো কতবার
আর যাওয়া হবে না, আমি আর সেই আমি নই
আমি আর আকাশের নীচে কখনও ঘুমোতে যাব না
তবু ওদের কথা এত মনে পড়ে কেন

যদি কানু সান্যাল বা অসীমের মতন ওরাও
কোনও একদিন বলে, আমরা ভুল করেছিলাম সেই সময়ে
সেদিন আর আমি বেঁচে থাকব না!

পর্তুগিজ ভূত

স্তব্ধতার ভাষা নিয়ে কেউ কথা বলে
জলের শরীর নিয়ে কেউ বসে থাকে উপকূলে
শরীর বিলাসী, তুমি ওদিকে যেয়ো না।

ছোট ছোট দণ্ডে বাঁধা কয়েকটি প্রাণ
ওদের জীবন নেই, মুক্তি ছাড়া জীবনের কোনও মানে নেই
এই আসে, চলে যায়, পড়ে থাকে কয়েকটি অক্ষর
বারুদ রঙের ধুলো ঢেকে দেয় সব।

মাঝে মাঝে ভয় হয়, এ কার কবিতা?
আমারও মাথায় ভর করল নাকি কোনও এক
পর্তুগিজ ভূত?

মফস্‌সলের মেয়ে

বারবারই সে আঁচল ঠিক করে
ঠিকই ধরেছে, তার সামনে বসে আছে এক বুভুক্ষু স্তন-খাদক
যদি শুক্কুরবার বিকেল হয়, তার ফেরার বাস ধরার ত্বরা

দুটি কবিতার একটিতে বৃষ্টির জলের ফোঁটা
বৃষ্টিই ভাবা ভালো, কান্না টান্না দিয়ে কবিতা হয় না
কী চমৎকার লম্বা লম্বা পেলব আঙুল
আলি আকবর খান তোমাকে পেলে লুফে নিতেন
তুমি সেতার বাজাতে লস এঞ্জেলিসে

মেঘ গজরাল নাকি, ঈশান কোণে ঝড়ের ঝমক?
কেঁপে ওঠে মফস্‌সলের মেয়ে, দরজা-জানলা সব খোলা
একজন বৃষস্কন্ধ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে হাতে খড়্গ নিয়ে
কিন্তু আজ তো শনিবার সকাল, স্কুল বন্ধ, কোনও ভয় নেই!

আগুন দেখেছি শুধু

বাচ্চা বয়েসে লিখেছিলাম, ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা
ধ্বনি মাধুর্য, ছবিটি ছিল না তীব্র
পেলিং পাহাড়ে দেখেছিলাম, ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা
রভস চিন্তা, রূপের আড়াল বুঝিনি।

ভাঙা বিকেলের মেঘলা আলোয় পাহাড়ে পবনপদবী
সে কি শুধু নীল, স্বর্ণ উদ্‌ভাসন
থরথর করে কেঁপেছে স্বর্গ, পক্কবিম্বাধরা
ঊরু বিভঙ্গে আগুন দেখেছি শুধু।

জন্মদিনের ভাবনা

পাহাড়ের ঢালে এক পা মুড়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে
কৃপাসিন্ধু মাহাতো
ওর সঙ্গে আমার কখনও চেনাশুনো হবে না
মনে মনে প্রায়ই কথা হয় অবশ্য
তালগাছের পাতার আড়ালে ডাকছে কুবো পাখিটা
কবিতার পঙ্‌ক্তিতে অনেকবার দেখা হয়
গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া একজন নির্দোষ মানুষ, যে দেশেরই হোক না
কিছুতেই দেখতে চাই না তার ছবি, তবু দেখাবেই দেখাবে
সকালের সংবাদপত্র
দেখার চেয়ে অদেখা জগতে আমি চলে যাই বারবার
যে-নদী আমি চিনিই না, তাতে পিঠ ফিরিয়ে স্নান করছে
এক একাকী কন্যা
তার সম্মুখ কেমন তা জানি না
তবু তার ভালোবাসা পাব না বলে মনটা আজও হু হু করে
এই বয়েসে, হ্যাঁ, এই বয়সেও, এমন কী আর বয়েস
বাহাত্তর ওলটালেই তো সাতাশ!

সে তো শুধু রূপকথা

চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই
যেতে হবে যেতে হবে চলো যাই চলো যাই
ধুলো ওড়ে ধুলো ওড়ে কালো ধুলো ঢাকো মুখ
চলো যাই, পড়ে থাক সব কিছু, মায়া থাক
ছায়াটাও ফেলে যাব, রোদ নেই, দিন নেই
শুধু রাত, ধুলো ওড়ে কালো ধুলো চলো যাই

বিছানায় ছাপ ফেলা শরীরের ছবি থাক
দেয়ালের রেখাগুলি ঝুরু ঝুরু ঝরে যাক
দরজায় কার নাম, সব কিছু ক্ষয়ে যাক
চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই

এইখানে দেশ ছিল, আর কারো দেশ নেই
এইখানে স্নেহ ছিল, প্রেম ছিল, সব ভুল
দু' চোখের জল ছিল, শিশুমুখে হাসি ছিল
বিষ ধুলো বিষ ধুলো, মোহময় ভুল ছিল
ছিল কত রণনীতি, আগুনের ইতিহাস
দাঁতে দাঁত চোখে চোখ হাতে হাত দিন রাত
চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই
মা'র হাতে পোঁতা গাছ ফুলে কোনও রং নেই
ফলে নেই কোনও বীজ, জলে নেই কোনও প্রাণ
মাঠ আছে মাটি নেই মেঘ আছে ধারা নেই
পাহাড়ের বুক চিরে ঝর্নার সাড়া নেই
যেতে হবে যেতে হবে রব ওঠে যাই যাই

ফের যাওয়া চলে যাওয়া, সব কিছু ফেলে যাওয়া
দেশে দেশে ভেদ নেই, সীমারেখা গেছে মুছে
এ পৃথিবী সাদা কালো মানুষেরই সমভাগ
নেই আর ছুরি ছোরা কামানের নল নেই
বড় গলা কারো নয়, ছোটরাও ছোট নয়
কারো চোখ লাল নয়, সব চোখে চোখে ভয়
দেশ নেই তবু ভয়, পায়ে পায়ে এত ভয়
চলো যাই চলো যাই পা চালিয়ে চলো ভাই
একটুও দেরি নয়, করো ত্বরা, যদি চাও
ভোমরাটা জেগে থাকে, ওই শোনো দ্রিম দ্রিম!

হাতে কিছু নাই থাক, শরীরেও নেই সাজ

সবকিছু খুলে ফেলো, সব সুতো ফেলে দাও
পোশাকেও বিষ ধুলো থাকবে না এক কণা
নারীরাও আবরণ, ছুড়ে ফেলো আভরণ
সোনা-রুপো শিখী পাখা সব কিছু বিষমাখা
মানুষের গড়া বিষ মানুষের সারা গায়
মানুষের প্রিয় ভূমি গরলের কালো ছাই
এ তো নয় আশীবিষ, তার বেশি কোটি গুণ
চলো যাই চলো যাই, চলো পলাতক দল
ধরাতল ছেড়ে যেতে হবে আর দেরি নয়।

ওই দ্যাখো শ্বাস নেয় শূন্যের মহাযান
দ্বার খোলা, দলে দলে ছুটে চলে কালো মাথা
চলো যাই চলো যাই যদি পেতে চাও ঠাঁই
কোনওদিকে তাকিয়ো না, কেউ কারও বন্ধু না
ভাই বোন দারা সুত ধরে নাও সব মৃত
শুধু বাঁচা নিজে বাঁচা শুধু নিজ দেহ খাঁচা
কাছাকাছি মুখগুলি সবই যেন চোখ বোজা
কে যে নারী কে পুরুষ, তাও যেন নেই হুঁশ
গায়ে কোনও তাপ নেই চাপ নেই হাঁপ নেই
মাংসের পুত্তলি, কথা নেই সব চুপ।

কেঁপে ওঠে মহাযান, এইবার দেবে পাড়ি
বৃদ্ধেরা পড়ে থাকে, আছে শিশু, আছে নারী
এ কী মহাগর্জন, আগুনের ফুলঝুরি
বাতাসের হুড়োহুড়ি, কানে তালা, কানে তালা
তবু সব ঢেকে যায় কান্নার কলরব
বুকফাটা কান্নার ভাষা নেই গান নেই
কবরের পাশে বসা, শ্মশানের আঁচে বসা
জননী ও জায়া আর প্রিয়জন অভাজন
বুক খালি করা শোক, তবু বুক ভেঙে যায়

চোখে এত জল থাকে, বুকে এত ঢেউ থাকে
শত শত শতাব্দী জমে থাকা সব শেষ
স্বপ্নের, জেগে থাকা কৈশোর, যৌবন
শূন্যের মহাযান, কান্নার মহাযান!

চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই
বিষ ধুলো বিষ হাওয়া পৃথিবীতে পড়ে থাক
সাগরের ঘন নীল, ছোট ছোট দ্বীপগুলি
দ্বীপ নয়, ওই সবই, এক কালে দেশ ছিল
দেশ ছিল, কত গান, আরও কত প্রেম ছিল
এক দেশ ছেড়ে সব ফেলে গেছি একদিন
যার নাম দেশ তাও মানুষকে ঠেলে দেয়
কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা বন্দুক পিঠে তাক
সেদিনও তো চোখে জল, বুক ভরা অভিমান
ওই যেন দেখা যায়, ছোট থেকে একাকার
সব দেশ মিশে গেল, সবই আবছায়াময়
অস্ত্রের কারবারি হিংসার মহাজন
সবই আজ পথহারা, কে এসেছে কে আসেনি
যে-ঘাতক সেও আজ কেঁদে কেঁদে ধরে হাত
কার হাত, আহত বা আততায়ী কারও হাত।

চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই
এ পৃথিবী ছেড়ে যাই, চিরতরে ছেড়ে যাই
যেতে হবে যেতে হবে বিষ ধোঁয়া, যেতে হবে
একদিকে বাঁকা চাঁদ, আরও দূরে যেতে হবে
আরও কোনও গ্রহ আছে, নিশ্বাসে বাঁচা যায়
মানুষের অধিবাস পৃথিবীতে শেষ হল
ভিন কোনও গ্রহ ছাড়া মানুষের আশা নেই
বাসভূমি নেই আর মুক্তির পথ নেই
চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই

ধরা যাক পেয়ে গেছি ছিমছাম মনোভূমি
আলো আছে, হিম আছে, প্রতিরোধ নেই কিছু
বড় তারা রোদ দেবে, বর্ষণ প্রাণ দেবে
শূন্যের মহাযান, এইখানে থেমে যাবে?

থামুক না, কতদিন স্নান নেই খাওয়া নেই
চক্ষেও জল নেই, শরীরেও সুতো নেই
হোক না এ অচেনায় মানুষের বসবাস
ভ্রমরের আয়ুটুকু ধুকধুক টিকে থাক
করতলে আমলকী থাকবে কি থাকবে না
ফের এক ঘর বাঁধা নড়বড়ে খুঁটিনাটি
উনুনের ব্যস্ততা, আরও কিছু আছে বাকি
সবই হল ঠিকঠাক, ধরা যাক ধরা যাক
এ নতুন বসতিতে জীবনের চলা শুরু
চোখ মুছে পথ চলা, চোখে নেই কোনও জ্বালা
সব ভাষা ভুলে গেছি, ভাষাহীন নীরবতা
হৃদয়েরও ভাষা নেই, অতীতেরও ভাষা নেই,
তাই ভুলে যাওয়া সোজা, ফেলে আসা সব বোঝা

শুধু এক খোঁজাখুঁজি কী গোপন, কী গোপন
আমরা কি আজও আছি, মানুষ, না আর কিছু
আমরা কি আজও আছি, মানুষ, না আর কিছু?
আমরা কি আজও আছি...
আমরা কি আজও আছি...
অথবা কি অনাগত কাল এসে বলে দেবে
মানুষেরা ছিল নাকি কোনও দিন কোনও দেশে
ইতিহাসে লেখা নেই, সে তো শুধু রূপকথা!

প্রাণের প্রহরী
(কাব্যনাটক)

[একজন ডাক্তারের চেম্বার। সাহেবপাড়ায়। সন্ধের পর এ অঞ্চল নিঝুম হয়ে আসে। চেম্বারটি বেশ প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। টেবিল ও অনেকগুলি চেয়ার ছাড়াও একটি কালো রেক্সিনে মোড়া গদির বিছানা। সেখানে দু'জন বয়স্ক যুবক বসে আছে। এদের নাম প্রতীক ও সংবরণ। এরা অপেক্ষা করছে ডাক্তারের জন্য, নিচু গলায় কথা বলছে।

ডাক্তারের দশাসই চেহারা। গলার আওয়াজ গমগমে। তাঁর নাম হৃষীকেশ। সবাই ঋষি বলে ডাকে। তিনি একটু চেঁচিয়ে কথা বলেন, অনেকটা নাটুকে ধরনের। তিনি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রৌঢ় চেহারার শিশু।]

দূর থেকে ডাক্তারের গলার আওয়াজ শোনা যায়:
ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা কী?

প্রতীক : ঐ আসছে ঋষি, সারা পাড়াটা কাঁপিয়ে

সংবরণ : সারাদিন এত খাটনি, তবু ওকে ক্লান্ত হতে
দেখি না কখনও!

ডাক্তার: ব্যাপারটা কী হে! সব এত চুপচাপ
বসে আছো কেন? দূর থেকে ভাবলাম
কেউ নেই, আলো জ্বলছে, যেন কোনও বাগানের মধ্যে একটা ঘর।
কী রে সংবরণ, তুই কী যেন ভাবছিস মনে মনে?

প্রতীক: চুপচাপ থাকব না কি নাচানাচি করব দু'জনে?
কতক্ষণ ঠায় বসে আছি!

সংবরণ: আর ঠিক পাঁচ মিনিট দেখতাম, তারপর ভাই
কেটে পড়তাম।

ডাক্তার: আরে বোস বোস, এত রাগারাগি কেন,
আমি একা বহুক্ষণ এখানে ছিলাম। এ সময়

কোনও সুস্থ মানুষের দেখা পেতে খুব
মন চায়। সারাদিন রুগি আর রুগি!
ক'টা বাজল?

প্রতীক: সাড়ে আটটা, না, না, তার পাঁচ মিনিট কম

ডাক্তার: যথেষ্ট হয়েছে! আজ রুগি দেখা এখানে খতম!
কানাই, কানাই, কেউ এলে বলবি, আটটার পর
সব অসুখের ছুটি। আমি নেই, দরজা বন্ধ কর,
এখন আনন্দ হবে, ফুর্তি হবে...
কে ওখানে?

সংবরণ: কেউ না তো?

ডাক্তার: মনে হল একটা ছায়া

সংবরণ: কিছু নেই

ডাক্তার: ওফ এক পার্শি মহিলাকে দেখে আসছি এক্ষুনি,
মাগীর অসুখ নেই কোনও

সংবরণ: ল্যাঙ্গোয়েজ! ল্যাঙ্গোয়েজ!

ডাক্তার: যত বলি, মা জননী। তোমার তো অসুখ কিচ্ছু না!
ঘ্যানোর ঘ্যানোর করে তবু বলে, ডাক্তার, আমায় তুমি
ঠিক মতন ওষুধ দিচ্ছ না!
এখানে সেখানে ব্যথা, প্রতিদিন ঘুম যাচ্ছে কমে,
টাকার বান্ডিল, অতি বড়লোক ঘুম হয় টাকার গরমে?
প্রেসার নর্মাল, স্টুল, ইউরিন, কিংবা রক্তে চিনি,
সমস্ত পরীক্ষা করে দেখা হল, স্বাভাবিক। তবু
প্রতিদিনই
ডাক পড়ে

প্রতীক: আহ্ ঋষি, রাত্তির অনেক হল, আমরা এখনও
পেচ্ছাপ বাহ্যির কথা শুনব? এর মানে হয় কোনও?

ডাক্তার: না, না, ফুর্তি হবে, আজ ফুর্তির দরকার
আমারই সবচেয়ে বেশি। কে ওখানে?

সংবরণ: কেউ না তো?

ডাক্তার: মনে হল, ঠিক যেন কোনও

মেয়ে, বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে কেন এ রকম?

প্রতীক: টাকার ধান্দায় রোজ এত পরিশ্রম!
এরপর চোখে সর্ষেফুল দেখবে কোন্‌দিন, ঋষি!

ডাক্তার: (নিচু গলায়, আগেকার ভাষায় যাকে বলা হত 'জনান্তিকে'। অর্থাৎ তাঁর এ কথাটা অন্য কেউ শুনতে পাবে না)
না, না, সে রকম নয়। বাবলুর অসুখের পর
একটি মেয়ের ছায়া দেখতে পাই ক'দিন অন্তর
চুপ করে দরজার পাশে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়
আবার চোখের এক পলক ফেলার আগে চলে যায়
আমি তো চিনি না, ও কে?

প্রতীক: মেয়েটি কেমন দেখতে?

ডাক্তার: (চমকে) কোন মেয়েটি?

প্রতীক: ঐ যে পার্শি মেয়েছেলে, যার কথা তুমি বলছিলে!

ডাক্তার: অসুন্দর পার্শি আমি এ পর্যন্ত দেখিনি কখনও,
ডাক্তারি শাস্ত্রের মতে যে শরীরে রোগ নেই কোনও
তবুও অসুখ থাকে সেখানেও। এই যে মহিলাটি,
রোগ নেই, তবু তিনি অসুস্থ যে সে কথাও খাঁটি!

সংবরণ: তোমাদের প্রচণ্ড সুবিধে,
শুধু ভাই আমাদেরই যা কিছু দুর্ভোগ
যে অসুখ সারাতে পারো না, বলে দাও,
'ওটা মানসিক রোগ!'

ডাক্তার: হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! সকলেরই খুব রাগ ডাক্তারের প্রতি,
অথচ ডাক্তার ছাড়া চলেও না, কিছু হলে কাকুতি মিনতি!
অন্যান্য সময়ে দুর্‌ শালা!
মনের অসুখ চিনে নিতে
ভুল তো হতেই পারে। ইচ্ছে আছে এই মনটাকে
একদিন ঠেসে ধরব ল্যাবরেটরিতে।
পঞ্চভূত মানুষের দেহে
ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, বায়ু আর ব্যোম। অত্যন্ত সস্নেহে

শরীর এদের পোষে। এর মধ্যে পঞ্চমটি বাদে
বাকি চারটিকে ঢের নেড়ে চেড়ে দেখা হয়ে গেছে,
কিন্তু গোল বাধে
অদ্ভুত জিনিসটি নিয়ে, ঐ ব্যোম, অর্থাৎ শূন্যতা
তার কোনও দিশা নেই, কোনও শাস্ত্রে নেই তার কথা।

সংবরণ: রবীন্দ্রনাথের লেখা আছে এ বিষয়ে, সে সব পড়োনি বুঝি?
তা পড়বে কেন? ডাক্তারেরা বই-টই পড়েন না। শুধু মাত্র
রুজি-রোজগারের ধান্দাতেই মত্ত সমস্ত সময়

প্রতীক: সারা দিনে অ্যাভারেজ ঠিক কত হয়?
দশ, বিশ হাজার, না বেশি?

ডাক্তার: বাজে কথা বোলো না হে! প্রতিদিন দশ কি বারোটি
গ্রন্থপাঠ করি আমি। মানুষের নোখ থেকে মাথার করোটি,
হাড় মজ্জা রক্তের জীবন, এর চেয়ে বড় আর গ্রন্থ আছে?

প্রতীক: এ সমস্ত সস্তা দার্শনিকতা দিয়ে কি পেট টেট ভরবে ভাই?
ঢের হল! মালকড়ি ছাড়ো কিছু মাল-টাল খাই?

ডাক্তার: হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফুর্তি হবে, আজ ফুর্তির দরকার
আছে খুব আমার নিজেরই। মন ভালো নেই।
দিতে হবে এক ডুব ফুর্তির সাগরে কিছুক্ষণ।

(বোতল থেকে মদ ঢালা হয়। তিন বন্ধু চিয়ার্স বলে পান শুরু করে।)

ডাক্তার: কে, কে কে ওখানে?

প্রতীক: জ্বালালে দেখছি আজ? থেকে থেকে বারবার কে, কে?
ভুল হতে হতে তবু মানুষ তো খানিকটা শেখে!
রাত্তিরে ঘুমোও না বুঝি?

ডাক্তার: না, না, ভুল নয়, খুব স্পষ্ট চোখে দেখা
বাবলুর অসুখের পর থেকে

সংবরণ: বাবলু, তোমার ছেলে,
তার কী হয়েছে?

ডাক্তার: কী হয়েছে...

আমি নিজেই যে
জানি না উত্তর—

প্রতীক: ধুত্তোর!
খালি শুধু অসুখ,
অসুখ!

[নেপথ্যে একজন কেউ ডাকল, ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু!
নদীতে মাঝিরা যে-রকম সুর করে করে জল মাপে, সেই রকম কণ্ঠস্বর।]

সংবরণ: ঐ তো এসেছে কেউ
প্রতীক: ফের কোনও রুগি-টুগি
সংবরণ: এ লোকটিই বহুক্ষণ থেকে আছে দরজার পাশে?
ডাক্তার: না, না, এ সে নয়। একে জানি। চিনি এর
গলার আওয়াজ
মাঝে মাঝে আসে। সাত দিন পর আবার এসেছে বুঝি আজ।
[আগন্তুকের প্রবেশ। বৃদ্ধ, মুখে সাত দিনের পাকা দাড়ি। একটা রং-জ্বলে-যাওয়া নীল জামা গায়, সে আর কারুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে শুধু ডাক্তারের দিকে চেয়ে থাকে।]
আগন্তুক: ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার: কে, ধরণী?
আবার এসেছ, তুমি এখনও মরোনি?
আগন্তুক: (সাগ্রহে) মরব, ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার: মরার কি অন্য কোনও জায়গা পেলে না?
আমার কাছেই বুঝি আছে শুধু দেনা?
আগন্তুক: মরব, ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার: সাত দিন কোথা ছিলে? ফের চাড়া দিয়ে উঠে এলে?
আগন্তুক: মরব, ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার: চুপ করো! মরণের উচ্চারণ এখানে নিষেধ!

[ডাক্তার পকেট থেকে তিরিশ-চল্লিশটা টাকা বার করে দিলেন। লোকটি কোনও কৃতজ্ঞতা বা নমস্কার না জানিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।]

প্রতীক:	কী ব্যাপার লোকটাকে দিলে এত টাকা?
আমাদের ফুর্তির খোরাক সব ফাঁকা?

সংবরণ:	আগেও দেখেছি, তুমি ঐ বুড়োটাকে টাকা দাও,
ব্ল্যাকমেল নাকি?

ডাক্তার:	ব্ল্যাকমেলই বটে! এই বুড়ো লোকটি প্রাক্তন নাবিক,
ছিল জলে ভ্রাম্যমাণ। এখন ডাঙায় এসে দিক
হারিয়েছে। ও চেনে না শহরের বাঁধা পথ; মাটির নিয়ম
ও জানে না। সংসারের বুদ্ধি ওর কম
ও বোঝে না নিজের সুবিধে
বাড়িতে পাঁচটি বাচ্চা, রোগা বউ, আর আছে খিদে
বেকারের খিদে পাওয়া অতি বড় দোষ
বেকারের সন্তানের খিদে পাওয়া আরও বেশি দোষ!

প্রতীক:	আবার দুঃখের গপ্পো! আজ শুধু অনন্ত ঝামেলা।

ডাক্তার:	না, না, না, না; এবারই তো শুরু হবে খেলা!

সংবরণ:	ও বেকার, কিন্তু তুমি কেন দিতে যাবে ওর অন্ন?
তুমি কি সমাজ? নাকি রাষ্ট্র? নাকি খোদ দাতা-কর্ণ?

ডাক্তার:	সে সব কিছু না।
আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনচর্যায়
এ রকম ফাঁক থাকে। ঐ লোকটা শূন্য-হাতে বাড়ির দরজায়
যদি ফেরে, ঠিক পাখির ছানার মতো, পাঁচটি হাঁ-করা মুখ
মেলে আছে। ওরা রোগী, এর নাম খিদের অসুখ!
ও তো পয়সা চায় না,
বিষ চায়! দু'-তিন বার ওর বাড়ি গেছি।
যা দেখেছি,
মনে হয়, এতকাল বইপত্রে যা কিছু শিখেছি
সেখানে উত্তর নেই এ সব প্রশ্নের।
এ পর্যন্ত খিদের ওষুধ কিছু বেরিয়েছে? তবে?
নাকি বিষ দেব?
আমি তো ডাক্তার, কিছু একটা দিতে হবে—

প্রতীক:	ওসব বাতেলা ছাড়ো, মাল আনো

মালের উৎসবে
বুঁদ হয়ে থাকি! তুমি অতি বুদ্ধু তাই এখনও উত্তর
চাও, এখনও বিবেক নিয়ে প্যানপ্যান করে চলেছ, ধুত্তোর

ডাক্তার: কানাই, নিয়ায়, আরও মাল আন্ আজ ফুর্তি করি,
মন ভালো নেই
আমার নিজের ছেলে হাসপাতালে দিনের পর দিন...

সংবরণ: এমন ফুটফুটে ছেলে, তার কিছু হতেই পারে না

ডাক্তার: সুইডেন থেকে তার জন্য কিছু অ্যামপিউল কেনা
বিশেষ দরকার

প্রতীক: 'মাই সান, মাই এক্সিকিউশানার'

ডাক্তার: (চমকে) তার মানে?

প্রতীক: 'ওরে পুত্র, জল্লাদ আমার!'

ডাক্তার: কার পুত্র? কে জল্লাদ?

প্রতীক: প্রত্যেক পিতার পুত্র, পিতার জল্লাদ
এক ছোকরা এই নিয়ে লিখেছে কবিতা।
দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু, আর দিনে দিনে বড় হয় ছেলে
আর তুমি, তার পিতা ততই মৃত্যুর দিকে যাও তুমি হেলে!

ডাক্তার: এক্ষেত্রে আমিই বুঝি পুত্রহন্তা, সেই বুঝি ভালো...
মাত্র ন'বছর, এর মধ্যে মৃত্যু শিয়রে দাঁড়াল।
একি প্রতিশোধ?
আমি বহুবার বহু বাড়ি থেকে
মৃত্যুকে ফেরাই
মরণের সঙ্গে হয় পাশাখেলা
আমি জিতে যাই
তাই মৃত্যু এবার কি জাল ফেলে ছেঁকে
আমারই সংসারে দেবে থাবা?

সংবরণ: কী রকম আছে বাব্‌লু?

ডাক্তার: যখন ঘুমন্ত থাকে, ভালো থাকে,
হাসে, কথা বলে,
সত্যিই ঘুমের মধ্যে হাসে কথা বলে। যখনই সে জেগে ওঠে,

অসহ্য যন্ত্রণা,
যেন কাকে দ্যাখে
ক্যাবিনের বাইরে, কেউ নেই তবু দ্যাখে

সংবরণ: কী ঠিক অসুখ ওর?

ডাক্তার: নেফ্রটিক সিন্‌ড্রম। তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না,
দুটি কিডনিতেই ওর অজানা অসুখ

সংবরণ: অজানা অসুখ?

ডাক্তার: আশ্চর্য হলে কি? শুধু মন নয়,
মনুষ্য শরীরে
এখনও অচেনা কিছু রয়ে গেছে

প্রতীক: বিশ্বাস করি না! তুমি চিকিৎসা ছেড়ে মন্ত্রতন্ত্র নাও

সংবরণ: কিডনির অসুখ? আজকাল প্রায়ই শুনি
মাদ্রাজে ভেলোরে,
চমৎকার সেরে যায় সব...

প্রতীক: আরও একটু সরে
হোয়াইট ফিল্ড গ্রামে যাও, সাধু সন্ন্যাসীর দেওয়া ছাই ভস্ম,
হাওয়া থেকে ফুল...

ডাক্তার: ও সমস্ত কথা থাক, এসো খাই

সংবরণ: ঋষি, তুমি বড়ই অস্থির হয়ে আছো ভাই

ডাক্তার: হয়তো বাঁচানো যায়, আজ থেকে মাস দেড়েক আগে
ডাক্তার লোম্যান নামে একজন সেন্ট পিটার্সবার্গে
পরীক্ষা চালিয়েছেন বাঁধা-মৃত্যু দশ জন রোগীর শরীরে
নতুন ওষুধ কিংবা বিষ-ফল, ঠিক যেন মেঘ চিরে
হঠাৎ বিদ্যুৎ কিংবা বজ্রপাত কিংবা আশীর্বাদ,
শুভ কিংবা অশুভ সংবাদ...
পাঁচ জন বেঁচে গেছে, পাঁচটি বাঁচেনি!

সংবরণ: পাঁচ জন বেঁচে গেছে, পাঁচটি বাঁচেনি?
এ যে সাংঘাতিক
একি সার্থকতা নাকি ব্যর্থতারই আর এক দিক

ডাক্তার: যাক আর ও কথা নয়। ভুলে থাকতে চাই

ফুর্তি হোক। শালা মরণের মুখে ছাই
দাও, তুড়ি মারো, এই তো এসেছে, সব গ্লাসে ঢালো
কে ওখানে?
কে ওখানে?

[ঝনঝন করে গেলাস ভাঙার শব্দ ও জলতরঙ্গ বাজতে থাকে।]

প্রতীক ও সংবরণ: একসঙ্গে — কেউ নেই, কাছাকাছি আর কেউ নেই
আমরা তো কিছুই দেখছি না

ডাক্তার: আমিই কি শুধু দেখি? মনে হয় যেন খুব চেনা

একটি নারীর কণ্ঠস্বর: ঋষি, ঋষি

ডাক্তার: কে তুমি? তুমি কে?

প্রতীক: ঋষি, তুই এত চ্যাঁচাচ্ছিস কাকে দেখে?

নারীকণ্ঠ: ঋষি ঋষি

ডাক্তার: কে তুমি? দেখাও মুখ, এসো, কাছে এসো

নারীকণ্ঠ: আমি তো রয়েছি ঠিক তোমারই সম্মুখে

ডাক্তার: কুয়াশায় ঢাকা কেন, কায়া নেই বুঝি?
শুধু যেন ছায়া

নারীকণ্ঠ: চোখের কুয়াশা! ঋষি, এসো একবার
তুমি আর আমি শুধু মুখোমুখি বসি
দু'জনে মনের কথা এক মনে বলি

ডাক্তার: তোমাকে চিনি না, তবু দু'জনে মনের কথা হবে বলাবলি?
তুমি কোনও পাগলিনী বুঝি?
পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছ?

প্রতীক: আমাদের বন্ধুটি যে একা একা কথা বলছে
হঠাৎ পাগল হল নাকি।

সংবরণ: ঋষি, তোর কী হল, কী হল?

ডাক্তার: তোরা আয় তো মেয়েটাকে ধরি
নারীকণ্ঠ: না, না, ঋষি, আমাকে ছুঁয়ো না! তুমি, না, না ছুঁতে নেই
(দু'-তিন বার এই কথা বলতে বলতে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায়)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হাসপাতাল, ক্যাবিনের মধ্যে খাটে ঘুমিয়ে আছে বাবলু। ন'-দশ বছর বয়েস। তাকে ঘিরে চার-পাঁচ জন ডাক্তার। সকলের মুখ মেঘলা, ঋষি তাঁর অধ্যাপক এক প্রবীণ ডাক্তারকে শেষবার অনুরোধ করলেন।]

ঋষি:   স্যার, নতুন ওষুধ এইমাত্র আমি নিজে দেখে
সব ঝুঁকি নিয়ে, সব ভেবে চিন্তে ভরেছি সিরিঞ্জে
আপনি দিন
স্যার: ঋষি, তুমি ক্ষমা করো, আমাকে বোলো না
বুড়ো হয়ে গেছি, আজকাল হাত কাঁপে
ঋষি:   স্যার, কে না জানে আজও কলকাতা কিংবা সারাদেশে
আপনার তুল্য চিকিৎসক বেশি নেই
স্যার: তবু তুমি ক্ষমা করো এই বৃদ্ধটিকে!
যে ওষুধ পরীক্ষিত নয়, তা আমি কী করে জেনেশুনে
দিই?
তোমার সন্তান সে যে আমারও অনেক আদরের।
ওকে আমি কী করে অজানা পথে নিয়ে যাব, বলো?

ঋষি:   (অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে) ডক্টর লাহিড়ী, আমি
আপনাকে যদি
লাহিড়ী:   না, না, ঋষি, ক্ষমা করো
ঋষি:   ডক্টর সামন্ত? আপনিও ভয় পেয়ে
সামন্ত: ভয় নয়, ঋষি, এ যে অর্ধেক হত্যার
ঝুঁকি নেওয়া

ঋষি: অর্ধেক জীবন? তার ঝুঁকি নেওয়া যায় না বুঝি?
ঠিক আছে। তা হলে আমিই নিজে পুত্রঘাতী হব,
নিজ হাতে এই বিষ আমি ওর শরীরে মেশাব।
আপনারা সবাই বাইরে যান তবে
[ঘর খালি। ঋষি ছেলেকে ডাকলেন]

ঋষি: বাবলু, বাবলু, ঘুম থেকে উঠে আয়,
আমরা দু'জনে ফের ভোরবেলা বাগানে বেড়াব

বাবলু: বাবা—

ঋষি: বাবলু, বাবলু

বাবলু: বাবা, তুমি কত দূরে আছো?

ঋষি: এই তো এখানে আমি, শিয়রের কাছে

বাবলু: ভীষণ যন্ত্রণা! বাবা, তুমি হাত ধরে নিয়ে যাও,
আমাকে অনেক দূরে এমন কোথাও
যেখানে একটুও ব্যথা নেই—

ঋষি: এই দ্যাখ, আমার ডান হাতে ছুরি, আমি
চোখের নিমেষে
তোকে নিয়ে যাব সব যন্ত্রণার শেষে
এক শান্ত অন্য দেশে

বাবলু: খুলতে পারি না চোখ, এত ব্যথা,
কেন এত ব্যথা?

ঋষি: চোখ যে খুলতেই হবে, অন্ধকারে কী করে না দেখে
যাবি সেই অন্য দেশে?

বাবলু: ছুরি কই? এ যে ইঞ্জেকশান!

ঋষি: বাবলু, বাবলু, শোন,
খুব মন দিয়ে তুই শোন,
সিরিঞ্জে ভরেছি আমি নতুন ওষুধ কিংবা বিষ
হয়তো উঠবি বেঁচে, কিংবা চলে যাবি পরপারে
যদি পরপার বলে কিছু থাকে,
সেখানে আমাকে দোষ দিস,
ভেবে নিস, বাবা তোকে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায়

পাঠিয়েছে সেইখানে। আর যদি কোনও ক্রমে বেঁচে
উঠিস তা হলে সেটা তোরই নিজের জয়

বাবলু: বাবা, তুমি সব যন্ত্রণার শেষ করে দাও

ঋষি: দেব, তাই দেব, তোর মা আমাকে মাথার দিব্যিতে
নিষেধ করেছে, বুঝি কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাবে।
আত্মীয় বন্ধুরা, চিকিৎসক, কেউ রাজি নয়
তুই রাজি? তুই ছেলেবেলা থেকে দারুণ সাহসী

বাবলু: আমি রাজি। আমাকে ওষুধ দাও, কিংবা বিষ

ঋষি: তাই হোক। চোখ চেয়ে থাক

[মৃত্যুর প্রবেশ। মহাভারতের বর্ণনার মতন অনেকটা তার রূপ। সে একটি নারী। সর্বাঙ্গে কালো পোশাক। নতুন তামার বাসনের মতন গাত্রবর্ণ। পিঠের ওপর গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুর ফলের মতন কোঁকড়ানো চুল। তার চোখে জল।]

মৃত্যু: একটু দাঁড়াও ঋষি। কথা আছে

ঋষি: কে তুমি?

মৃত্যু: চেয়ে দেখো। খুব কি অচেনা লাগে? বহুবার
দেখা
হয়েছে তোমার সঙ্গে

ঋষি: তুমি সেই? খরা মাঠে বিমানের ছায়ার মতন
চকিতে মিলিয়ে যাও

মৃত্যু: বারবার ফিরে আসি

ঋষি: আমাকে না দেখে বুঝি মন কাঁদে? এমন প্রণয়?
আপাতত বাইরে যাও

মৃত্যু: আমি এই শিশুটির অনন্তকালের ধাত্রী
আমি তমসার মধ্য দিয়ে ওর হাত ধরে
নিয়ে যাব

ঋষি: তুমি এই ছেলেটিকে জননীর কোল থেকে ছিঁড়ে
নিয়ে যেতে চাও

মৃত্যু: আমি এই শিশুটিকে কালের সীমানা ভেঙে শুধু

অসীমে পাঠাব

ঋষি: ওর মা'র স্নেহ, আর আমার বুকের ভালোবাসা
তাও কি অসীম নয়? পৃথিবীর এই মায়াপাশ
যদি ছিন্ন করো বারবার, তবে কেন তা বেছাও?

মৃত্যু: ঋষি, তুমি দেখেছ অনেক মৃত্যু, শুভ ও অশুভ
তবু কেন অস্থিরতা? সব মিথ্যে, আমি শুধু ধ্রুব

ঋষি: তুমি অহংকারী, তবু তোমার দু'চোখে
কেন জল? তোমার কি চক্ষুরোগ?

মৃত্যু: আমার হৃদয় নেই, তবু আমি দুঃখী।
আমি একা।
আমার আকাঙ্ক্ষা নেই, তবু আমি নিত্য ভ্রাম্যমাণা,
অনধিকারিণী আমি, অথচ আমিই হাত পাতি

বাবলু: বাবা, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ?

ঋষি: কেউ না, বাবলু সোনা! নিছক মনের ভুল,
ছায়া।

বাবলু: বাবা, তুমি সব ব্যথা শেষ করে দাও

ঋষি: এই তো এক্ষুনি দিচ্ছি, দেখি ডান হাত

মৃত্যু: ঋষি, থামো

ঋষি: আঃ, বিরক্ত কোরো না, যাও!

মৃত্যু: ঋষি, তুমি হেরে যাবে

ঋষি: যাই যাব। তবু আমি কোনও দিন না লড়ে
ছাড়িনি
তুমি নয়, মৃত্যু নয়, জীবনের কাছে আমি ঋণী!
তুমি নারী, তুমি সরো, যমরূপী পুরুষ পাঠাও
যার সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, তুমি যাও!

মৃত্যু: শোনো ঋষি, কেন এই চঞ্চলতা, এখনও দু'মাস
দিতে পারি ওর আয়ু, এখনও রয়েছে ওর শ্বাস
কেন তা থামাবে তুমি? এই পৃথিবীর রূপ রস
আরও কিছুদিন ওর প্রাপ্য, ওর নবীন বয়স
দ্বিগুণ শক্তিতে সব নিতে পারে, ততটুকু নিক

আমি ওকে স্নেহ দিয়ে ঘিরে রাখব জননী অধিক!

ঋষি: কে চায় তোমার কৃপা? আমি আছি প্রাণের প্রহরী।
শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে লড়ে যাই, মুষ্টি মধ্যে ভ্রমরকে ধরি।
এই যে তরল বিষ, এর মধ্যে অর্ধেক জীবন,
অথবা অর্ধেক মৃত্যু, দেখি আমি এর মধ্যে কোন
অর্ধাংশটি জিতে যায়, আমি আছি জীবনের দিকে
—তোমার সন্তান নেই, রাক্ষসিনী, তাই তুমি এই শিশুটিকে
নিয়ে জয়ী হতে চাও?
রাক্ষসিনী, রাক্ষসিনী!

মৃত্যু: ঋষি, শান্ত হও

বাবলু: বাবা, বড় ব্যথা, তুমি ব্যথা শেষ করে দাও

ঋষি: দেব রে, বাবলু সোনা, দেখি ডান হাত

মৃত্যু: ঋষি, শোনো

ঋষি: চুপ!

[ঋষি ইঞ্জেকশানের সুচ ছুরির ভঙ্গিতে ঢুকিয়ে দিলেন বাবলুর হাতে। বাবলু দু'বার বাবা বলে ডেকেই থেমে গেল হঠাৎ। তার গলায় সেতারের তার ছেঁড়ার মতন শেষ শব্দ হল। ঋষি সে দিকে একটুক্ষণ চুপ করে চেয়ে থেকে সিরিঞ্জটা ছুড়ে ফেলে দিলেন।]

মৃত্যু: ঋষি, তুমি হেরে গেলে

ঋষি: (শান্ত ভাবে) জানি। ওর ব্যথা শেষ হয়ে
গেছে

মৃত্যু: আগেই বলেছি হেরে যাবে

ঋষি: খেলতে এসেছি তাই আমি জানি খেলার নিয়ম,
হারজিত আছে। শুধু তুমি আর তোমাদের যম
কখনও হারো না, শুধু জয় নিয়ে দারুণ উল্লাস।
এবার তো সুখী হলে? নিয়ে যাও শিশুটির লাশ।
আমার প্রাণের টুকরো এই শিশু

মৃত্যু: সুখী নই, সুখী নই

যতবার জিতে যাই, ততবার মনে মনে হারি
অনন্ত কালের মধ্যে
আমি এক সুখশূন্য নারী।
এই হাত দুঃখ দিয়ে গড়া, চোখ দুঃখের সমাধি
এসো ঋষি, তুমি আমি দু'জনেই একসঙ্গে কাঁদি।

ঋষি: তোমার চোখের জল, প্রতিটি বিন্দুই মৃত্যু বিষ
তুমি যাও, আমার সন্তানটিকে নিয়ে যাও
কিন্তু আমি হেরে যাইনি, এর পরও প্রতি অহর্নিশ
লড়ে যাবে
আমার বাবলুর মতো আরও শত সহস্রকে নিশ্চিত বাঁচাব
কখনও তোমার সঙ্গে আমার লড়াই থামবে না

মৃত্যু: তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী নই আমি, আমি আসি কালের নিয়মে
সমস্ত সংগীত এসে থামে এক সমে
গাছের পাতারা ঝরে যায়
সকালের ফুলগুলি সন্ধেবেলা সুষমা হারায়

ঋষি: এই সব ছেঁদো কথা, বস্তা পচা সান্ত্বনার ভাষা
শুনলে মাথায় রক্ত জ্বলে ওঠে, যাও, যাও
নাকি আমাকেও সঙ্গে নিতে চাও?
দেব গলা টিপে?

মৃত্যু: ছুঁয়ো না, আমাকে ছুঁতে নেই
বিশুদ্ধ কুমারী আমি, কোনও জীবিতের স্পর্শ
এই ভাগ্যে নেই
আমার একমাত্র সুখ পরাজয়ে

[হঠাৎ যেন বাবলু ঘুম থেকে জেগে উঠে বাবা, বাবা বলে ডাকে]

ঋষি: বাবলু, বাবলু, তুই ফিরে এসেছিস?

বাবলু: বাবা, সব ব্যথা সেরে গেছে

ঋষি: আঃ আঃ, এ কী স্বপ্ন, নাকি সত্যি?

মৃত্যু: ঋষি, তুমি বীর যোদ্ধা, হাতে তলোয়ার

গর্ব দৃপ্ত মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ, এই দৃশ্যে
কী যে সুখ, কত সুখ হল যে আমার...

ঋষি: অর্ধেক মৃত্যুর ঝুঁকি, অর্ধেক জীবন
আমি জীবনের দিকে, আমি জেদি জীবনের দিকে!

এর পর ঋষি ও মৃত্যু দু'জনে বাবলুর দু'পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

[এই কাব্যনাটকটি কেউ অভিনয় করতে চাইলে আগে লেখকের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। অভিনয়ের সময় লাইনগুলি কবিতার মতন নয়, গদ্যের মতন স্বাভাবিক ভাবে উচ্চারণ করা যেতে পারে।]

মালঞ্চমালা

এক দেশে এক রাজা ছিলেন।

রাজার ভাণ্ডার ভরা মণি-মাণিক্য, হাতিশালে কত হাতি, ঘোড়াশালে কত ঘোড়া, রাজ্যে নেই চুরি-ডাকাতি, তবু রাজার মনে বড় দুঃখ। তাঁর কোনো সন্তান নেই।

কত সাধু-সন্ন্যাসী, কত যোগী আর জ্যোতিষীর কাছে পরামর্শ নিলেন রাজা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। শেষ পর্যন্ত রাজা ঠিক করলেন, রাজ্যপাট ছেড়ে রানীকে নিয়ে বনে চলে যাবেন। রানীও মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে রাজি হয়ে গেলেন। সব ঠিক ঠাক। সেই রাত্রে রাজা আর রানী সোনার পালঙ্কে পাশাপাশি শুয়ে আছেন, চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। শেষ রাতে যেই একটু ঘুম এসেছে অমনি স্বপ্নের মধ্যে দু'জনেই শুনতে পেলেন দৈববাণী:

(কালপুরুষের গান)

শোনো শোনো মহারাজ, শোনো মহারানী
এখনি যেওনা ছেড়ে এই রাজধানী
ভাবেন দেখি মনে মনে কী করেছ পাপ
পাপের খণ্ডন হলে যাবে অভিশাপ
কারে বা দিয়ছ দুখ কারে দিলে ছাই
কারাগারে কারা আছে, ভেবে দ্যাখো তাই
হাতে বেড়ি পায়ে বেড়ি তবু করে গান
কে আছে এমন তার করহ সন্ধান।

যেই না গান শেষ হল, অমনি রাজা জেগে উঠে বললেন, কী শুনলাম, কী শুনলাম। রানী, ওঠো ওঠো।

রানীও সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে বললেন, কী শুনলাম, কী শুনলাম। রাজা, আপনি কী পাপ করেছেন?

রাজা: রানী তুমি কী পাপ করেছ?

রানী: কিছু তো পাপ করিনি আমি কিছু তো পাপ করিনি। এমনকী এই জীবনে একটা পিঁপড়ে অবধি মারিনি। না, না, ভুল বলেছি, একবার একটা পিঁপড়েকে জলে ছেড়ে দিয়েছিলুম।

রাজা: ছি, ছি, ছি, রানী, তুমি একটা পিঁপড়েকে জলে ছেড়ে দিয়েছিলে? খুব অন্যায়, ভারী অন্যায়! আজ থেকে এই রাজ্যে আর কেউ পিঁপড়ে মারবে না।

রানী: মহারাজ, আপনি কোনো পাপ করেননি?

রাজা: উঁহুঃ!
যদিও আমি লোক মেরেছি বহু
কিন্তু সে তো যুদ্ধ
যুদ্ধে তুমি যা করো তা সমস্তটাই শুদ্ধ।
তবে
সত্যি কথা আজ বলতেই হবে
দোষ করেছি একটা
কালো হাঁড়িতে ঘষে দিয়েছি হুলো বেড়ালের নাকটা।

রানী: ছি, ছি, ছি, রাজা, আপনি বেড়ালের নাক ঘষে দিয়েছেন? সে যে অন্যায়, ভারী অন্যায়। আজ থেকে বেড়ালের নাক ঘষা নিষিদ্ধ।

রাজা: রানী, তুমি আর কী দোষ করেছ?

রানী: মহারাজ, আর তো কিছু না। আপনি আর কী দোষ করেছেন?

রাজা: আর কিছু না। আর কিছু না।
রাজা চেঁচিয়ে ডাকলেন, মন্ত্রী। মন্ত্রী।
মন্ত্রী তক্ষুনি হাজির।

মন্ত্রী: দণ্ডবৎ হই মহারাজ। এত রাতে ডেকেছেন, আজ আমার কী সৌভাগ্য।

রাজা: মন্ত্রী, কহ দেখি মন খুলে
কখনো মনের ভুলে
আমি কি করেছি কোনো পাপ?

মন্ত্রী: এ কী কথা শুনি আজ

পাপ করবেন মহারাজ
এ যে কানে শোনাও মহাপাপ অতি
সে জন্য তো আমরা আছি তৈয়ার
আদেশ পেলেই মাথা কাটি যার তার
মহারাজ তো সবাকার অগতির গতি।

রাজা: বলো দেখি সত্য করে
কারাগারে আছে ক'জনা?

মন্ত্রী: কেহ নাই মহারাজ
প্রজারা সবাই করে আপনার ভজনা।

রাজা: হাতে পায়ে বেড়ি তবু কে বা করে গান?

মন্ত্রী (চিন্তিত) বন্দিদশায় গায় গান কার এমন শখের প্রাণ?
ওঃ হো মহারাজ, মনে পড়েছে। এ সেই কোটাল ব্যাটা।
সাত বছর আগে তাকে আপনি কারাগারে পাঠালেন দিয়ে হ্যাটা।

রাজা: নগর রেখে শুনশান
কোটাল কেন গায় গান।
বাড়ি তাহার নদীর ধারে
যাবে কেন সে কারাগারে?

মন্ত্রী: ভুলেই গেছেন মহারাজ
কোটাল অতি জাঁহাবাজ
জলের ওপর দিয়ে হাঁটে
মুখের ওপর কথা কাটে।
সেই জন্য আপনি একদিন রাগ করে
তাকে ভরে দিলেন জেলখানায়।

রাজা: তাই নাকি, চলো তো দেখে আসি কোটালকে।

(কোটালের গান)

লোহা ঝনঝন বেড়ি ঝন ঝন
শীতে কনকন খিদে চনচন

মাছি ভনভন ব্যথা টনটন
গলা খনখন মাথা বনবন
হাওয়া শনশন রোদ গনগন
বাজে ঠনঠন কাজে ঢনঢন
হাঁটে হনহন...
দূর ছাই আর মনে পড়ছে না।

মন্ত্রী: ও কোটাল, কে এসেছেন, দ্যাখো মেলে চোখ।
কোটাল: ওরে বাবা, এ যে মহারাজ, জয় হোক জয় হোক।
এ যেন রাতের বেলা সূর্য, আমার জীবন ধন্য।
আদেশ করুন প্রভু এবার কী শাস্তি দেবেন অন্য!
রাজা: আজ থেকে তুমি মুক্ত হলে
আমি জ্বলেছি অনেক অনুতাপ অনলে।
যাও, বাড়ি চলে যাও
খাও দাও, প্রাণের আনন্দে গান গাও।
তবে একটি অনুরোধ শোনো
মুখের ওপরে কথা আর যেন বোলো না কখনো
কোটাল: কক্ষনো না কক্ষনো না।
আজ থেকে আর পায়ের ওপরেও কথা কবো না।

কথক: পরদিন রাতে আবার রাজা আর রানী
একই স্বপ্নে শুনলেন দৈববাণী।

(কালপুরুষের গান)

শোনো শোনো মহারানী, শোনো মহারাজ
কেমনে লভিবে পুত্র তা বলিব আজ
তিন দিন তিন রাত্রি থাকো উপবাসে
চতুর্থ প্রভাতে যেও মালঞ্চের পাশে
মালঞ্চে যুগল আম সোনার বরণ

সেই দুটি ফলে রাজা করিও পারণ।
পাকা ফল রানী খাবে, কাঁচা ফল রাজা
ভুল যদি করো তবে, পাবে ফের সাজা।

কথক: শুনে সেই দৈববাণী
আনন্দে আটখানা হলেন রাজা আর রানী।
উপবাসে কেটে গেল তিনটি দিন রাত
অবশেষে এল সেই আনন্দ প্রভাত।
ব্যাকুল হৃদয়ে রাজা ছুটলেন মালঞ্চের পানে।
সঙ্গে এল পাত্র মিত্র যে ছিল যেখানে।
সেই মালঞ্চে কচি পাতার নীচে এক বোঁটায় দুটি আম
ফলে আছে। একটি পাকা সোনার বরণ, অন্যটি কাঁচা।
রাজা ছুড়লেন তির
চতুর্দিকে সে কি ভিড়
তবু আম তো পড়ে না।
একটি নয় দুটি নয়
তির ছুড়লেন শয়ে শয়
তবু আম তো পড়ে না।

রাজা হুকুম দিলেন: যে পারো আম পাড়ো। তবে এক বোঁটায় একসঙ্গে দুটি থাকা চাই। নইলে রক্ষা নাই।

কথক: পাত্র মিত্র মন্ত্রী সেনাপতিরা অতি উৎসাহে আম পাড়তে গেলেন। কারুর ধনুকের ছিলা ছিঁড়ে গেল, কেউ গাছে উঠতে গিয়ে হাত পা ভাঙল, তবু আম পড়ে না। ভিড়ের এক কোণে লুকিয়ে ছিল সেই রোগা লিকলিকে কোটাল। সে এবারে সামনে এসে বলল,

কোটাল: যদি অনুমতি পাই,
আম দুটিরে নীচে নামাই।

পাত্রমিত্ররা সবাই হে হে করে হেসে উঠল। একজন বলল,

হাতি ঘোড়া গেল তল
ফড়িং বলে কত জল
কত এল জ্ঞানী গুণী
এল এবার হাত-বাঁধুনী।

রাজা বললেন: দেখো কোটাল
না পারো তো শূল, পারো তো শাল।

কোটাল: মারি তো গণ্ডার
লুটি তো ভাণ্ডার
কাদায় পড়লে হাতি
ব্যাঙেও মারে লাথি।

কথক: মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ছোট্ট একটি পাথর
কোটাল এমন মন্ত্র পড়ে সবাই ভয়ে কাতর

কোটালের মন্ত্র: ক্রিং ঘ্রিং হ্রি ত্রিং
ছক্কা না ফক্কা
কথাটি কেউ কইলেই
অমনি পাবে অক্কা।

কোটাল ঢিল ছুড়তেই ঝুপ করে আম দুটি পড়ল রাজার পায়ের কাছে। সবার মাথা হেঁট।

রাজা গা থেকে নিজের শালখানা যেই কোটালকে দিতে গেলেন, অমনি মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, কোটালের শেষ কথাটার অর্থ কী?

রাজা বললেন: তাই তো, তাই তো, কী যেন বলেছে। কোটাল বলো তো আবার।

কোটাল: কাদায় পড়লে হাতি
ব্যাঙেও মারে লাথি

রাজা: অ্যাঁ? ফের আমার মুখে মুখে কথা কও?
মন্ত্রী এই দুর্বিনীত কোটালকে জেলখানায় ভরে দাও।

তারপর রাজা একাই ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন রাজপুরীর দিকে। যেতে যেতে

হাতের আম দুটি একবার দেখেন, একবার রাখেন। একবার দেখেন, একবার রাখেন। দেখে দেখে আর আশ মেটে না। শেষ পর্যন্ত রাজা আর লোভ সামলাতে পারলেন না, টপ করে খেয়ে ফেললেন একটি আম। মনের ভুলে রাজা খেলেন পাকা আমটি আর কাঁচাটি দিলেন রানীকে।

রাজার ঘোড়ার শব্দ শুনেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন রানী। রাজা বললেন, রানী, রানী, এই দেখো এনেছি সেই পরমাশ্চর্য ফল!

কথক: দশ মাস দশ দিন পরে
জন্ম নিল রাজার ঘরে
অপরূপ সুরূপ রাজকুমার।
শত চাঁদ হার মেনে যায়
সারা অঙ্গে অমৃত গড়ায়
এমনটি দেখেনি কেউ আর।

রাজ্য জুড়ে ধুমধাম, নাচ গান অবিরাম, কত ফুর্তি কত মজা, দান ধ্যান করলেন রাজা, রানী দিলেন ষোড়শ উপাচার, প্রজাদের আনন্দ অপার।

তার পর এল ছয় ষষ্ঠীর রাত।

কথক: আঁতুড় ঘর আলো করে আছেন রাজকুমার
সেপাই মন্ত্রী পাহারা দেয় ঘিরে চারি ধার
আসবেন আজ কালপুরুষ দেবেন তিনি ললাটের লিখন
একবার যা লেখা হবে আর তা না হবে খণ্ডন
ফুলের মালা, সোনার ঝালর, জ্বলে ঘিয়ের বাতি
মা মাসি আর দাস-দাসীরা জেগে পোহাবেন রাতি।

(মহিলাদের কথাবার্তা)

রাত হল নিঝুম
সবার চোখে ভেসে এল সহসা কাল ঘুম।

(সেপাই শান্ত্রীদের নাক ডাকার আওয়াজ)

তিনটি প্রহর পেরিয়ে গেল, এল কালপুরুষ
দেখল না কেউ তারে সেথায় কারুর নেই হুঁস।
কালপুরুষ: সোনার বরণ রাজকুমার হীরের টুকরো মন
হাতে পতাকা, পায়ে পদ্ম অতি সুলক্ষণ
যা দেবার তা সবই আছে নতুন কি বা লিখি?

(হঠাৎ কালপুরুষ চমকিয়ে)

এ কি।
না, না, না, না, হায় হায় আমি এক্ষুনি চলে যাই
যা দেখলাম তারপর আর লেখার কিছু নাই।

সেই ঘরের দ্বারের কাছে শুয়ে ছিল মালিনী মাসি। কালপুরুষ তাকে ডিঙিয়ে যেতেই পায়ের ছোঁয়া লেগে গেল। অমনি জেগে উঠে সে পা চেপে ধরল কালপুরুষের।

মালিনী: রাজার দুলাল নয়নমণি ঘুমে আছে সে
দুয়ারে শোয় মালিনী মাসি তারে ডিঙায় কে?
কে তুমি কও সত্য করে দস্যু কি দানব
কি বা অভিসন্ধি তব, দেব কি মানব?
কালপুরুষ: ওরে মালিনী, পা ছাড়, আমি কালপুরুষ
মালিনী: রাজার দুলাল, নয়নমণি, রাঙা চাঁদের কণা
কী লিখিলে না কহিলে পা ছাড়ব না
কালপুরুষ: ওরে ছাড় ছাড়
মালিনী: কী লিখিলে না কহিলে ছাড়বই না আর
কালপুরুষ: নাছোড়বান্দা, জানাই শুধু তোরে
দ্বাদশ দিন পরেই কুমার যাবে যমের দোরে
ফল করেছে অদল বদল
পাকা ফলটি নিজে খেয়েছে রাজা
সেই ভুলে তার এমন হল সাজা।

নিজের দোষে সুখের আশা করল রাজা ছারখার
মালিনী তুই আমার পা ছাড়।

মালিনী: বারো দিন? হায় হায় হায় হায়

সকলে জেগে উঠে কী হল কী হল বলতে লাগলেন। তারপর একটা কান্নার রোল পড়ে গেল। রানী মূর্ছা গেলেন।

রাজা: করেছি ভুল, করেছি পাপ
শাস্তি নেব তার
চাই না এই রাজ্যপাট চাই না কিছু আর
কত আশায় পূর্ণ চাঁদ
এনেছিলাম ঘরে
রাহুতে গ্রাস করবে তারে
বারো দিনের পরে।
হায় নিয়তি এমন ক্ষুধা
শিশুরে নেবে কেড়ে
দেখব না সেই দৃশ্য আমি
পৃথিবী যাব ছেড়ে।

কথক: মালঞ্চের পাশে রাজা ভূমিতে শয়ান
যদি না কুমার বাঁচে ত্যজিবেন প্রাণ
পাত্র মিত্র সবাই কাঁদে কেহ নাই বাকি
রাজার দুঃখে কেঁদে ওঠে বনের পশু পাখি
তাই দেখে কালপুরুষের দয়া হল মনে
ব্রাহ্মণের বেশে তিনি এলেন সেই বনে।

রাজা: কে আপনি দিব্য কান্তি জ্যোতির্ময় প্রভু?
মোর রাজ্যে আপনারে দেখি নাই কভু।

কালপুরুষ: আমি অত সাধারণ ব্রাহ্মণ
যেথা সেথা ঘুরি ফিরি যখন যেদিকে চায় প্রাণ মন।

রাজা: গ্রহ তারা আছে যেন তব দেহে মিশি
অন্ধকার দূর হল এল শুক্লা নিশি

সহসা পেলাম দেখা কোন পুণ্যবলে
নিরাশায় আশা যেন শান্তি শোকানলে।
ধন রত্ন সব দেব, যত খুশি চান
আঁতুড়ে কুমার মরে, তাহারে বাঁচান!

কালপুরুষ: পূর্ণচাঁদ রাহুতে খায়, সূর্যে গ্রহণ হয়
বিধাতার বিধান রাজা, মিথ্যে হবার নয়।

রাজা: তা হলে দেখুন প্রভু, এই তলোয়ার
এখনি বসাব বুকে নিজ প্রাণ রাখিব না আর।

কালপুরুষ: আরে আরে, করো কি করো কি
উপায় আছে কি কিছু দেখি।
যদি পাও সুলক্ষণা কন্যা এক দ্বাদশ বর্ষীয়া
রাজকুমারের সাথে দাও তার বিয়া
আঁতুড়ে বিবাহ হলে পুত্র রক্ষা পাবে
বধূ এসে সেবা যত্নে স্বামীরে বাঁচাবে।

কথক: যাবার আগে কালপুরুষ নিলেন একটি হীরে
আকাশ পথে যেতে যেতে সেই হীরেটি ছুড়ে দিলেন
নদীর অন্য তীরে।

(ঢাক ঢোলের শব্দ)

কথক: মহানন্দে রাজা ফিরলেন নগরে
ধ্বনি উঠল ঢাক-ঢোল-কারা-নগরে
চতুর্দিকে ছুটল রাজার চর
বারো বছরের কন্যা আছে কাহার ঘর
সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে কত রাজ্যে
দূতেরা সব ঘুরে বেড়ায় এই জরুরি কার্যে
কিন্তু হায়, কোথাও নেই বারো বছরের কন্যা
যাঁদের ঘরে আছে তাঁরাও বিবাহ দিতে চান না
বারো বছরের মেয়ের সাথে আঁতুড় ঘরের ছেলের হবে বিয়ে

যারাই শোনে, তারাই হাসে ঠোঁট মুখ বেঁকিয়ে!
তা হলে কী উপায়?
রাজা-রানী-পাত্র মিত্র সবাই করেন হায় হায়
এদিকে দিন যায়
রাজকুমারের আয়ু মোটে আর একটি মাত্র দিন
শ্বাসপ্রশ্বাস হয়ে এসেছে ক্ষীণ

(মালঞ্চমালার গান)

মালঞ্চমালা: আকাশ থেকে খসে পড়ল হীরে
বিকেলবেলা বিজন নদীর তীরে
ও চাঁপা গাছ, ও শেফালি, বলতো তোরা বল
এই হীরেটি কোন্ দেবতার এক বিন্দু চোখের জল?

কথক: শুনে সেই গান
সহসা আকুল হল রাজার পরাণ
নদী তীরে যান ছুটে উথাল পাথাল
আশার তরঙ্গ হয় হৃদয়ে উত্তাল
সেখানে—
খাটের পৈঠায় আছে বসি
সোনার প্রতিমা এক যেন স্বর্ণশশী
পায়ের নূপুরে তার ভ্রমর গুঞ্জন
গান শুনে মনে হয় কোকিল কূজন
তখন—

রাজা: ওকে? ওকে? মন্ত্রী, বলো, ওকে?
দেবী না মানবী, নাকি ভ্রম দেখি চোখে?
মন্ত্রী: মহারাজ
মনে হয় এল বড় শুভদিন আজ
ওই সুলক্ষণা কন্যা, কোটালের বালা

দ্বাদশবর্ষীয়া মাত্র রূপ-গুণের ডালা!

রাজা: অ্যাঁ? সেই কোটালের কন্যা?
না না, না, না, চাই না ওকে চাই না।

মন্ত্রী: মহারাজ, সময় তো আর নেই মোটে
মন ঠিক করে নিন নিদারুণ এমন সংকটে।

রাজা: তবে যাও
কোটালকে কারাগার হতে দ্রুত মুক্ত করে দাও
কী করি যে নিরুপায়, নিয়তিকে ধিক
ফাজিল কোটাল হবে মম বৈবাহিক!

মন্ত্রী: (কারাগারে এসে) কোটাল ভায়া কোটাল ভায়া,
বেঁচে আছ কি
এবার তোমার জন্য জবর খবর এনেছি।

কোটাল: বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি
জেল খানাতে বেশ তো আছি
আসল কথাটি বলো তো খুলে
এবার বুঝি চাপাবে শূলে?

মন্ত্রী: সময় নাই তাই সংক্ষেপে জানাই
রাজার ছেলে হবে তোমার জামাই
হাত পায়ের বেড়ি খুললাম, শীঘ্র বাড়ি যাও
আঁতুড় ঘরে বাসর হবে, কন্যারে সাজাও!

কোটাল: হে— হে— হে— হে— হে!
শোনো শোনো পাড়া পড়শি কে কোথায় আছ কে হে!
মন্ত্র পড়ে ঢিল ছুড়লাম ফল পাড়লাম আমি
তাই আজ কন্যার আমার রাজপুত্র স্বামী
রাজার বেহাই হতে চল্লাম, নজর-খাজনা দে
হে— হে— হে— হে— হে— হে!
কোটালনী, দ্বার খোল, ও কোটালনী
তোমার কন্যা হবে যে আজ রাজবাড়ির ঘরনী

কোটালনী: না, না, না, না
দেব না আমি কন্যা

স্বামী রইলেন কারাগারে আমরা কুঁড়ে ঘরে
কেউ খবরও নিত না এক নজরে
ছেলের আয়ু বারো দিন মোটে
দেব না কন্যা যদি ভাতও না জোটে!

মালঞ্চমালা: মাগো তুমি বারণ কোরো না, আমি যেতে চাই
আমার কারণে যদি কেহ পায় প্রাণ, তার চেয়ে বড় কিছু নাই!

কোটালনী: দুখিনীর ধন তুই, ওরে তোরে কী করে ছাড়ি
যমের দুয়ার ও যে, নয় রাজবাড়ি!

মালঞ্চমালা: কী করেছি পাপ যমেরে শুধাব আমি
কেন হরিবেন আমার জীবন স্বামী;
বাবা তুমি যাও, রাজারে শুধাও আগে
দাবি আছে কিছু যদি তার মনে লাগে
বাসর শয়নে আমি যাব চলে আজই
তিনটি শর্তে যদি তিনি হন রাজি

কোটাল: কী কী তিনটি শর্ত আছে বলতো শুনি মা তোর
আঙুল তুলে নাচাই যদি তাও নাচবেন রাজা এমন কাতর

মালঞ্চমালা: হোক না রাজার কুমার তবু আমার স্বামী কোটাল ঘরের জামাই
বিয়ের পরে একটি দিন এই কুটিরে আসা চাই
আমার হাতের রাঁধা অন্ন রাজা রানী খেতে চাইবেন কিনা
বাসর ঘরে যা চাইব মেনে নেবেন কোনো প্রশ্ন বিনা

কোটাল: ঠিক ঠিক বলেছিস, তিনটি কথাই অতি ন্যায্য
না যদি মানেন রাজা উৎসন্নে যাবে তাঁর রাজ্য

(রাজসভায় কোটাল)

কোটাল: মহারাজঃ
রাজার রাজা মোহন রাজা
এক বংশী হাজা এক বংশী বাজা
আজ হলেও বেহাই কাল হলেও বেহাই
শর্তে আছে তিন তিনটি নইলে কোনো কথা নাই

প্রথম শর্তটি হল...

রাজা: কী এতবড় বেল্লিক নচ্ছার
শর্ত শোনাতে চায় আমাকে;
হবে রাজার বেহাই শুনে মাথা ঠিক নাই
কে কোথায় আছিস রে বাঁধ একে;
মন্ত্রী, কোটালকে ছুড়ে ফেলো গর্তে
মরুক সে বে-আদপি শর্তে
শূন্যে উড়িয়ে আনো মেয়েটিকে ওর
এখনি বিবাহ হবে না ফুরাতে এই নিশি ভোর

কথক: না হল গায় হলুদ, না বাজল সানাই
কেমন এ বিবাহ কন্যাপক্ষ নাই
নেই ফুল মালা আতর গন্ধ
নিঝুম রাজপুরী অতি নিরানন্দ
পুরুত মন্ত্র পড়ে ওম নমো নমো
বর শুয়ে কাঁদে ওঙা, ওঙা, ওঙা
ঘুরল সাত পাক শিশু স্বামী বক্ষে
নতুন বধূটির জল নেই চক্ষে
এসে বাসরঘরে যেই খিল দিল
প্রলয়ের ঝঞ্ঝা এসে আকাশ ছাইল
সে কি মেঘ বৃষ্টি আগুন লেলিহান
প্রাসাদ-কুটির ভেঙে খান খান
ওঠে চতুর্দিকে দারুণ হাহাকার
সৃষ্টি বুঝি যায় সব ছারখার
মূর্ছা যান রানী দৌড়ে আসেন রাজা
সভয়ে ব্যাকুল যত ছিল প্রজা
বধূ না এ ডাইনি খেল বুঝি সব
এদিকে রাজপুত্র নিথর নীরব।

রাজা বাসরঘরে এসে দেখলেন মরা স্বামী কোলে নিয়ে চুপ করে বসে আছেন মালঞ্চমালা!

রাজা: ডাইনি ডাইনি,
দূর হয়ে যা সর্বনাশিনী!

মালঞ্চমালা: শর্ত মেনেছেন মহারাজ
বাসরঘরেতে আমি যা চাইব সকলি দেবেন আজ
আমি শুধু এইটুকু চাই
স্বামীকে বুকে নিয়ে বাড়ি চলে যাই!

রাজা: কী, এমন সাহস রাক্ষসীর
এখনও যে উচ্চে তোলা শির!
আমার পুত্রের প্রাণ খেয়েছিস
রাজপুরী, দেউল, প্রাকার ভেঙেছিস
আর তোর নাহিক নিস্তার
ওরে কে আছিস, জ্বলন্ত চিতায় এই ডাইনিকে
এখনই পুড়িয়ে তোরা মার।

॥ দুই ॥

বজ্রের গর্জন আর প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। একদল লোকের কোলাহল।

কথক: এত ঝড় এত বৃষ্টি। তবু জ্বলে চিতা
জীবন্ত পুড়িবে আজ কোটালদুহিতা

(আবার প্রচণ্ড শব্দ)

কথক: গুরু গুরু ওঠে রব, মাটি কেঁপে ওঠে
হুড়মুড় গাছ পড়ে, নদী জল ছোটে
শুরু হল ভূমিকম্প কে কোথা পালায়
তখন মালঞ্চমালা চিতা ছেড়ে যায়
প্রাণপণে দিল দৌড় ঘন অন্ধকারে
পহুঁছিল শেষে এক বনের মাঝারে

বিরাট এক বন সেইখানে স্বামী কোলে নিয়ে বসে রইল মালঞ্চমালা।

(ভূতপ্রেতদের শব্দ)

এক পেত্নি: চাকুম চাকুম চাকুম লো
মানুষের গন্ধ পাইলো।
এক ভূত: ঐ যে দেখি একটা খুকি
বাচ্চা-কোলে কাঁদে।
পেত্নি: চাকুম চাকুম চাকুম চাকুম
পড়েছে বেশ ফাঁদে
ওরে কে তুই ওরে কে তুই
মালঞ্চমালা: ছিলাম কোটাল কন্যা মালঞ্চমালা আমি
কপালের লিখনে পেলাম রাজপুত্র স্বামী।
ভূত: রাজপুত্তুরের মাংস, আহা, তার তুলনা নাই
পেত্নি: দে দে দে, আগে খোকাটারে খাই!
মালঞ্চমালা: যদি বা কিছু পুণ্য করে থাকি
না করে থাকি পাপ
তা হলে কেউ ছুঁয়ো না এসে আমাকে
দেব যে অভিশাপ
ভূত ও পেত্নি: ওরে বাপরে!
এ যে অভিশাপের ভয় দেখায়!
পেত্নি: ও মালঞ্চমালা, তোর পতি ঘুমে না যমে?
মালঞ্চ: ঘুমে!
ভূত: বলে কি! চোখ উলটে পড়ে আছে ও খোকা তো আমাদের!
পেত্নি: ও মালঞ্চ, ভালো করে দ্যাখ,
তোর পতি ঘুমে না যমে!
মালঞ্চ: ঘুমে!
ভূত: বলে কি! দে দে আগে ওর হাড় মাংস খাই
তারপর ওকে খোকা ভূত বানাই!
পেত্নি: আমাদের একটাও ছানা নাই!

(দূরে দু'জন পুরুষের গলার শব্দ)

পেত্নি: মালঞ্চ লো, বসে আছিস না?
মালঞ্চ: হ্যাঁ।
পেত্নি: পতি দিয়ে কী করবি মরা পতিটা দে না
মালঞ্চ: না

কথক: গন্ধ পেয়ে আসে ধেয়ে আরও কত ভূত
তারই মধ্যে এল ছুটে দুই যমদূত
১নং যমদূত: হঠো হঠো সব তফাত যাও
আমাদের জিনিস আমাদের নিতে দাও

(ভূতেরা গোলমাল করতে করতে পিছিয়ে যায়)

মালঞ্চ: কে তোমরা?
২য় যমদূত: আমরা কালদূত আর শালদূত!
১নং যমদূত: মালঞ্চ, যমের আজ্ঞা, স্বামী ছাড়ো!
মালঞ্চ: নাও দেখি কেড়ে কী করে পারো!
যদি বা কিছু পুণ্য করে থাকি
না করে থাকি পাপ
তা হলে কেউ ছুঁয়ো না এসে আমাকে
দেব যে অভিশাপ!
১নং যমদূত: হে— হে— হে— হে— হে— হে
অভিশাপের ভয় দেখায় এই মেয়েটা কে হে?
দে মরা স্বামী দে!
মালঞ্চ: পাই নাকো ভয় তোমাদের এই ধমকে
ডেকে নিয়ে এসো তোমাদের রাজা যমকে
২য় যমদূত: ওরে দাদা,
আমরা ছাপোষা প্রাণী নিতান্তই যমের পেয়াদা।
যদি অভিশাপ দিয়ে বসে, এসব ঝঞ্ঝাটে নেই কাজ

সদরে জানাই গিয়ে সব, যা বোঝার বুঝবেন যমরাজ!

(তারপর শন শন করে বাতাস বইতে থাকে, গাছপালা নিচু হয়ে আসে। ফিস ফিস করে শব্দ শোনা যায়: ও মালঞ্চ, মালঞ্চ লো, মরা পতিকে ছাড়, দ্যাখনা পচে উঠেছে, ফুলে উঠেছে, দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে, ওকে ছুড়ে ফেলে দে, তোকে সোনা দেব হীরে দেব, ভালো ভালো জামাকাপড় পাবি, আহার বিহার সুখ পাবি)

মালঞ্চ: না, না, না!

দূরে নূপুরের ঝুমঝুম শব্দ। ক্রমে শব্দ কাছে এগিয়ে এল। খুব মিষ্টি গলায় একটা মেয়ে কথা বলে উঠল:

মেয়েটি: কে এখানে, মালঞ্চ নাকি লা? তাই বলি
তোতে আমাতে ছোট বেলা থেকে কত গলাগলি
তা বোন, ওটা কি দেখছি পড়ে আছে তোর কোলের কাছে
ওমা ও যে বাসি মড়া! ফেলে দে ফেলে দে, ও নিয়ে কি খেলতে আছে?
মালঞ্চ: কে রে এল গত জনমের বোন, আগে তো কখনো দেখিনি।
পতিকে ছাড়তে বলিস রে তুই কোন প্রেতিনী বা ডাকিনী?
দূর হয়ে যা! দূর হয়ে যা!
মেয়েটি: আহা, তোর পতি; মাগো তা বুঝিনি,
রাগ করিস নি বোন
যদি ভালো চাস তা হলে যা বলি মন দিয়ে আগে শোন
পতিরে আমার কোলে দিয়ে তুই চলে যা নদীর ওপারে
ওষুধ গাছের পাতা নিয়ে আয় তাতে সব রোগ সারে।
মালঞ্চ: তোরে দেব পতি? খেতে চাস বুঝি? কে তুই সর্বনাশিনী
যত অসহায় হই তবু আমি অকূল পাথারে ভাসিনি।
দেব অভিশাপ পুড়ে হবি ছাই
মেয়েটি: না, না, অত রাগ করিস নি ভাই
মালঞ্চ: সাক্ষী থেকো চন্দ্র তারা সাক্ষী থেকো অন্ধকার রাতি
পতি যদি না বাঁচে তো নিশি শেষে হব আত্মঘাতী

মেয়েটি: ও মালঞ্চমালা, চেয়ে দ্যাখ
ভোরের বাতাস এল
দুঃখ নিশি ঘুচে গেল
আর তোর কোনো নেই ভয়
মালঞ্চ: ওমা, একে?
হস্তে গলে ফুল মালা
কে গো তুমি বনবালা
দেখে খুব চেনা মনে হয়।
কুকথা বলেছি কত
মাথা ঠিক ছিল না তো
ক্ষমা করো আমায় ভগিনী
বনদেবী: সকলি বুঝেছি আমি মোটেই রাগি নি
তুমি যে মালঞ্চমালা বনদেবী আমি
দ্যাখো দ্যাখো চেয়ে দ্যাখো জাগে তব স্বামী।

(বাচ্চার খিলখিল হাসি)

মালঞ্চমালা: ওমা ওমা এযে সত্যি, এযে সত্যি!
বনদেবী: যা বোন, এবার ঘরে ফিরে যা
আহা কি সুন্দর তোর পতি, আমি ওরে নাম দিলাম
চন্দ্রমানিক!

কথক: বাতাস বইছে মন্দ মন্দ
তাতে যেন চন্দনের গন্ধ
মিঠে রোদ্দুর সোনার চাদর
গায়ে লাগে যেন মায়ের আদর
ফুলের বাহারে চোখ যায় ভরি
পাখির কূজনে সুরের লহরী
মালঞ্চমালা যায় বনপথে
মন যেন তার স্বর্গ জগতে

চন্দ্রমানিক কোলে শুয়ে হাসে
কত প্রজাপতি ঘোরে চার পাশে

(বাচ্চার খিলখিল হাসি)

কিন্তু মালঞ্চমালা পথ ভুল করল। নিজের রাজ্যে না ফিরে সে আরও গভীর জঙ্গলে চলে গেল। আবার রাত্রি এল।

মালঞ্চ: এ কোন অচেনা দেশ, গহন কান্তার
সর্ব অঙ্গ বড় ব্যথা শক্তি নেই আর

(শিশুর কান্না)

মালঞ্চ: কোথা বনদেবী, সই বলে দাও তুমি
কেমনে যে পার হব এই বনভূমি

(শিশুর কান্না)

মালঞ্চ: রাজপুত্র স্বামী মোর সোনার থালায়
কোথায় খাওয়াব তারে, আমি অভাগিনী
এখন কাঁদেন তিনি ক্ষুধার জ্বালায়
বনবালা, বনবালা, কোথায় ভগিনী!

(দূরে বাঘের গর্জন)

মালঞ্চ: কে কোথায় আছ সব দেবদেবীগণ
দিতে পারি নিজের জীবন
যদি এক ফোঁটা দুধ পাই
কোনোক্রমে পতিরে বাঁচাই।

(বাঘের গর্জন কাছে চলে এল। একটা নয়, অনেকগুলো বাঘ)

বাঘ: হালুম! হালুম!
কাছাকাছি মানুষের গন্ধ পেলুম!
বাঘিনী: হালুম! হালুম!
এই তো গাছের তলায় দেখলুম
ফুটফুটে এক মেয়ের সাথে ছোট্ট একটি বাচ্চা
শিকার অতি সাচ্চা।
বাঘ: আমি মেয়েটাকে খাই, তুমি বাচ্চাটাকে খাও।
মালঞ্চ: বাঘমামা, বাঘমামা, একটি মিনতি করি শোনো
আমার সোয়ামি অতি শিশু, এরে খেয়ে লাভ নেই কোনো
একে তোমরা ছেড়ে দাও
তার বদলে আমাকে খাও!
বাঘ: এই রে মাটি করলে, প্রথমেই মামা বলে ডেকে ফেললে।
ভাগনীকে এখন কি করে খাই
তা হলে আর কাজ নাই
চলো বাঘিনী, অন্য শিকারে যাই!
বাঘিনী: আহা রে, তোমার স্বামী এমন শিশু হেন
তারে নিয়ে এই বনে এসেছ মা কেন?
মালঞ্চ: ভাগ্য যদি মন্দ হয়
সব পথই ভুল হয়!
বাঘ: চলো চলো, আমরা অন্য শিকারে যাই রাত রয়েছে বাকি
বাঘিনী: দাঁড়াও, আমরা চলে যাব, এরা খাবেটা কী?
মালঞ্চ: ব্যাঘ্র হলেন মামা, তুমি মোর মামী
বলে দাও, কী করে বাঁচাব মোর স্বামী।
বাঘিনী: তাই তো! এদের বাঁচাবার কী উপায়?
মানুষের ছানা কী খায়?
মালঞ্চ: উপায় একটি আছে মাত্র
যদি পাই দুধ এক পাত্র।
বাঘ: দুধ? দুধ? আহা বাছা, স্বামীকে খাওয়াবি?
গ্রাম থেকে ধরে আনি তবে একটা গাভী!

বাঘ আর বাঘিনী ডাকতে ডাকতে চলে গেল তারপর মালঞ্চমালা স্বামীকে সান্ত্বনা দেয়।

মালঞ্চ: চাঁদের গায়ে মেঘ জমেছে ফুঁ দিয়ে সরাই
সাথী আছে বনের বাতাস কোনো চিন্তা নাই
দুধের নদী ক্ষীরের সাগর পিঠে পুলির পাহাড়
এখনি তোমায় এনে দেব কী চাই বলো আর?
আবার বাঘ-বাঘিনীর গর্জন। ওরা ফিরে এসেছে।

মালঞ্চ: কী হল বাঘমামা, দুধ পেলে না?

বাঘ: গ্রাম অনেক দূরে,
তাতে দেরি হবে দুধ আনতে
হাতের কাছেই রয়েছে তো বাঘিনী,
তার দুধ দুয়ে নে না, ভাগিনী।

মালঞ্চ: বাঘের দুধ?

বাঘিনী: দ্যাখ না খাইয়ে! দেখবি কত শক্তিমান
হবে তোর সোয়ামী যেন কার্তিকের সমান।

চ্যাক চোঁক করে দুধ দোওয়ানোর শব্দ। সেই দুধ খেয়ে চন্দ্রকুমার হেসে ওঠে।

কথক: বনের মাঝে কুটির বেঁধে থাকে মালঞ্চমালা
চন্দ্রমানিক পতি তাহার রূপে গুণে দশ দিকে উজালা
সদাই তাদের ঘিরে রাখে পশু পাখি সেথায় ছিল যত
সবার মাঝে মানুষ দুটি যেমন মৌচাকের মধুর মতো।
বাঘের দুধের এমনি গুণ বাঘ-বাঘিনী এমন প্রতিপালক
উনিশ দিনেই রাজার কুমার হল যেন দশ বছরের বালক।

মালঞ্চমালা: এই এই কোথা গেলে? প্রাণপতি, যেও না!

চন্দ্রমানিক: টুকি; মালঞ্চমালা আমায় ধরতে পারো না! আমায় ধরতে পারে না।

মালঞ্চ: অত দূরে যেও না প্রভু! বিপদ হতে পারে!

চন্দ্রমানিক: এই তুমি প্রভু বলো
তুমি আমার কে?
বলো না, তুমি আমার কে?

মালঞ্চ: ছিলাম কাহার কন্যা আমি গেলাম কাহার ঘরে
স্বপন সম সেসব কথা খানিক মনে পড়ে

চন্দ্রমানিক: কী আছে এই বনের শেষে, ওগো কন্যা বলো না!
জঙ্গল আর ভাল্লাগে না দূরে কোথাও চলো না!

মালঞ্চ: দূরে যেতে ভয় হয়, পাছে কেউ কেড়ে নেয় তোমাকে

চন্দ্রমানিক: কে আবার কেড়ে নেবে? কেনই বা কেড়ে নেবে আমাকে?
কী আছে বনের শেষে, আমার বাপ-মা থাকে কোথায়?
যদি তুমি পথ চেনো, চলো তবে চলে যাই সেথায়।

মালঞ্চ: ভয় হয়, দূরে যেতে ভয় জাগে মনে
কেন যাব, তার চেয়ে কত সুখে আছি এই বনে।

কথক: কিন্তু মালঞ্চমালার এই সুখ আর বেশিদিন সইল না।
একদিন সেই পথে এসে হাজির হল মালিনী মাসি।

মালিনী: চেনা চেনা লাগে যেন, ওগো কন্যা তোমার কী নাম?

মালঞ্চ: আমি সেই মালঞ্চমালা, মালিনী মাসি তোমায় প্রণাম।

মালিনী: চিতায় পুড়ে মরিস নি তুই? কেমন করে বেঁচে ফিরে এলি?
সঙ্গে এই বালকটি কে? একে আবার কোথায় পেলি?
হাতে পতাকা, পায়ে পদ্ম, ছেলেটি বড় সুলক্ষণ
সন্দেহ নেই এ আমাদের রাজপুত্তুর বিলক্ষণ!
ওরে ওরে কী আনন্দ, কী আনন্দ আজ
লক্ষ টাকার পুরস্কার আমায় দেবেন মহারাজ!
চল, চল, চল...

কথক: তারপর তো মালিনী মাসির হাত ধরে মালঞ্চমালা আর চন্দ্রমানিক ফিরে এল রাজ্যে। রাজা রানী শোকে তাপে আধমরা হয়ে ছিলেন, খবর পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে

উঠলেন। রাজ্য জুড়ে শুরু হল উৎসব। কিন্তু—

মালঞ্চমালা: এমন সুখের দিনে কাঁপে কেন ক্ষণে ক্ষণে
আমার চোখের দুটি পাতা
বিপদ আছে কি আরো, কেউ বলে দিতে পারো
কোথায় আমার পিতা মাতা?
মহারাজা—

(ঢাক ঢোলের মহড়া, মালঞ্চমালার কথা কেউ শুনছে না।)

মালঞ্চ: মহারাজ, আছে মোর কিছু নিবেদন

রাজা: হবে হবে পরে শুনব খন

মালঞ্চ: মহারাজ, কোথায় আমার পিতা মাতা?

রাজা: আছে তারা ভালো আছে, পরে শুনো সেসব কথা!

মালঞ্চ: মহারাজ, যদি অনুমতি পাই
একবার আগে যাই মম পিতৃগৃহে

রাজা: হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও না, চলে যাও, যতদিন খুশি
থাকো সেথা গিয়ে।

মালঞ্চ: মহারাজ, আমি একাকী যাব কি অতদূর পথ
এমন গহন রাতে
কথা ছিল সেই দীনের কুটিরে রাজার কুমার
যাবেন আমার সাথে!

রাজা: কথা ছিল? কার কাছে?

মালঞ্চ: আরও দুটি শর্ত বাকি আছে

রাজা: শর্ত? এমন সাহস কি তোর রাজাকে শোনাস শর্ত
কে কোথায় আছিস, এই ডাইনির চুলের মুঠিটা ধর তো!

মন্ত্রী: সে কি মহারাজ, এ মেয়েটি রাজবাড়ির পুত্রবধূ
পিতার কুটিরে একবার যেতে অনুমতি চায় শুধু!

রাজা: এত আয়োজন এত উৎসব ছেড়ে
আমার কুমার চলে যাবে আজ কোটালের কুঁড়ে ঘরে?
তোমরা শুনেছ এই মেয়েটির আহ্লাদ
যাও এক্ষুনি ডেকে আনো জহ্লাদ!

কোটালের মেয়ে বিষম কুটিলা আগে থাকতেই জানি!
দেখো ভালো করে এ মায়াবিনীর আসল চেহারাখানি
রাজকুমারের সাথে ছিল কত বয়সের ব্যাবধান
কী করে বা আজ হল দুইজনে এমন সমান সমান?
ডাইনি ছাড়া কি আর কেউ পারে ঘটাতে এসব কাণ্ড
যাও জল্লাদ, বনে নিয়ে গিয়ে কেটে ফেলো ওর মুণ্ড!

কথক: মাথাটি মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিয়ে মারতে মারতে তাহারে
ঘাতকেরা বেঁধে টেনে নিয়ে এল খুব উঁচু এক পাহাড়ে
বিষম গভীর খাদের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিল সজোরে
মালঞ্চমালা খাদের মাথায় ঝুলে থেকে কাঁদে অঝোরে।

(মালঞ্চমালার কান্না)

এক দিন যায়, দু'দিন যায়, তিন দিন যায়...
তারপর সেখানে এলেন বনদেবী

বনদেবী: গাছের মাথায় শুয়ে শুয়ে
কাঁদছে দেখি একটি মেয়ে,
তুমি কে?
মালঞ্চ: কেউ নাই যার এ সংসারে
সব গেছে যার ছারে খারে
আমি সে!
বনদেবী: ওমা, এযে মালঞ্চ, মোর বোনটি
কী করে হল দশা তোমার এমনটি
খুলে কও তো সব!
মালঞ্চ: কিছুই তো নেই জানাবার
সুখ-দুঃখ কোনো কিছু আর
এখন করি না অনুভব।
বনদেবী: হুঁ, এবার সব বুঝেছি

ধ্যান নেত্রে সব কিছু দেখেছি
সেই রাজা এত পাপী, এত অকৃতজ্ঞ?
তার রাজ্যে এখনি বাধাব দক্ষযজ্ঞ!
আয় তো রে সিংহ, হস্তী, ভল্লুক, ব্যাঘ্র
কে কোথায় রয়েছিস চলে আয় শীঘ্র!

(নানারকম জন্তুজানোয়ারদের ডাক। এর মধ্যে বাঘ-বাঘিনী ডাকতে ডাকতে কাছে আসে।)

বাঘ: এ তো দেখি মালঞ্চমালা আমার ভাগিনী
চিনতে পেরেছিস একে বাঘিনী?

বাঘিনী: কেন, চিনব না ওকে আমি
ও মালঞ্চ, গেল কোথায় তোর সোয়ামী?

(মালঞ্চের কান্না)

বনদেবী: তোরা সবাই সাথে করে মালঞ্চকে নিয়ে যা
দেখিস যেন উচিত শাস্তি পায় সে পাপী রাজা!

কথক: ব্যাঘ্র বাহিনী মালঞ্চমালা আরও সব আসে সঙ্গে
নখী ও শৃঙ্খী যত প্রাণী ছিল ধায় সবে রণ রঙ্গে।
তাই দেখে সেই রাজার রাজ্যে পড়ে গেল হুড়াহুড়ি
প্রজারা সভয়ে যে-যেদিকে পারে দৌড় দিল ঘর ছাড়ি
শেষে রাজা এসে অতি দীন বেশে দাঁড়ালেন করজোড়ে

রাজা: (কম্পিত কণ্ঠে) মালঞ্চমালা, ওগো মা মালক্ষ্মী ক্ষমা করো
তুমি মোরে

(বাঘের গর্জন)

মালঞ্চ: আরে রাখো রাখো আমাকে প্রণাম করতে দাও
অরণ্যের ভাই বন্ধু, এবার অরণ্যে ফিরে যাও।

কথক: তারপর?

ভয় দূর হল, ঘরে ফিরে এল পলাতক প্রজা সবে
এ রাজ্যখানি মেতে ওঠে ফের নতুন মহোৎসবে
কিছুদিন পরে রাজা সন্ন্যাস নিলেন, গেলেন বনে
চন্দ্রমানিক সবাকার প্রিয় বসল সিংহাসনে
মালঞ্চমালা সে দেশের রানী রূপে গুণে আলো করা
এমন সে দেশ হাসিতে খুশিতে সকলের মন ভরা।

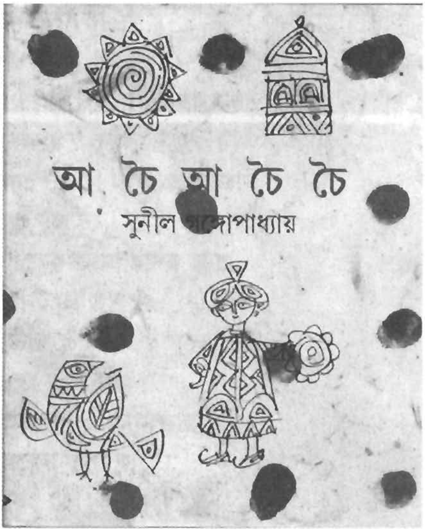

আ চৈ আ চৈ চৈ

সূচি

সিমলা যাত্রা ৩০৫, আ চৈ, আ চৈ চৈ, চৈ চৈ চৈ ৩০৬, রাজা আর সেপাই ৩০৬, সাত-পাঁচ ভাবনা ৩০৭, খেলাচ্ছলে খেলা তো নয় ৩০৯, কায়দাটা শিখে নেবে? ৩১০, নদীর ধারে একা ৩১১, খাদ্যাখাদ্য ৩১২, হ্যালির কমেট হ্যালির কমেট ৩১৩, মুন্নির বেড়াল ৩১৪, বৃষ্টির রূপকথা ৩১৫, বাবা আর মা ৩১৬, ঘুমের ছড়া ৩১৬, শিবঠাকুরের আপন দেশে ৩১৭, খেলার নাম ৩১৮, পায়ের তলায় সর্ষে ৩১৯, দেওয়া-নেওয়া ৩২১, তিনটে কোকিল ৩২১, দোকানদারের নাতনী ৩২২, খোকার ভাবনা ৩২৩, বৈশাখের পয়লা দিনে ৩২৪, ডাকঘরের অমল ৩২৫, রাজ-যোটক ৩২৬, ছড়রা ৩২৭, চুনী-পান্না ৩২৮, আজব নগর ৩২৯, প্রশ্ন ও উত্তর ৩২৯, পেন্নাম ৩৩১, লুপুসুংশান ৩৩১, মনে পড়ে সেইদিন ৩৩৩

সিমলা যাত্রা

বাবামশাই সিমলা যাবেন
বেজায় হুলুস্থুলু
রাত জেগে মা বাক্স সাজান
চক্ষু ঢুলু ঢুলু।
শীতের জামা চাদর ছাতা
লিস্টি অতি বৃহৎ
মৌরি ভাজা, সুচ সুতো চাই
এবং উপনিষৎ!
খাজাঞ্চি ও গোমস্তারা
যাবেন জনা বারো
এবং রবি? মা বলেছেন
তুমিও যেতে পারো।

রবির এখন ন্যাড়া মাথা
তাই নিয়ে খুব লজ্জা
জ্যোতিদাদা পরিয়ে দিলেন
যুদ্ধে যাওয়ার সজ্জা।
জোড়াসাঁকোর পাল্কি এল
গঙ্গা নদীর ধারে
পাহাড় চূড়ায় যাবে এবার
সোজা ইস্টিমারে।

আ চৈ, আ চৈ চৈ, চৈ চৈ চৈ

আ চৈ, আ চৈ চৈ, চৈ চৈ চৈ
হিঙ্গুল পুকুরের হাঁসগুলো কৈ?
দুধ সাদা দই সাদা চিনি আর খৈ
হিঙ্গুল পুকুরের হাঁসগুলো কৈ?
পুকুরের ধারে এক বাড়ি ছিল সই
তিনখানা গোরু আর সাতখানা মই
আ চৈ, আ চৈ চৈ, চৈ চৈ চৈ
পুকুরের ধারে সেই বাড়িখানা কৈ?
বাড়ি ভরা ছেলে মেয়ে হৈ হৈ হৈ
গাছগুলো ছুঁয়ে আছে নৌকোর ছই
আ চৈ, আ চৈ চৈ, চৈ চৈ চৈ
চারদিক শুনশান জলে ভাসে বই
আ চৈ, আ চৈ চৈ, চৈ চৈ চৈ
বান এল সব গেল থৈ থৈ থৈ!

রাজা আর সেপাই

সেপাই এসে যেই দাঁড়াল,
রাজা বললেন, সেলাম!
সেপাই বলল, হঠাৎ যেন
বিড়ির গন্ধ পেলাম?

রাজা বললেন, রামো, রামো
বিড়ি তো নয়, মুলো!
সেপাই বলল, গোঁফের ডগায়
জমছে কেন ধুলো?

রাজা বললেন, কমলা-আপেল
আনব কয়েক ঝুড়ি?
সেপাই বলল, কোথায় আমার
পেঁয়াজ-লঙ্কা-মুড়ি?

রাজা বললেন, বসুন আগে,
এই যে সিংহাসন,
সেপাই বলল, নোংরা ওটা
মাছিতে ভন্‌ভন্‌!

রাজা বললেন, মাছি কোথায়,
ওগুলো সব পাখি,
সেপাই বলল, কাজে-কম্মে
দিচ্ছ খুবই ফাঁকি!

রাজা বললেন, নাচার হুজুর
দেখাচ্ছি পা তুলে,
কত বড় ফোস্কা, আমার
জুতো দিন-না খুলে!

সাত-পাঁচ ভাবনা

একদিন ঘোর বর্ষার দিনে ছুটি-ছুটি ভাব দেখে
হলুদ রঙের কম্পিউটার ঘুম দিল নাক ডেকে।
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে অ্যালজেব্রার ধাঁধা
হঠাৎ কে যেন বোতাম খুঁচিয়ে বলল, ওঠো তো দাদা!
হলুদ রঙের কম্পিউটার চোখ মেলে পাশ ফিরে

ছোট ভাইটিকে দেখে ধমকাল, কেন ঘুম ভাঙালি রে?
ছোট ভাই মিনি-কম্পিউটার নীল মুখ কালো করে
বলল, দাদা হে, ডেকেছি তোমায় বিষম বিপদে পড়ে!
একটা বাচ্চা ফুটফুটে মেয়ে নাম তার মধুবন
সকাল থেকেই করছে আমায় নিদারুণ জ্বালাতন।
সাত আর পাঁচে কত হয় তাকে বলতেই হবে আজ
এমন অঙ্ক জীবনে শুনিনি, নেই কোনো আন্দাজ!
থিটা-বিটা-গামা লগারিথমের সব কিছু জানা আছে
কিন্তু এটা কী? সাত-পাঁচ ভেবে এসেছি তোমার কাছে।

তাই শুনে মহা গর্জন করে বলল হলুদ, সাত?
আকাশে না জলে, তরল-কঠিন, আগে বল কোন জাত,
আর পাঁচ তার মাথায় না পায়ে, ফর্সা না কালো চাবি
এসব না জেনে প্রশ্ন করিস, একখানা চাঁটি খাবি?
প্যারাবোলা আর ইনফিনিটির জানি আগাপাশতলা
কী সাহস তোর আমার সামনে এলেবেলে কথা বলা?
এখনো বাচ্চা রইলি, কম্পু, শিখলি না ভদ্রতা
বড়দের কাছে বলা উচিত না, এসব ক্ষুদ্র কথা!

নীল-মিনি মাথা চুলকিয়ে বলে, আমি সাতে-পাঁচে নেই
বিচ্ছু মেয়েটা তবু যে আমায় ছাড়বে না কিছুতেই
হোমটাস্কের খাতা ফেলে উঠে আসছে বারংবার
দেখে যাই যদি আর দুই দাদা করে দেন উদ্ধার!

আর দুই দাদা মেগা ও সুপার, অতি জাঁদরেল তারা
কাছে আসতেই দপদপে লাল চোখ মেলে দিল সাড়া
কে আসে, কী চাই? পৃথিবী না চাঁদ, শুক্র না মঙ্গল?
মহাশূন্যের সঙ্গে আরেক শূন্যের যোগফল?
বলল কম্পু, অত কিছু নয়, শুধু পাঁচ আর সাত
শোনামাত্রই এল উত্তর লম্বা তিনশো হাত!

আরও কড়কড়, আরও ঘড়ঘড়, এবং ঘটাং ঘট
কাগজের ঢেউ দেখে নীল-মিনি সটান স্পিকটি নট!
মেগা যত বলে সুপার দ্বিগুণ, দু'জনের রেষারেষি
বোঝা সোজা নয় দুই পালোয়ান কে যে কার চেয়ে বেশি!

এমন সময় মধুবন এল দুলিয়ে মাথার চুল
হাসতে হাসতে বলল, কম্পু, আমারই হয়েছে ভুল।
সাত আর পাঁচে যোগ নাকি গুণ সেটাই দেখিনি আগে
সব অঙ্কটা ফের শুরু হবে, বলো তো কেমন লাগে?
পাঁচ কেন পাঁচ, সাত কেন সাত? বলো দেখি তাড়াতাড়ি
তা শুনে সবাই চুপ করে গেল, যেন সকলের আড়ি
মিনি ও হলুদ, মেগা ও সুপার চক্ষু রইল বুজে
লোডশেডিং-এর ধাক্কা! মেয়েটি তক্ষুনি গেল বুঝে।

খেলাচ্ছলে খেলা তো নয়

খেলাচ্ছলে খেলা তো নয়
মরণ বাঁচন যুদ্ধ
বাঙাল-ঘটি দাঁত কপাটি
ধূম্রলোচন ক্রুদ্ধ!

ভালোয় ভালোয় জাদুমণি
গোল পাঠাও বলকে
হাত ঘুরঘুর নাড়ু দেব
আস্ত গোটা দলকে!

যত ইচ্ছে হাত পা ভাঙো
নিজের নয় অন্যের
বোকা হলেই জোকার শুনবে
হাজার পঁচিশ সৈন্যের।

বল্‌কে যদি চ্যাপ্টা করো
গোলকে করো লম্বা
তখন তোমার কি যে হবে
জানেন জগদম্বা।

বাঙাল-ঘটি দাঁত কপাটি
ধূম্রলোচন ক্রুদ্ধ
খেলাচ্ছলে খেলা তো নয়
মরণ বাঁচন যুদ্ধ!

কায়দাটা শিখে নেবে?

এক লাফে বোম্বাই পাঁচ লাফে লন্ডন
টাকাকড়ি নেই কিছু পকেটটা ঢন্‌ঢন্‌।
বিমানে ও জাহাজেতে যায় এত কাহারা?
আমি ভাই চলে যাই তিন লাফে সাহারা।
নাম্বিয়া জাম্বিয়া নাইরোবি কঙ্গো
দেড় লাফ লাগে মোটে ছেড়ে যেতে বঙ্গ।
যেদিকেই যেতে চাই নাই কোনো শঙ্কা
যদি চায় পাসপোর্ট, দিই লবডঙ্কা।
জাপান বা আমেরিকা, চীনদেশ, রাশিয়া
যবে খুশি যাওয়া যায় অনায়াসে হাসিয়া।

এ এমন কিছু নয়, কত গেছি হিমালয়
ঘুরে-ফিরে চলে আসি স্বর্গ বা যমালয়।
কোনো দিকে বাধা নেই, পাহাড় বা জঙ্গল
চাঁদ-ফাঁদ ঘোরা আছে, এমনকী মঙ্গল।
আরও বার বার যাব, দিইনিকো ক্ষান্ত
ভেবো নাকো, মনে-মনে, যাই জলজ্যান্ত।
কায়দাটা শিখে নেবে? করো দেখি অনুমান
তোমাকেও হতে হবে মাঝে-মাঝে হনুমান!

নদীর ধারে একা

একলা একলা বসেছিলুম চূর্ণী নদীর ধারে
একটা দুটো জোনাকি-ফুল ফুটছে অন্ধকারে
আর তো কিছুই দেখা যায় না, আকাশে নেই তারা,
খেয়ার ঘাটও বন্ধ এখন, নিঝুম জেলেপাড়া।
গাছের ডালে ফুরফুরিয়ে দোল খাচ্ছে হাওয়া,
কেমন করে ওপারে যাই, হল না বুঝি যাওয়া
ছলাতছল ঢেউয়ের শব্দ, নদী ভাঙছে কূল
ভরা বর্ষায় চূর্ণী যেন খুশিতে মশগুল।

একলা বসে কী যে করি, সামনে সারারাত,
পেট জ্বলছে খিদেয়, আজ কপালে নেই ভাত
একটা যদি বাঁশি থাকত লাগিয়ে দিতুম সুর,
কদমগাছের তলায় না হয় হতুম কেষ্টঠাকুর!
রূপকথার গল্পগুলো হঠাৎ সত্যি হলে
মনপবনের নৌকোখানি ভেসে উঠত জলে।
কিংবা তেমন মন্ত্র যদি জানা থাকত আমার
শূন্য পথে পেরিয়ে যেতাম নদী ও খেত-খামার!

মেঘ ডাকল দারুণ, দেখি বিদ্যুতের ছটায়
একটা কাগজ পড়ল আমার পায়ের কাছটায়,
কাগজ তো না, চিঠি একটা, আকাশ থেকে এল?
নিশুত রাতে আমায় এমন চিঠি কে লিখল?
সত্যি-সত্যি চিঠিই সেটা বাংলা অক্ষরে,
আবার বিজলি চমক দিতেই নিলুম সেটা পড়ে।
খিদে-তেষ্টা রইল না আর জুড়োল প্রাণমন,
সেই চিঠিটার মানে বুঝতেই কাটবে সারাজীবন!

খাদ্যাখাদ্য

তোমার আমার খিদে পেলে
খাই পেয়ারা কলা,
ওস্তাদজি সেই সময়ে
সাধতে বসেন গলা!
শান্তিপুরের জামাইবাবু
মানুষ অতি শান্ত,
খাবার দেখলেই বলেন, ওরে,
আয়নাখানা আন তো!

আছেন মস্ত সওদাগর
হিম্মতসিং খান্না,
হিরে-মুক্তো গুঁড়ো ছাড়া
আর কিচ্ছুই খান না!
পাশের ফ্ল্যাটের ছোট্ট মেয়ে
বায়নার নেই অন্ত,
টুথপেস্ট সে খাবেই খাবে,
পায়েসে মাজে দন্ত!

মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজান
রামমনোহর পাত্র
চায়ের মধ্যে চিনি দিলেই
জ্বলে তাঁহার গাত্র!
গজেনবাবু ম্যাজিক দেখান
জ্যান্ত আগুন খাওয়া,
পদ্য যাঁরা লেখেন, তাঁদের
খাদ্য দখিন হাওয়া!

এর চেয়ে ভাই তুমি আমি
আছি দেদার মজায়,
মনের সুখে খিদে মেটাই
মণ্ডা-মিঠাই-গজায়!

হ্যালির কমেট

হ্যালির কমেট

হ্যালির কমেট হ্যালির কমেট এত দিনের পরে
পৃথিবীখানা দেখছ কেমন, বলো না সত্যি করে।
সেই যে তুমি এসেছিলে অনেক বছর আগে
তখন বাতাস মিষ্টি ছিল, এখন কেমন লাগে?
তখন ছিল সবুজ ধরা, এমন কেমন ধারা?
অন্য কোথায় আছে এমন? আমরা সৃষ্টিছাড়া?

দেখছ কত নতুন কিছু লম্বা লম্বা বাড়ি
বিজলি রেলের পাশ দিয়ে যায় রিক্সা, গোরুর গাড়ি
আকাশ জুড়ে বিমান রকেট করছে হাঁকাহাঁকি

অ্যাটম বোমার ধোঁয়ায় তোমার চোখ জ্বলছে নাকি?
সাহেব কমেট, সাহেব কমেট, একটা কথা বলো
এখন সবাই খারাপ এবং আগের সবাই ভালো?
এই কথাটা মানতে আমি কিছুতেই পারবো না
কালোর মধ্যে আলোও থাকে, ছাইয়ের মধ্যে সোনা।

মুন্নির বেড়াল

সত্যি কথা বলছি তোকে মুন্নি
তোর বেড়ালটা আসলে শাঁকচুন্নি
দিনের বেলায় এদিক ওদিক যায় না
ভাজা মাছটি উল্টে খেতে চায় না
সবাই বলে আহা কেমন লক্ষ্মী
কোথায় থাকে জানেও না কাকপক্ষী
দুপুরবেলা গড়ায় আমার বালিশে
মুচকি হাসে আমার শত নালিশে
বিকেলবেলা রোদ্দুরে গা শুকোয়
ইঁদুর দেখলে ঘরের কোণে লুকোয়।

সত্যি কথা বলছি তোকে মুন্নি
তোর বেড়ালটা আসলে শাঁকচুন্নি
সন্ধে হলেই চেহারাখানি অন্য
রোঁয়া-ফোলানো যেন বিষম বন্য
গোমড়া মুখ, চক্ষু দুটি অগ্নি
বাঘের মাসি, বা সিংহের ভগ্নি
দেখেছি আমি প্রতিটি মাঝরাত্রে
কোথায় যায় অন্ধকার সাঁতরে

ফিরলো যখন ঠোঁটের কোণে রক্ত
মানুষ-খেকো নয় যে, বলা শক্ত!
তাই তো বলি সবই উল্টোপাল্টা
যা ভাবিস তা নয় ভিজে-বেড়ালটা।

বৃষ্টির রূপকথা

মেঘের মুলুকে আজ কি যে কোলাহল
কে যেন ঝরায় তার দু' চোখের জল
বাড়ির কর্তা কাকে রেগে গরজায়
ভীষণ চাবুক দেখে চোখ ঝলসায়।
ফাজিল ভাইপো তার উত্তুরে হাওয়া
হি-হি-হু-হু হেসে শুধু করে আসা যাওয়া।

আকাশের বাড়ি ঘর ভেঙে চুরমার
সেই ভাঙা জমে হল বিরাট পাহাড়
টিম্‌টিম্‌ জ্বলছিল চাঁদ-লণ্ঠন
হঠাৎ ঢাকলো তাকে মেঘ-পল্টন
আঁধারেতে ঢেকে গেল সব কোলাহল
শুধু শুনি ঝরে কার দু' চোখের জল।

বাবা আর মা

বাবাও নাকি ছোট্ট ছিলেন
মা ছিলেন একরত্তি
ঠাম্মি দিদু বলেন, এসব
মিথ্যে নয় সত্যি।
বাবা ছিলেন আমার সমান
টুয়ার সমান মা
বাবা চড়তেন কাঠের ঘোড়ায়
মা দিতেন হামা!

বাবা ছিলেন দস্যি ছেলে
মা খুব ছিঁচকাঁদুনে
বাবা খেতেন কানমলা খুব
বিশ্বাস হয় শুনে?
আমি ছোট, বুবুন ছোট
টুয়া, জিয়া আর ভাই
মায়েরা সব মায়ের মতন
বাবারা সব বাবা-ই।

ঘুমের ছড়া

ডিংডা ডিডাং ডিং ডাং
পুপলু যাবে কার্শিয়াং
কু ঝিক ঝিক ছোট্ট গাড়ি
সাহেব মেমের মামার বাড়ি

ডিংডা ডিডাং ডিং ডিং
পুপলু যাবে দার্জিলিং
শীতে হু হু গা হিম হিম
পাহাড় চুড়োয় আইসক্রিম

ডিংডা ডিডাং ডিং ডং
পুপলু যাবে কালিম্পং
টাট্টু ঘোড়া চালাও জোরে
পক্ষীরাজ হাওয়ায় ওড়ে

ডিংডা ডিডাং ডিং ডুং
পুপলু এবার যাবে ঘুম
ঘুম পাহাড়ে যাবে ঘুম
ঘুম পাহাড়ে যাবে ঘুম...

শিবঠাকুরের আপন দেশে

ঘুরতে ঘুরতে রাস্তার শেষে
এলেম কোথায় এ কেমন দেশে
ঘুটঘুটি রাত হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড়
কারা ঘোরে সব ডাকাত না চোর
হাতে হারিকেন মাথায় গামলা
তবে কি উকিল, তবে কি আমলা
বেড়ালের মুখে শেয়ালের ডাক
জোনাকির পেট ফুলে জয়ঢাক
ডিগবাজি খেয়ে সামনে কে যায়
কারা ঢুঁসো মেরে ছুটছে বেজায়

হেঁকে বলি, দাদা, কোথায় যাচ্ছো
জবাব পেলুম, একুশ হ্যাঁচ্চো!

দিনের বেলায় মন্তর ফুস
সব ঠিকঠাক জ্যান্ত মানুষ
ঘুমোচ্ছে কেউ ঠ্যাং দুটো তুলে
নামতা পড়ছে কেউ কান মুলে
ছেলে হেসে খুন মাস্টার কাঁদে
চিংড়ি পড়েছে বোয়ালের ফাঁদে
গোয়ালার গোরু চিড়িয়াখানায়
বাঘের দুধের মিষ্টি বানায়
শুনি ঢুস্ ঢাস্ ধড়াস ধ্যাদ্দো
কুস্তিওয়ালারা লিখছে পদ্য
পালাবো কোথায় রাস্তা পাইনে
ধরা পড়ে গেছি একুশ আইনে।

খেলার নাম

খেলার নাম ধুন্ধুমার
নিয়ম এই রকম
বাইশ জোয়ানে বল ছোটাবে
যতক্ষণ না দম
ফুরোয় এবং দর্শক হয়
দশটি হাজার যম।
দম ফুরোলেই অন্য খেলা
সোডার বোতল ইটের ঢেলা

গোলের কাছে গন্ডগোল
হর হর বম্ বম্।
খেলা ফুরুলে বাড়ি ফিরবে
দু’-তিন জন কম।

পায়ের তলায় সর্ষে

আমার বাবার ঠাকুরদাদা এক শুক্কুরবারে
হঠাৎ যেন বদলে গেলেন বসে নদীর ধারে।
আমার বাবার ঠাকুরদাদা দারুণ স্বাস্থ্যবান
একটি ধামা মুড়ির সঙ্গে দশটা লঙ্কা খান।
গায়ের রংটি কালো হলেও রাগলে পরেই লাল
তন্ত্র মন্ত্র জানেন অনেক, নাচান কঙ্কাল!
সেই তিনি এক দুপুরবেলা ঝামরে মাথার চুল
বললেন, ওঃ, জীবনখানাই মস্ত বড় ভুল!
একই বাড়ি, একই উঠোন, মানুষজনও চেনা
প্রত্যেকদিন সব-কিছু এক, আর তো ভাল্লাগে না!
শুয়ে শুয়ে দেয়াল দেখা, দেয়াল নয়তো খাঁচা
খাইদাই আর বগল বাজাই, এর নাম কি বাঁচা?
এই না বলে নৌকো খুলে জোয়ার-জলে ভেসে
আমার বাবার ঠাকুরদাদা গেলেন নিরুদ্দেশে।

কোথায় গেলেন, কোথায় গেলেন, কেউ জানে না আর,
সবাই বলে গেছেন তিনি তিন সাগরের পার!
নতুন কোনো দ্বীপের মধ্যে বানিয়ে নিলেন দেশ
তিনিই রাজা, তিনিই প্রজা, একলা আছেন বেশ।
কেউ বা বলে গেছেন তিনি কিউবা, হনুলুলু

এখন নতুন নাম হয়েছে কার্ভালো কোভ্‌লু!
এক পাদ্রি ছবি দেখেই বললেন, কে ইনি?
সুবিখ্যাত ভূপর্যটক বিলক্ষণ চিনি!
রাশিয়াতেই দেখেছি শেষ, মাথায় পাগড়ি বাঁধা
লেনিন-সাহেব আদর করে ডাকেন 'ঠাকুরদাদা'!
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন পৃথিবী খান খান
তিনিই হিটলারের গোঁফে মেরেছিলেন টান!
বৃদ্ধ তিনি হননি মোটেই মন্ত্র-তন্ত্র বলে
অমর হয়ে আজও ঘোরেন সারা ভূমণ্ডলে।
এমনটিও হতেই পারে হঠাৎ মনের সাধে
তিনিই প্রথম পা দিয়েছেন মঙ্গলে আর চাঁদে!

স্বপ্নে আমি দেখেছি সেই আজব মানুষটিকে
কেমন যেন অবাক চোখে তাকান আমার দিকে
ফিসফিসিয়ে বলেন, ওরে ঘরবন্দী খোকা
আরাম করে ব্যারাম করিস, এমন তোরা বোকা?
সারা জীবন কাটিয়ে যাবি নরম বিছানায়?
এই দুনিয়া দেখবি যদি আমার সঙ্গে আয়!
লাফিয়ে উঠি, কেউ নেই তো, শুধুই অন্ধকার,
বাতাসে তবু ফিসফিসানি শুনি বারংবার।
সেদিন থেকে বনে-পাহাড়ে নানান নদীর বাঁকে
পায়ের তলায় সর্ষে আমার, খুঁজে বেড়াই তাঁকে।

দেওয়া-নেওয়া

আমার আছে একটা সোনার হরিণ
একটা কিংবা দুটো
কারুর কি চাই? তা হলে এই নিন
খুলুন হাতের মুঠো!

আমার আছে ডজনখানেক পাখি
ঠোঁটে রুপোর পাত
চাই সেগুলোও? ইচ্ছে আছে নাকি
কোথায় ডান হাত?

আমার আছে প্রকাণ্ড এক বাগান
ফুল না হীরের কুচি
সেটাও কি চান? ভালো লাগলো ঘ্রাণ?
আছে তো বেশ রুচি!

দিলাম সবই, মিথ্যে মোটেই না ভাই
চেয়ে দেখুন সোজা
তবে ফেরত চাইলে যদি না পাই
দেখিয়ে দেব মজা!

তিনটে কোকিল

তিনটে কোকিল সন্ধেবেলা ডাকে
বসন্তে নয়, প্রচণ্ড বৈশাখে
শিরীষ গাছে, কৃষ্ণচূড়ায়, তেঁতুল পাতার ফাঁকে
এ এখানে, সে সেখানে, কে যে কাকে ডাকে!

সারাটা দিন আগুন গলা, আকাশ যেন পাথর
কাঠবিড়ালি, পিঁপড়েরাও কাতর
হাওয়ায় দোলে চোখ-ঝল্‌সা ধপধপে এক চাদর
নদীর মধ্যে নদীও নেই, পাথর!

এই গ্রীষ্মে সমস্ত গান মানা
পুড়ে যাচ্ছে চাতক পাখির ডানা
এর মধ্যেই হঠাৎ এমন দুরন্ত এক বসন্তের হানা
তিনটে কোকিল মানল নাকো মানা!

দোকানদারের নাতনী

এক যে ছিল দোকানদার
তার ছিল এক নাতনী,
সকাল বিকাল মাংস ব্যাচে
নেই তাতে তার খাটনি।

নাতনীটি তার খেলে বেড়ায়
দূরের পাড়ায় পাড়ায়,
সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতে
রোজই রাস্তা হারায়।

(আসলে সে) সন্ধে হলেই বিকট সাজে
আগুন ভাটা চোখে
এমন জোরে চ্যাঁচায়, ভয়ে
পালিয়ে যায় লোকে।

একটা যদি ভ্যাবলা ছেলে
আছাড় খেয়ে পড়ে
অমনি তাকে এই মেয়েটি
কপাৎ করে ধরে।

আদর করে বলে, “আহা
মুখটি চাঁদপানা,
দুষ্টু ছেলে, এবার তুমি
হওতো ছাগল ছানা।”

এমনি করে দোকানদারের
আদুরে সেই নাতনী
রোজই একটা ছাগল আনে
সাঁঝে সেজে পেতনী।

খোকার ভাবনা

নদী যদি হতে চায় দূরের আকাশ
তবে কি বৃষ্টি হবে গোটা বারো মাস?
খোকা বলে, বলো না মা, এ কি হয় না কি?
মা বলেন, থাম্ বাপু, ঢের কাজ বাকি।
যা এখন খেলা কর, আঁচলটা ছাড়
রোদ্দুরে দিতে হবে আমের আচার।

খোকা ভেবে ভেবে মরে পায় না তো মানে
কত যে অভাব আছে কেউ তা কি জানে?
মাথার পেছনে যদি হয় দুটো চোখ

চাপা পড়ে মরতো কি রোজ এত লোক?
মনে মনে খেলে যদি যেত পেট ভরে
তাহলে কি অনাহারে এত লোক মরে?
এ রকম আরো কত আছে যে অভাব
কখনো কি মিটবে তা, কে দেবে জবাব?
ভগবানই জানে না তো তুমি আমি ছার
তার চেয়ে খাওয়া যাক আমের আচার।

বৈশাখের পয়লা দিনে

একটা নদী হারিয়ে গেল
কাশের বনে মিলিয়ে গেল
দুলতে-দুলতে কোন খেয়ালে
ঝুপুস করে পালিয়ে গেল কেউ জানে না

আকাশ থেকে রামধনুটি
হঠাৎ তাকে দিল ভ্রূকুটি
বলল, ওরে আহ্লাদীটি
ছুটির খেলা ফুরোল, তোর মন মানে না?

সবাই এখন ব্যস্ত কত
ফুল ফোটাবে কয়েক শত
মৌমাছিরা ইচ্ছেমতো
সকাল কিংবা বিকেলবেলা শোনাবে গান

চৈত্রমাসে বসন্তকাল
    চতুর্দিকে জলের আকাল
        শুকনো ঠোঁট দু’ চক্ষু লাল
            এমন দিনে গান শুনে কার জুড়োবে প্রাণ?

এমন সময় থাকত যদি
    জল-ছলছল পার অবদি
        দুষ্টু মেয়ের মতন নদী
            হায়রে হায় সে হারিয়ে গেল কোথায়

সারাটা মাস দমসমিয়ে
    ডাকল মেঘ গমগমিয়ে
        নামল বৃষ্টি ঝমঝমিয়ে
            আয়রে আয় ও নদী ফের ধরায় আয়!

ডাকঘরের অমল

তোমরা কি দেখেছ সেই অমলকে?
ওগো দইওলা, তুমি তো পাড়ায় পাড়ায়
দই নিয়ে ঘোরো
কত মানুষের বাড়ি বাড়ি যাও
                    দেখোনি?
যখন দূরের পাহাড়ে বৃষ্টি নামে
ঝর্নার পারে খেলা করে প্রজাপতি
                    অমলকে মনে পড়ে

ওগো পাখিওলা, তুমি দেশে দেশে যাও
অচেনা দেশের অচেনা পাখিরা
জানে অমলের কথা।

যেখানেই যাও
একবার খুঁজে এসো!
যদি অমলের দেখা পাও তবে
তোমরা সবাই বোলো
সুধা তাকে আজো ভোলেনি।

রাজ-যোটক

একটি মানুষ কালো কুচকুচ চটপটে কাজকম্মে
আর একজনা সাদা ফুটফুট দন্ত মাজে না জন্মে।
কালোটির নাম কেষ্টকমল মাথায় মস্ত বাবরি
অন্যজনটি ধূম্রলোচন টাকের ওপর পাগড়ি।
কেষ্টকমল বেহালা বাজায় মাঘের শীতের রাত্রে
ধূম্রলোচন তুর্কি-নাচুনে, চুলকুনি সারা গাত্রে।
একজন যদি শনিবার খায় খই বাতাসা ও সিন্নি
অন্যটি তবে সেইদিনই খাবে কোপ্তা-কাবাব ফিরনি।
রে-রে রোদ্দুরে একজন যায় জলায় শাপলা তুলতে
বাকিজন সেই ফাঁকে শিখে নেয় তালা ভেঙে ঘর খুলতে।
একটি মাত্র ভাই আছে, তাকে অতি ভালোবাসে কেষ্ট
সেই ভাই তাকে চাঁটি মেরে বলে, মাথাটি নরম বেশ তো।
আরও সবদিকে মিল খুব যেন আদা আর কাঁচকলাতে
কেষ্ট ধূম্র যমজ দু'ভাই বড় ভাব গলা-গলাতে।

ছড়্রা

(১)

তুতুর তুয়া তুতুর তুয়া পিড়কা পিটাং
নাচ থো মাঝি নাচরে মেঝেন্ ধিড়কা ধিতাং
ধিতাং মারু মহুল দারু মুর্গাশুখা
শহর থেকে বাবু আলেন ঘুর ঘুর না নাচ দেখা-আ!
পয়সা দিবে কাম দিবে বাবুর বাড়ি নাস্তা হবে
ঘুর ঘুর না ধিড়কা ধিতাং নাচরে মেঝেন্ ধিড়কা ধিতাং!

(২)

মেঘপাহাড় আলুঝালু জষ্টি মাসে বিষ্টি
ছিল আকাশ গোমড়ামুখো ভাসলো এবার ছিষ্টি
টুপটুপাটুপ টিনের চালে টোঁয়া টোঁয়া কান্না
পিসশাশুড়ি হেঁকে বলেন, দে খ্যামা দে, আর না!
ধর ধর ব্যাং উল্টে শোয়া, এসো রোদ্দুর দাদা
বিদেশ থেকে বর আসবে,—হাঁটু সমান কাদা!

(৩)

নৌকার মাঝি চারজনা হাল দাঁড় মোট তিনখানি
ছয় চোখ করে জল ঘোলা দুই চোখ মুদে রয় ধ্যানী!
সাদা পাল চায় পশ্চিমে যায়, না-এর গলুই দক্ষিণে
দুইজনা হাসে দুইজনা কাঁদে বায়ু চলে যায় পথ চিনে!
বিজ্লি হাসলো আকাশ দু'খান্ জল উঠে পড়ে গম্বুজে
কবি কয়, ওরে মূর্খ মাল্লা, ঘুমায়ে পড় গা চোখ বুজে।

(৪)

ছিল নিঝ্‌ঝুম পুষ্করিণী জলে নামলো কে?
এল যে আজ অভিমানিনী ওলো জোকার দে!
চাঁপার বন্ন ঠোঁট দু'খানি ভোমরা পানা অক্ষি
অভিমানিনী ঘাটে রইলে দেখবে না কাক পক্ষী।
বুক জ্বলে যায় আড় পানে চায়, যা না ঠাকুরঝি
অভিমানিনী একা নাইবে দেখবে এক সূয্যি।
ওমা ওমা সূয্যিও যে মুখ লুকিয়ে সাদা
চোখের মাথা খেয়ে রইলো মৌরলা আর চাঁদা!

চুনী-পান্না

অনেক শুনেছি তোমাদের নাকি কান্না
থামাও, আর না!
দেখো রোদ্দুরে ঘাসের ডগায় ঝলমলে
চুনী-পান্না!

বেগুন ভাজার মতো মুখখানা ঘুচিমুচি
ভুরু কোঁচকা
সিন্ধুবাদের মতন মাথায় সাড়ে
সাতমন বোঁচকা?
কেন গো তোমার ঠোঁটে ব্যাঁকা হাসি, চোখে
আগুনের ফুল্‌কি
যাকে পাও তার গায়ে এঁকে দাও নানা
নিন্দের উল্কি?

অনেক শুনেছি তোমাদের নাকি কান্না
থামাও, আর না
দেখো রোদ্দুরে পুকুরের জলে ঝলমলে চুনী-পান্না!

আজব নগর

হলদিয়া কি সন্দেশ, না
নতুন কোনো মিষ্টি?
হলদিয়া কি হলুদ শাড়ি
কিংবা কোনো রান্না!
সে-সব কিছু নয় নয় রে বাপু
এ যে আর-এক সৃষ্টি
জাহাজ ঘেরা আজব নগর
অঙ্গে চুনী-পান্না।

প্রশ্ন ও উত্তর

চাকরি পাবে মোহনকুমার সব-কিছু ঠিকঠাক
প্রথম দিনেই আছাড় খেয়ে নাক ফুলে জয়ঢাক!
দু' দিন বাদে অফিস গেলে কী হল তার দশা?
নাক-সরু এক স্বপনকুমার তার চেয়ারে বসা!
কেন এমন হল, আহা, কেন এমন হল
কোন দোষে হায় মোহনবাবুর চাকরিখানা গেল?

রকেট চালিয়ে বাঙালির ছেলে পাড়ি দেবে নাকি চাঁদে?
বিজয়কুমার পুরোপুরি রেডি, তবু কি ফ্যাসাদ বাধে?
জুতোয় একটা পেরেক উঠেছে, সে খেয়াল নেই তার
বেলুনের মতো ফোস্কা পড়ল পায়ে জুতো রাখা ভার
খালি পায়ে কেউ চাঁদে যায় নাকি, রকেট নিল না তাকে
বিজয়কুমার ফ্যালফ্যাল করে আকাশে তাকিয়ে থাকে!
কেন এমনটি হল যে আহা রে, কেন এমনটি হল?
বাঙালির কত নাম হত, তবু সুযোগ ফস্কে গেল!

লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল পুঁটিরাম
এইটুকু কাগজের পাঁচ লাখ টাকা দাম!
আহ্লাদে আটখানা হয়ে নাচে ধেই ধেই
টিকিটটা হাতে নিয়ে রাস্তায় নামে যেই
কোথা থেকে ঝড় এল, পুঁটিরাম নিঃস্ব
টিকিটটা পাখি হয়ে হল অদৃশ্য।
হায় হায় একী হল, এমনটি কেন হল?
পুঁটিরাম ভ্যাবারাম, সব টাকা জলে গেল!

উত্তর: সাড়ে এগারো বছর বয়েসে পর পর দু দিন তিনতলার
জানলা থেকে রাস্তায় আমের খোসা ছুঁড়ে ফেলেছিল কে?
মোহনকুমার, আবার কে?
দশ বছর তিন মাস বয়েসে একটা বেড়ালছানার গায়ে আলপিন
ফুটিয়ে দিয়েছিল কে? বিজয়কুমার, আবার কে?
তেরো বছর পাঁচ মাস বয়েসে এক বন্ধুর একটা ডিটেকটিভ গল্পের
বইয়ের শেষ পৃষ্ঠা চুপিচুপি ছিঁড়ে দিয়েছিল কে? পুঁটিরাম, আবার কে?
এতদিন পর সেই রাস্তা, বেড়ালছানা ও বই প্রতিশোধ নিল!

পেন্নাম

দুধের বরণ হাতির শুঁড়ে পারিজাতের মালা
আহা এমন রূপের ডালি কে যায় দুপুরবেলা।
ঘুম ঘুম ঘুম শালিক বলে, সবাই তোরা ঘুমো
এমন নরম রোদের ফোঁটা কপালে দেয় চুমো।
শির শির শির বাতাস হাসে, চোখ ভর্তি জলে,
টুকরো ছেঁড়া মেঘের তুলো ফিসফিসিয়ে বলে
বাবা আছেন যেমন তেমন—মায়ের বুক ফাটে
চল আমরা পালাই দূর সমুদ্দুর পাটে
ফুরফুরিয়ে ভাসল মেঘ বাতাস ছুঁয়ে-ছুঁয়ে
কাপড় কাচা জলের মতো আকাশ থাকে শুয়ে।

দুধের বরণ হাতির শুঁড়ে পারিজাতের মালা
আহা এমন রূপের ডালি কে যায় দুপুরবেলা!
নদীর জল খুশির তোড়ে বাজায় রিনিঝিনি
ঘাসের ফুল, শিশির ফোঁটা বললে যেন চিনি।
একটি সাদা কাশের গোছা বললে, পেন্নাম!
চিনি তোমায় হে মহারাজ, শরৎ তোমার নাম!

লুপুসুংশান

একদিন কেউ তোমাকে বলল, লুপুসুংশান!
তুমি কি ভাববে, এ কী উদ্ভট, লুপুসুংশান?
এর মানেটা কী? নাকি কিছু নেই, এমনিই যা-তা
ছেলেটাকে দেখে মনে হয় বুঝি ছিটভরা মাথা?
তা তো নয় ঠিক, আয়নার মতো ওর মুখখানি

দু’ চোখে হাসিতে যেন সে বলছে, পারবে না জানি!
কেন পারবে না? ভাবো ভাবো ভাবো, কুঁচকিয়ে ভুরু
ভাবনা-যুদ্ধে হেরে যাবে তুমি, বুক দুরুদুরু?

লুপুসুংশান কীরকম কথা, রুশ না ফরাসি?
এই পৃথিবীতে রয়েছে তো ভাষা কত রাশিরাশি
সংস্কৃত না সাঁওতালি, নাকি হিন্দি, মারাঠি?
শব্দটা কিছু গোঁজামিল, নাকি একদম খাঁটি?
কিংবা এমনও হতেও তো পারে, বাংলা বা চিনে?
গোটা-পঞ্চাশ অভিধান তবে আনবে কি কিনে?
দেখেশুনে যদি নানান ভাষার হরেক হরফ
মাথা বনবন, চাপাবে কি তবে ঠাণ্ডা বরফ?
লুপুসুংশান, লুপুসুংশান, শুনেছ কি আগে?
ভালো করে ভাবো, মনে কিছু সুর জাগে কিনা জাগে!

লুপুসুংশান পুলিশ কিংবা অতি পচামাছ?
গেলাস ভাঙার শব্দ? অথবা ন্যাড়া তালগাছ?
হারানো বোতাম, চিঠির বাক্স, পুতুলের বিয়ে?
মহা মুশকিলে পড়া গেল এই কথাটাকে নিয়ে
অ্যালজেব্রা না ঘড়ির অঙ্ক লুপুসুংশান?
ইতিহাসে কোনো শক-হূন দল, আর্য, কুষাণ?
এ কী এ কী এ কী, হাত-পা ঝাঁকিয়ে বলে, ধুত্তোর
হাল ছেড়ে দিলে? পারলে না আর দিতে উত্তর?

শোনো তবে বলি, এমন সহজ কথা বুঝলে না?
আর একটু মাথা চুলকে বুঝতে, এ যে খুব চেনা!
কেউ যদি এসে বলে হাসিমুখে লুপুসুংশান
তুমিও বলবে দু’ হাত বাড়িয়ে দুরুক দিটাং
আর যদি কেউ লুপুসুংশান বলে রাগ করে
তুমিও ঠোঁটটা বেঁকিয়ে বলবে ডিংফরগরে!

লুপুসুংশান এই শব্দের দু'রকম মানে
দুটোই সরল, তবে কথা এই যে-যেমন জানে।
লুপুসুংশান, লুপুসুংশান, কোন্ মানে চাও?
দুরুক দিটাং, ডিংফরগরে, নাও বেছে নাও!

মনে পড়ে সেইদিন

মনে পড়ে সেইদিন শ্রী নামে সিনেমায়
পথের পাঁচালী ছবি দেখা
সঙ্গে ছিল না কেউ, বৃষ্টি বাদলা ছিল
গোটা হল ঘরে যেন একা।
ভেতরেও বৃষ্টিতে ভিজ্‌ছে দুর্গা-অপু
মাঠে ঘাটে কাটে সারাবেলা
পুকুরের জল কাঁপে, বাতাসে সেতার বাজে
আকাশ ও পৃথিবীর খেলা।

একটু পরেই আর সিনেমা দেখি না আমি
নিজেই তো হয়ে গেছি অপু
কাশবনে লুটোপুটি, আরও দূরে যেতে যেতে
বাজাচ্ছি আম আঁটির ভেঁপু।
ইন্দিরা ঠাকরুণ আমারই তো বুড়িপিসি
মায়ের বকুনি খেয়ে হাসি
দিদির পেছনে আমি ছায়া হয়ে ঘুরিফিরি
পাঠশালা ফেলে ছুটে আসি।
বাবা বহুদিন নেই, আমাদের কিছু নেই
মায়ের আঁচলখানা ভিজে

ঠিক এরকম ছিল আমাদের ছেলেবেলা
বুঝেছি খিদের জ্বালা নিজে।

হঠাৎ আকাশ ভেঙে বাদলধারার মতো
আমার দু'চোখে নামে জল
এমনই কান্নায় ভেজা, কাঁপে বুক থরথর
চারদিকে আঁধার অতল।
হল ছেড়ে ছুটে যাই বাইরে একলা কাঁদি
আজও মনে পড়ে সেইদিন
তারপর বহুবার বলেছি সে স্রষ্টাকে
আমার চোখের জল নিন।

মনে পড়ে সেই দিন

সূচি

মামার বাড়ি যে অনেকটা দূর ৩৩৭, আমার খেলা ৩৩৮, ফুটবল ৩৩৯, মঙ্গলগ্রহে ৩৩৯, উল্টোপাল্টা ৩৪০, গ্রীষ্মের জয় ৩৪১, বাঘের মাসি ৩৪২, ছোট আর বড় ৩৪৩, কোহিমার যুদ্ধ ৩৪৩, অন্য ভাষায় কথা বলে ৩৪৪, দুই বোন ৩৪৫, সওদাগরের হরিণ ৩৪৬, তিনটি প্রশ্ন ৩৪৮, মাঠের মধ্যে ৩৫১

মামার বাড়ি যে অনেকটা দূর

মামা লিখেছেন, নতুন বাড়িতে
পাঁচটি পেয়ারা গাছ
আঙুর ফলেছে টুসটুসে থোকা থোকা
বাগানে ফুলের কত সাজগোজ
পুকুর ভর্তি মাছ
মা-বাবাকে নিয়ে কবে আসবি রে, খোকা?

মামিমার চিঠি আরও প্রাণ হরা
সোনালি কালিতে লেখা
যেন ফিসফিস কথা বলা কানে কানে
খোকন মনিরে, মন হু-হু করে
কবে হবে আর দেখা
আকাশে তাকিয়ে বসে থাকি এই খানে।

মামাতো বোনটি সদ্য শিখেছে
বাংলায় লেখা পড়া
দু'-তিনটে ভুল বানান লিখেছে মোটে
খোকা তুই এলে গল্প বলবো
শোনাবো নতুন ছড়া
এখানে সবাই গান শুনে জেগে ওঠে।
আমরা এখানে পাখির মতন
মাঝে মাঝে উড়ে যাই,
মধু খাই, আর দুধ দিয়ে দাঁত মাজি
ডালে ডালে ঝোলে কেক, সন্দেশ
যখন যা খুশি চাই
এসব শুনেও আসতে হবি না রাজি?

চিঠিগুলো পড়ে মন ভেঙে যায়
কী দারুণ সংকট
মামার বাড়ি যে অনেকটা দূর পথ
মঙ্গল গ্রহে যাওয়া কি সহজ
রকেট ধর্মঘট
এখন উপায় নিজস্ব মনোরথ!

আমার খেলা

ব্যাডমিন্টন শিখিয়েছিল পল্টু নামের বন্ধুটি
প্রত্যেকবার হারিয়ে আমায় হাসত মনের সুখে
ক্রিকেট খেলায় প্রথম দিনেই চক্ষু চড়ক গাছ হল
পঞ্চম বল এমন জোরে লাগল আমার বুকে।

ফুটবলে পা দিয়েছি ঠিকই, পা হড়কেছে অনেক
শোনা হয় না নিয়ম কানুন এত হরেক রকম
ফাউল করার জন্য নাকি আমার বেশ নাম ছিল
সেম সাইডে গোলটি করে সর্ব অঙ্গ জখম।

একটি মাত্র খেলায় আমি জয় পেয়েছি বারবার
যেমন তেমন খেলা সে নয়, কঠিন ডাংগুলি
সবাই বলত, এ আর এমন আশ্চর্যের কী আছে
ব্যাটাচ্ছেলের নামেই মিল, পদবি গাংগুলি!

ফুটবল

ফুটবলে ছিল বাঙালির খুব
হাঁক ডাক, চেনা নাম
চুনী-পিকে আর শান্ত, সুভাষ
ঘরে ঘরে উদ্দাম!

এখনও মোহন বাগান রয়েছে
মহামেডান, ইস্টবেঙ্গল
কারা খেলে, হায়, কিছুই জানি না
ক্লাব নামটাই সম্বল।

এতকাল ধরে ছিল বাঙালির
ফুটবলে কত গর্ব
ওগো মতিদাদা, তুমিই বলো না
কী করে বাঙালি
হয়ে গেল এত খর্ব?

মঙ্গলগ্রহে

মঙ্গলগ্রহে আছে
হুঁকো মুখো হিজবিজ
একা নয় দোকা নয়
চারিদিকে গিজগিজ!

হিজবিজ খিদে পেলে
হাসে শুধু ফিকফিক
যত মিছে কথা বলে
সব মেলে ঠিক ঠিক!

উল্টোপাল্টা

লঙ্কা গাছে বেগুন ফলে
চালতাগাছে আম
মাটির তলায় আলু কোথায়?
ছেঁড়া চিঠির খাম।
ব্যাঙ্কে নাকি টাকা থাকে?
আছে মাটির ঢেলা
মাটিই টাকা, টাকা মাটি
কে করছে এই খেলা?

মেঘ ডাকল কলকাতায়
বৃষ্টি হল মালদায়
নতুন মামী তেঁতুল পুঁতে
নিজের মাথায় জল দেয়।

এক যে ছিল বাহাত্তুরে
একদিন চাঁদ দেখে
কী যে হল নাইতে গেল
সাবান গায়ে মেখে।
তারপর সে হাত-পা ছুঁড়ে
ডুকরে কেঁদে ওঠে
বললে, বয়েস মাত্র বাইশ
দাঁড়াব এবার ভোটে!

গ্রীষ্মের জয়

দুপুরবেলায় পাখা ঘুরলেও প্রাণ হাঁসফাঁস
মধ্যরাতেও গরম কমে না মশা ঠাসঠাস।

একশো বছর আগেও এমনি ছিল এই দেশ
ঘামাচি, কলেরা, পান বসন্ত, কষ্ট অশেষ।

ছিল না বিজলি, ফ্রিজ-পাখা আর ঠান্ডা মেশিন
কী করে যে লোকে প্রবল গ্রীষ্মে বাঁচতো সেদিন

চামড়ায় জ্বালা, ফোঁড়ায় ফুঁ দেয় জনসাধারণ
বিদ্যাসাগর সে সময় লিখেছেন ব্যাকরণ!

সাহেবি পোশাক ভিজে জবজব, কুলকুল ঘাম
মাইকেল দেবী সরস্বতীকে করেন প্রণাম।

মেয়েরা মেঝেতে গড়ায়, শিশুরা করে ছটফট
বঙ্কিমবাবু লিখে ফেললেন আনন্দমঠ।

বীরভূমে হাওয়া আগুন ছড়ায়, ব্যাঙ চিৎপাত
তার মধ্যেই গানে সুর দেন রবীন্দ্রনাথ।
শিলাইদহেও গরম কি কম? ফুটিফাটা মাঠ
কথা ও কাহিনী লিখে চলেছেন কবি সম্রাট।

তা হলেই বলো, গরমই তো ভালো, ঘামের গন্ধে
অমর কাব্য লেখা হয় কত নতুন ছন্দে!

বাঘের মাসি

যারা কুকুর পোষে তারা পুষুক, তারা
পুষুক যত খুশি
আমরা একটা বেড়াল বড্ড ভালোবাসি
নামটাও তার পুষি।

পাশের বাড়ির কুকুর দুটো যমের দূত
নিষ্ঠুর মাংসাশী
আমাদের এই মোটকা পুষি গাবগুবাগুব
খাঁটি বাঘের মাসি!

কুকুর দুটো রাস্তা ভুলে এক বিকেলে
ওদের বাড়ি ছেড়ে
আমাদেরই ছাদে ঘুরছে জগাই মাধাই
আর বাঁচাবে কে রে!

দুই দিকে দুই নেকড়ে মুখো হামলে এল
এবার বুঝি মলুম!
ঠিক তখুনি সাদা বেগুনি রোঁয়া ফোলানো
পুষি ডাকল, হালুম!

বাঘের মাসি ঘোগের পিসি ছোট্ট পুষির
চোখে ছুরির ধার।
কুকুর দুটো কুঁইকুঁইয়ে লেজ গুটিয়ে
হল পগার পার।

ছোট আর বড়

একটু একটু ভয়ের রাত, অনেকখানি ঘুম
সন্ধেবেলায় ঝড় বাদল, দুপুরে নিঝ্‌ঝুম
চড়-বকুনি একটুখানি আদর অনেক বেশি
একটু একটু ঝগড়া-আড়ি অনেক মেশামেশি
পেয়ারা হবে একটু ডাঁশা নিটোল পাকা আম
পরীক্ষায় একলা লেখা পুজোয় ধুমধাম
ডিমের নুন এক চিমটে পায়েসে ঢালো গুড়
গলা সাধার সা রে গা মা থামলে সুমধুর
প্রসাদ পাবে শশা টুকরো বিয়েতে লুচি মন্ডা
কাঁচা লঙ্কা একাই একশো মুড়ি হাজার গন্ডা
দেশলাইয়ের একটা কাঠি তুলো বস্তা বস্তা
আসল হিরে এক খণ্ড পাথর অনেক সস্তা
চাঁদ ডুবলে দেখা যায় না জমকালো সূর্যাস্ত—
কবিতা বেশ ছোট্টমতন উপন্যাস মস্ত!

কোহিমার যুদ্ধ

একটি গ্রাম্য কিশোর একদিন নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়িয়েছিল।
নিঝুম দুপুর, শুনশান, আর সবাই ঘুমন্ত
পুকুরের জলের মতন সেখানে সব কিছু নিস্তরঙ্গ
শারদীয় ধান খেতের ওপর সেখানে বোমারু বিমানের ছায়া পড়ে না
শুধু দূরের উষ্ণ বাতাসে ভেসে আসে এক এক সময়
সামরিক হল্কা...
আল পথে একা একা হেঁটে যাচ্ছিল কিশোর ছেলেটি
পিঠে তার বাঁখারির তির ধনুক, হাতে গাছের ডালের বন্দুক

তার বুক ভরা জয়ের অভিমান
সে চলেছে এক মরণ-পণ যুদ্ধ যাত্রায়।
সে শুনেছে কোহিমায় লড়াই করছে ভারতীয় সৈনিকেরা
বলদৃপ্ত ইংরেজদের সঙ্গে শুরু হয়েছে স্বাধীনতার সংগ্রাম
তলোয়ার তুলে ছুটে আসছেন নেতাজি
কিশোরটিও ছুটছে, তাকে যেতে হবে, কোহিমায় যেতে হবে
কোহিমা কোথায়, কত দূরে তা সে জানে না
তবুও তাকে যেতে হবেই
সেতুবন্ধনের সময় যেমন গিয়েছিল এক কাঠবিড়ালি।

অন্য ভাষায় কথা বলে

নাম জিজ্ঞেস করলে বলে, সকাল কিংবা রোদ্দুর
সেই ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে
তেঁতুল গাছের তলায়
পুঁচকে ছেলে, ন-দশ বছর, ভয় ডর নেই চোখে
হাফ প্যান্টুল, সারা গা খালি,
পুঁতির মালা গলায়।

এ ছেলেটা কাদের বাড়ির? একলা কেন এল?
কোথায় যাবে তাও জানো না
মুচকি হাসি ঠোঁটে
ঠিকানা জানিস? মাথা দুলিয়ে বলল, ভূগোল বই
খুব শক্ত, পড়েছি আমি
তিনটে পাতা মোটে!
বাবা কে তোর? চোখ কুঁচকে ভারিক্কি ভঙ্গিতে
জানাল সে, সবাই জানে,

আষাঢ় মাসের মেঘ
ভাই বোন নেই? আছে আছে, পারুল আর চম্পা
বোঝা যায় না কিছুই শুধু
বাড়ায় উদ্বেগ!

কোন রাস্তায় এলি রে তুই? বলল, খুব ঢেউ
খিদে পায়নি? কী খেতে চাস?
বলল, ফুলের গন্ধ
গায়ে জামা নেই, শীত করে না? দেখিয়ে দিল মালা
এখান থেকে কোথায় যাবি!
বলল স্কুল বন্ধ।

ঐ ছেলেটার কথা শুনলে ঠিক মনে হয় ধাঁধা
আমরা সবাই একটা কথার এক মানেতে বাঁধা।

দুই বোন

রুমুনা: আমাদের সোনা নেই
রোদ্দুর সোনালি
ঝুমুনা: তাতে বুঝি মন ভরে
কী কথা যে শোনালি!
রুমুনা: আমরা খাইনি ভাই
জল ভরা সন্দেশ
ডুমুর, পেয়ারা, কলা
তাই খেয়ে লাগে বেশ!
ঝুমুনা: মোটেই না, শুধু ফল
খেয়ে আশ মেটে না

রোজ রোজ ডাল-ভাত
মাছ কেন জোটে না?
রুমুনা: আমাদের ছোট ঘরে
জ্যোৎস্নার মতো আলো
ফুরফুরে হাওয়া দেয়
তা যে কত লাগে ভালো!
ঝুমুনা: দূর দূর, ভাঙা ঘর,
গা-ঢাকে না কাপড়ে
শীতকালে হি হি করি
রোদ্দুরে গা-পোড়ে!
রুমুনা: যা পেয়েছি তাই ভালো
আর সব যাক গে
যার যেটা জোটে ভাই
লেখা আছে ভাগ্যে!
ঝুমুনা: ভাগ্য না কচু পোড়া
জীবন তো একটাই
না-পাওয়াটা মানব না
আমি চাই সব চাই!

সওদাগরের হরিণ

আমাদের এই ছোট্ট পাহাড়
বন-জংলায় ঢাকা
দিনের বেলা ফুলের বাহার
রাত্রে ছবি আঁকা।
পাহাড়খানার মালিক এক
বৃদ্ধ সওদাগর

একলা একলা ঘুমিয়ে থাকে
    বনের মধ্যে ঘর।
সওদাগরের বন্ধু শুধু
    একটা হরিণ ছানা
আমরা যাই যেখানে খুশি
    সেখানে যেতে মানা।
দূরের থেকে গাছের ফাঁকে
    কখনো দিয়ে উঁকি
ঠোঁটে কুলুপ, স্পিকটি নট
    ওদের কাণ্ড দেখি।

সওদাগর মন্ত্র জানে,
    যে-ই মন্ত্র পড়ে
হরিণ ছানা পদ্য বলে
    বাংলা অক্ষরে।
সেই হরিণের পদ্য কেউ
    শুনবে একটুখানি।
শুনেই মনটা খারাপ হবে
    আগের থেকেই জানি!

আমার খুব ইচ্ছে করে
    কলকাতায় যাব
মনের সুখে গড়ের মাঠে
    নধর ঘাস খাব।
মানুষ আসে পাহাড়-বনে
    কত ফুর্তি করে
বনের হরিণ শহরে গেলে
    অমনি কেন মরে?

তিনটি প্রশ্ন

এক

মানুষের শিশু দুধ খায় খুব
দুধ চাই খুব খাঁটি
সকালেও দুধ, বিকেলেও দুধ
দুধে ভরা থাকে বাটি।
মা'র দুধ খেয়ে পেট তো ভরে না
গোরুর দুধও যে চাই
গোরুর পা বেঁধে, বাছুর সরিয়ে
দুধ দোওয়া হয় তাই!
একদিন এক ছোট্ট বাছুর
মা'র কাছে শুয়ে বলে,
'তোমার দুধ তো ওরা নিয়ে যায়
আমার যে পেট জ্বলে!
ওরা যদি খায় আমাদের দুধ
আমরাও কেন তবে
মানুষের দুধ খাবো না বলো তো
তাতে কোনও দোষ হবে?'

দুই

বনের মধ্যে গাড়ির শব্দ
লোক আসে দলে দলে
ছুটির সময় বেড়াবার ধুম
ছুটে আসে জঙ্গলে।
কচি-কাঁচা আর বুড়ো-বুড়িরাও
বাবা, কাকা আর মামা

কত সাজগোজ, রোদের চশমা
কত না রঙিন জামা।
শহুরে মানুষ অরণ্যে এসে
এদিক ওদিক ছোটে
ঝোপ-ঝাড়ে কোনও হরিণ দেখলে
হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে।
একদিন এক হরিণ শাবক
জিজ্ঞেস করে মাকে,
'আমরাও কেন বেড়াতে যাই না
যে শহরে ওরা থাকে?'
মা-হরিণ বলে, 'চুপ চুপ চুপ—
করিস না পাগলামি!'
হরিণ শিশুটি তবুও মানে না,
'কী ভুল বলেছি আমি?
ওরা এসে কত ডালপালা ভাঙে
ছেঁড়ে ফড়িং-এর ডানা
আমরা শুধুই শহরে বেড়াব
তাতেও রয়েছে মানা?'

তিন

ট্রেনে ভিখিরির টিকিট লাগে না
কত জালিয়াত, চোর
দিব্যি আরামে দূরে দূরে ঘোরে
অনেক রাত্রি ভোর!
ফিরিয়ালা আর মন্ত্রীমশাই
বিনা টিকিটেই যান
সাধু সেজে নাও, টিকিট চাই না
ধরো একখানা গান!

কিংবা যদি-বা হও তুমি কোনও
রেলবাবুদের ছেলে
বিনা ভাবনায় হিল্লি-দিল্লি
যখন ইচ্ছে গেলে।
ক্লাস সেভেনের একটি ছাত্র
জিজ্ঞেস করে মাকে,
‘এবার ছুটিতে কানপুর যাব?
দিদি কানপুরে থাকে।’
মায়ের মুখটা ম্লান হয়ে গেল
বললেন চোখ ঢেকে,
‘ট্রেনের ভাড়া যে অনেক রে খোকা
টাকা পাব কোথা থেকে?
তোর বাবার যে চাকরিটা গেছে
অভাবের সংসার
দু’ বেলা অন্ন জোটানোই দায়
সাধ্য কী বেড়াবার!’
ছেলেটি বলল, ‘দিদির জন্য
মনটা কেমন করে
দিদির মেয়েটা কত দিন ধরে
ভুগছে প্রবল জ্বরে।
টাকা নেই, তাই পারব না যেতে
মুখ করে থাকি কালো
এর চেয়ে চোর, ভিখিরি কিংবা
ফিরিয়ালা হওয়া ভালো?’

মাঠের মধ্যে

মাঠের মধ্যে নামল বৃষ্টি হঠাৎ বৃষ্টি
দারুণ বৃষ্টি
যেতে হবে আরও দূরে
ফিরব বাড়িতে নিজের বাড়িতে ছোট্ট বাড়িতে
বহুদিন পর
বহু দেশ ঘুরে ঘুরে।

মেঘ কালো কালো মেঘের যুদ্ধ, হুংকার দেয়
মেঘের দৈত্য
কিছুই যায় না দেখা
কোন পথে যাব, পথ মুছে গেছে, পথ ভোলা এক
নিঝুম পথিক
মাঠের মধ্যে একা!

এমন দেয়াল, সামনে দেয়াল, দু'পাশে দেয়াল
মাথা ঠুকে যায়
কঠিন অন্ধকারে
কোথায় আকাশ, ওপরে বা নীচে, দু'পাশে আকাশ
পৃথিবী ডুবছে
আকাশের পারাবারে।

আর দেরি নেই, পথ চিনে গেছি, আর দূর নেই
আকাশে এখন
হোক না বজ্রপাত
এই তো আসছি, সাঁতরে আসছি, লাফিয়ে আসছি
সব বাধা ঠেলে
ধরব মায়ের হাত!

সংযোজন: ছড়া

সূচি

বিকেল ৩৫৫, তোমার জয়জয়কার ৩৫৫, মুরারই গ্রামে আজ ৩৫৬, বাইশে শ্রাবণের আগে ৩৫৭, সিংহ-কাহিনি ৩৫৮, সত্যি কি রবি ঘোষ আকাশটা চেটেছে ৩৫৮, নামকরণ ৩৬০, সরল গাছের ছায়া ৩৬১, দূর থেকে দেখা ৩৬২, উল্টোপাল্টা ৩৬২, কানা শালিকের গান ৩৬৩, কবে যে আমি বড়ো হব ৩৬৪

বিকেল

বিকেলগুলো হলুদরঙা ফুলের মতো যেন
বাড়ি ফেরার পথের ধারে ঝলমলিয়ে ফোটে
এক-একদিন ছুটির ঘণ্টা দেরিতে বাজে কেন?
বিকেল-ফুলের গন্ধে মন ছটফটিয়ে ওঠে।

খেলার মাঠ হাত বাড়িয়ে সবার নামে ডাকে
মেঘেরা খেলে অনেক খেলা আকাশ জোড়া মাঠে
হঠাৎ যেন আঁধার আসে পশ্চিমের বাঁকে
নানান রঙ কুড়িয়ে নিয়ে সূর্য যান পাটে।

কি নিষ্ঠুর অন্ধকার, বাজপাখির মতো
বিকেলটাকে এক নিমেষে উড়িয়ে নিয়ে যায়
সন্ধে নামে গাছের ফাঁকে পাখিরা ক্রমাগত
একই সুরে সকলে মিলে ঘুমের গান গায়

বিকেল ফুল, হলুদ ফুল, আজ ঘুমোও তুমি
এবার আমি বাড়িতে ফিরে যাবো বইয়ের দেশে
কোথায় আছে পাহাড় নদী সাগর মরুভূমি
আবার যেন দেখি তোমায় কাল ছুটির শেষে...

তোমার জয়জয়কার

মাউজ মানে আর ইঁদুর নয়
উইন্ডোও নয় জানালা
নেট মানে আর মশারি নয়
উলটে গেছে বাংলা।

কি বোর্ডে কোথায় চাবি
খুঁজে নাও যা প্রাণ চায়
কম্পিউটার দেখায় ছবি
কম্পিউটার গান গায়

কম্পিউটার টিকিট কাটে
আরো কত কী পারে
যা নেই মহাভারতে তাও
পাবে কম্পিউটারে

কম্পিউটার হে তোমার
জয়জয়কার আজ
আমি যখন ঘুমোই, তুমি
করে যাও সব কাজ!

মুরারই গ্রামে আজ

মুরারই গ্রামে আজ দেখি খুব হই আর চই
মাছ, এত মাছ, আর কিছু নেই শুধু মাছ-বই
খালে-বিলে পুকুরেও ইলিশেরা ঝাঁকে-ঝাঁকে সই
ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টিতে গাছে ওঠে বড়-বড় কই!

বেহালার বড় চাচা লিখেছেন মোটামোটা বই
মুরারই গ্রামে বাস, বয়েসই তো হল নব্বই
বাপ-দাদা, মা-বোনেরা খায় ফেনাভাত, গুড়, খই
পুঁটি আর ট্যাংরার চেয়ে ভালো ঘরে-পাতা দই!

মুরারই গ্রামে আজ মানুষের ঘাড়ে-ঘাড়ে মই
যার মই নেই তার উইধরা ঢেঁকিটাই সই
গাছে-গাছে, ছাদে-ছাদে, কই গেল ইলিশ ও কই
বউ-ঝিরা বলে তেড়ে, আমরাও কেন তবে ঘরে বসে রই!

মিজানুর চাচা বলে, কেন শুনি চারদিকে এত হইচই
মুরারই গ্রামে কেন এল এত ইলিশের ঝাঁক আর কই
ইলিশ খাইনি কভু, যদিও বয়েস হল পঁচানব্বই
কিনে আন চেখে দেখি! হায় চাচা, সব শেষ, তুমি খাও দই
আর লিখে যাও বই!

বাইশে শ্রাবণের আগে

হায়রে শহর, প্রাণের শহর
মেলে রেখেছিস হাঁ
পথে ও বিপথে আঁধার আদাড়
টেনে নিয়ে যায় পা।

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চাঁদ ঢেকে যায়
গলিতে ঘুমোয় দিন
পাখিরা ডাকে না, মশারা রেখেছে
সকলকে পরাধীন!

হায়রে শহর, প্রাণের শহর
কবিতায় মুড়ে রাখা
এত ভালোবাসা দিতে চায় যারা
তাদেরও যে বুক খাঁ খাঁ।

সিংহ-কাহিনি

দুর্গা ঠাকুর পুজোর সময় সঙ্গে আনেন সিংহটাকে
সারা বছর সে সিংহটা একলা একলা কোথায় থাকে?
কার বাড়িতে? চিড়িয়াখানায়
জঙ্গলেই তো তাকে মানায়
কিংবা সে কি খেলা দেখায় সার্কাসে কোন এক ফাঁকে?

মহিমবাবুর সার্কাসে এক সিংহ ছিল এককালে
মুখটা ছিল হাঁড়ির মতন, চুন-কালি তার দুই গালে।
প্রত্যেকদিন সে সিংহটা
খেত একটা ছাগল গোটা
ব্যবসাপাতি মন্দ এখন, ভাত-রুটি খায় সক্কালে!

পুজোর আগে মা দুর্গার ছোট্ট ছেলে কার্তিকটা
সিংহের খোঁজে ও যে কতবার যায় উত্তর, পুব দিকটা।
সিংহ পাওয়া সহজ নাকি
খানিকটা রং, অনেক ফাঁকি
সব্বাই বলে এ বছর যা তা, আগের বছরই ছিল ঠিকটা!

সত্যি কি রবি ঘোষ আকাশটা চেটেছে?

সীতানাথ বন্দ্যো'র এক মাসতুতো ভাই
মনে ভাবে আকাশটা চেটে দেখা চাই
বলে গেছে সীতানাথ, হলে পরে বৃষ্টি
টকটক থাকে নাকো, আকাশটা মিষ্টি
কাল রাত ভরে এত বৃষ্টির ঝমঝম

আজ তবে দেখা যাক স্বাদখানা কী রকম
ফটফটে নীল রং কিছু ঢাকা কুয়াশায়
যে ছেলেটা চেয়ে থাকে বুক ভরা দুরাশায়।

তার নাম রবি ঘোষ, নাম শুনে চেনা যায়?
তখনো সে বেশ ছোট, নামেনি তো সিনেমায়।
মোটে বারো, ছোটখাটো, ইশকুলে ফাঁকিবাজ
লেখাপড়া ছাড়া তার আছে আরও কত কাজ
এক পরি তার চেনা, ভূত টুত মানে না
পরি কত কথা বলে, অনেকেই জানে না
সেই পরিটির নাম মিনিমিশু মানতা
এরকম নাম কেন পরিরাই জানে তা!

রবি বলে, মিনিমিশু আজ তুমি একবার
মেঘ আর নীল রং যেখানেতে একাকার
সেইখানে নিয়ে চলো, লক্ষ্মীটি, সোনামন
মিনিমিশু বলে, আহু, সিটিকোনা সাটুবোন!
এরকমই ওর ভাষা, আরও সব পরিহুরি
বাংলা পড়ে না, বলে ইংলিশ তবু পড়ি!

যাইহোক, শেষমেশ মিনিমিশু রবিকে
বাতাসের সাথে ওড়া মন্ত্রটা দিল লিখে
টুবি আর নট টুবি টুং টাং কিংকিনা
এটুকুই জানি শুধু, জানি না তা ঠিক কিনা।
অতি ভোরবেলা রবি উড়ে গেল আকাশে
আর কেউ দেখল না, কেননা যে একা সে।

সত্যি কি রবি ঘোষ আকাশটা চেটেছে
মেঘ আর নীল রং ঠোঁটে জিভে মেখেছে?
আমরা সবাই জানি, আকাশটা কিছু না

শুধু চোখে ধাঁধা লাগে, শূন্যের বিছানা
কিছু নেই তাই নীল, এটাই তো বিজ্ঞান
রবি কি জানে না তাও, এতই সে অজ্ঞান?
পরি টরি সব ভালো আরও কম বয়েসে
বয়েস দ্বাদশ হলে রূপকথা হয় সে!

এরপর দুটি মাস রবি হয়ে গেল হাওয়া
ইশকুলে দেখা নেই, পথে নেই আসা-যাওয়া
বাড়িতেও খোঁজ নেই, নেই কোনো শব্দ
রবি বুঝি সবাইকে করে গেল জব্দ!

নামকরণ

একটা পেঁচা রেগে আগুন তেলে বেগুন
　　চোখ পাকিয়ে আছে
আমার নামটা কে রেখেছে? ধরে আন তো
　　তাকে তেঁতুল গাছে!
শকুন বললে, আমি তো ভাই কোনও খেলার
　　জানি না জুয়া চুরি
দুর্যোধনের মামার সঙ্গে আমার নাম
　　কে দিয়েছে জুড়ি?
শেয়াল বলল, শোনো সবাই, এখন থেকে
　　আমার নাম শ্রীগাল
ডাক নামে কেউ ডাকে যদি কামড়ে দেব
　　মজা বুঝবে কাল!
ঘোড়ার থেকে একটু ছোট সেই দুঃখে
　　নামটি বোকা গাধা

গান গাইতে বড্ড ভালো লাগে তবু
নিষেধ গলা সাধা!
কোকিল বলল, যা বলো তাই বলো আমায়
সবাই বাসে ভালো
কাকের সঙ্গে তুলনা কেউ দেয় না ভাই
যদিও রং কালো।
মোরগ বলল, ফুলের সঙ্গে নামের মিল
হল না এ জীবনে
আপন মনে ফুটে উঠে ঝরে যেতাম
গভীর কোনও বনে!

সরল গাছের ছায়া

এ ঘরের ভুল ও ঘরে লুকিয়ে রাখি
বিকেলের আলো আধো হাসি দিয়ে ডাকে
চিঠি জয়ে যায় পলকা বছর পেরিয়ে
কপালের ভাঁজে জমে আছে বহু কাজ।
সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে পতনের মূর্ছনা
পাতাল জেনেছে আসন্ন উৎসব
বড় পিছু টান কুসুম হাতের মায়া
রূপের কাঙাল জন্মান্ধের যমজ।
কথা ছিল যেন এ জীবনে কিছু চেনা
আকাশ ভাঙল নীলিমার নৈরাজ্য
একটি দেখার বিপরীতে এত ভ্রান্তি
জলের উপর সরল গাছের ছায়া।

দূর থেকে দেখা

ঘরের জন্য মানুষ, না মানুষের জন্য ঘর
গৃহিণী আর কর্তামশাই, বাচ্চাদের কল কণ্ঠস্বর
এই নিয়েই তো ঘরের প্রাণ
যখন তখন গান
নতুন রং, খাট-বিছানা, স্বপ্ন লেগে থাকে
দুষ্টু সোনামণি কখন হাতের ছাপ আঁকে
ভোরের আলো, বিকেলবেলায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া
ভালোবাসার মানুষজন করছে আসা যাওয়া
রান্নাঘর, ঝুলবারান্দা, ব্যস্ত হয়ে ঘোরা
আলাপ করতে এসে পড়ল পাশের বাড়ির ওরা
প্রতিটি দিন নতুন দিন ঘুম ভাঙার পর
ঘরের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ঘর!
ঘরের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ঘর!

উল্টোপাল্টা

শুধু বৈশাখ মাসে
বরফ পড়ে কলকাতায়, সারা দুনিয়া হাসে
হাসেন না শুধু একজন
তিন বছরে একটি বার তাঁর হাসির রেশন।
ইস্কুলে হয় লঙ্কা চাষ
ইঁদুর খায় গোলাপ ফুল, ছিঁচ কাঁদুনে পাতি হাঁস
ফুটবল খেলা দেখতে চান
রসগোল্লার লোফালুফি ঘটি-বাঙাল-মুসলমান।
লেকের ধারে মস্ত ইঁটের পাঁজা

সাধুরা পান বেকার ভাতা, বেকাররা টানে গাঁজা।
রুমাল খানা ডোবাও যদি জ্যোৎস্না মাখা চাঁদে
বিয়ে নিষেধ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে লবণ হ্রদে।
চাঁদের কথায় নতুন বৃন্দাবন
আ-আ-আ মোদের সব হতে আপন!

কানা শালিকের গান

চালতাতলায় ঝাঁকড়া একটা ফুরুশ ফুলের গাছের কাছে
কানা শালিকটা সকাল থেকেই সেখানে লুকিয়ে আছে।
ডাক শুনে তার বোঝাই যায় না, মনের সুখে না কান্না
সে ডাক শুনে শংকা মাসি নদীর ধারেও যান না
নদীর নাম অজয় তার রাগ হয়েছে ভারি
এই বর্ষায় দু'পার ভেঙে সে এক কেলেংকারি
আস্ত একটা পুরুষ, তবু সবাই বলে নদী
তাই তো গণেশ উল্টে গেল আত্মারামের গদীর।
আত্মারামের মামাতো ভাই মুরারইতে থাকে
রোজ সকালে সব পাখিদের পাখির ভাষায় ডাকে।
রামপুরহাট থেকে মদন এল চালতাতলায়
কানা শালিকটা তখনো ডাকছে প্রচণ্ড জোর গলায়
আত্মারামের মামাতো ভাই যে-ই না এসে ধরতে গেল গান
কী যে হল, চুপসে গলা, চক্ষু উল্টে অজ্ঞান।
কানা শালিকটা এবার ফুরুৎ ছুটল নদীর ধারে
ধর ধর ধর সবাই বলল, কেউ গেল না ওদিকে অন্ধকারে।
মামাতো ভাই চোখ রগড়ে উঠল একটু পরে
কী হল রে, কানা শালিকটা... সবাই মিলে শুধোয় সমস্বরে
সেদিন থেকে মামাতো ভাই ভুলেই গেল কথা বলার ভাষা
দিনরাত্তির গান গায়, মাথার চুলে শালিক পাখির বাসা!

কবে যে আমি বড়ো হব

কবে যে আমি বড়ো হব
দাদার মতন লম্বা হব

কবে যে আমি বড়ো হব
বাবার মতন প্যান্ট পরব

কবে যে আমি বড়ো হব
একলা একলা খেলতে যাব

কবে যে আমি বড়ো হব
পার্কে গিয়ে ফুচকা খাব

কবে যে আমি বড়ো হব
মোটা মোটা বই পড়ব

কবে যে আমি বড়ো হবে
ভূত-পেতনির ঝুঁটি ধরব

কবে যে আমি বড়ো হব
ঘোড়ায় চড়ব, গাড়ি চালাব

কবে যে আমি বড়ো হব
সব বড়োদের ফিলম দেখব

কবে যে আমি বড়ো হব
সন্ধের পর বাড়ি ফিরব

কবে যে আমি বড়ো হব
ছোটভাইটার পড়া ধরব

কবে যে আমি বড়ো হব
দেশ-বিদেশে ঘুরতে যাব

কবে যে আমি বড়ো হব
বড়ো অফিসে কাজ করব

কবে যে আমি বড়ো হব
ছোটো ছেলেদের তুমি বলব

যখন আমি বড়ো হব
সত্যিকারের বড়ো হব

একটা কিছু করতে হবে
যাতে নিজেই শান্তি পাব

যদি-বা দেখি আমার পাশে
কেউ দুঃখে কাঁদছে বসে

তার চক্ষের জল মোছাতে
পারব না কি বড়ো বয়সে?

কাব্যপরিচয়

ভালোবাসা খণ্ডকাব্য

দ্বিতীয় মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০১০। পৃ. ৭২। মূল্য ৮০.০০
প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০০
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
উৎসর্গ: পিনাকী ঠাকুর/ও/ শিবাশিস মুখোপাধ্যায়-কে

বাংলা চার অক্ষর

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৩। পৃ. ৬৪। মূল্য ৬০.০০
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
প্রচ্ছদ: কৃষ্ণেন্দু চাকী
উৎসর্গ: মুনিয়া ও গৌতম দত্ত-কে

যার যা হারিয়ে গেছে

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৫। পৃ. ৭২। মূল্য ৭৫
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুব্রত চৌধুরী
উৎসর্গ: অনিন্দিতা ও রূপক চক্রবর্তী-কে

শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডা

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৭। পৃ. ৮০। মূল্য ৮০.০০
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: বিপ্লব মণ্ডল
উৎসর্গ: সেই আড্ডার আড্ডাধারীদের

প্রাণের প্রহরী

প্রথম প্রকাশ: মাসিক শারদীয় কৃত্তিবাস, ১৩৮৩

ভূমিকা: স্টপ প্রেস: এই নাটকটির অনেক সংলাপ ছন্দ মিলে লেখা। ছাপাখানার ভুল বোঝাবুঝিতে সব গদ্যের মতন হয়ে গেছে। কারুর গোয়েন্দাসুলভ তীক্ষ্ণ চোখ থাকলে অন্ত্যমিলগুলি খুঁজে দেখতে পারেন।

একেবারে শেষে লেখা ছিল: এই কাব্য নাটকটি কেউ অভিনয় করতে চাইলে আগে লেখকের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। অভিনয়ের সময় লাইনগুলি, কবিতার মতন নয়, গদ্যের মতন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উচ্চারণ করতে হবে। এবং দক্ষিণাস্বরূপ লেখককে দিতে হবে একটি নীল রঙের জামা।

মালঞ্চমালা

প্রথম প্রকাশ: বইমেলা জানুয়ারি ১৯১৪। পৃ. ৪৬। মূল্য ২০.০০
দে'জ পাবলিশিং
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: কৃষ্ণেন্দু চাকী
উৎসর্গ: দেবাশিস আর রত্নারানী শী-কে/ স্নেহ উপহার

আ চৈ আ চৈ চৈ

প্রথম সংস্করণ: বৈশাখ ১৩৩৯। পৃ. ৪০। মূল্য ২৫.০০
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: কৃষ্ণেন্দু চাকী
উৎসর্গ: শাম্মী, মিতি, শিল্পী, সীমা, ডোরিস, সুমাইয়া,/সামি, রাজীব, সইফ, সজীব, আরফি, আসিফ,/অমিত, লিজা ও শানু.../ বাংলাদেশের অল্পবয়েসী বন্ধুদের

মনে পড়ে সেই দিন

প্রথম প্রকাশ: ১ বৈশাখ ১৪০৮। পৃ. ২৪। মূল্য ৩০.০০
পত্র ভারতী
প্রচ্ছদ: সন্দীপ দাশ
অলংকরণ: জুরান নাথ
এই গ্রন্থের খাদ্যাখাদ্য এবং আজব নগর কবিতাদুটি আ চৈ আ চৈ চৈ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

ছড়া

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১২। পৃ. ৮০। মূল্য ১০০.০০
দে'জ পাবলিশিং
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: দেবাশিস রায়
উৎসর্গ: স্নেহের উপাসনা দাশগুপ্তকে/একটু বড়ো হয়ে পড়বার জন্য

প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি

প্রথম পঙ্‌ক্তি	কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থ	পৃষ্ঠা
অনেক শুনেছি...	চুনী-পান্না	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩২৮
অরুণাংশু ভেবেছিল,...	অগ্নিকাণ্ড	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৩৯
আ চৈ, আ চৈ চৈ,...	আ চৈ, আ চৈ চৈ,...	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩০৬
আজ দশতলার জানলায়...	সার সত্য	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২১২
আড্ডা যখন ক্রমে জমে...	সবই অসমাপ্ত	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২১৪
আমাকে ধরো ধরো,...	আমাকে ধরো ধরো	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	১৭
আমাদের এই ছোট্ট পাহাড়...	সওদাগরের হরিণ	মনে পড়ে সেই দিন	৩৪৬
আমার আছে একটা...	দেওয়া-নেওয়া	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩২১
আমার উপহার পাওয়া...	চোখের এক পলক	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৫৩
আমার একত্রিশতম...	জীবনের আত্মজীবনী	বাংলা চার অক্ষর	১০৪
আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রী,...	সর্বহারা অবিশ্বাসী	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৩৩
আমার বাবার ঠাকুরদাদা	পায়ের তলায় সর্ষে	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩১৯
আমার সেই অরণ্য প্রবাসে,	ধ্যান ভঙ্গ	বাংলা চার অক্ষর	১০৬
আমি এখন কী করব,...	উত্তর নেই	যার যা হারিয়ে গেছে	১৮৫
আমি কি প্রাণ দেব?...	শেক্‌সপিয়ারের অপ্রকাশিত...	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৬৭
আমি যতবার এসেছি...	সমস্ত দেহতত্ত্ব তুচ্ছ...	যার যা হারিয়ে গেছে	১৮৪
আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,...	মানুষের ডানা	যার যা হারিয়ে গেছে	১৬৬
আয় মন বেড়াতে যাবি	এক সন্ধে থেকে...	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২০৩
আর দূরে নেই স্বর্গরাজ্য,...	একটি গানের খসড়া	বাংলা চার অক্ষর	১২৯
আরে ছি ছি ছি ছি ছি,...	বড় মানুষের ঝি	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৪০
ইথাকা নগরীর এক...	সাতাশ শতাব্দী পর	যার যা হারিয়ে গেছে	১৪৪
উত্তর দেব ভেবে...	চিঠির উত্তর	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৩২

প্রথম পঙ্‌ক্তি	কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থ	পৃষ্ঠা
এ ওকে চায়, সে তাকে...	ধাঁধা	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৪১
এ কোন ঘাটে নৌকো...	এ কোন ঘাটে	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৪৫
এ ঘরের ভুল ও ঘরে...	সরল গাছের ছায়া	সংযোজন: ছড়া	৩৬১
এ ভাঙা মন্দিরে দেবতা...	সিঁড়িতে বসে আছে...	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২১৯
এ যেন পাহাড়ের ওপরে...	পাহাড়ের রেলগাড়ি	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২০১
এই তো সময় সব কিছু...	এই তো সময়	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২১৮
এই তো সেদিন তেজী,...	বাঁশির শব্দ	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	১৯
এক একদিন ঘুম ভাঙলে...	এক একদিন	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২০৯
এক দেশে এক রাজা...	—	মালঞ্চমালা	২৭৫
এক ফোঁটা অন্ধকার দিয়ে...	আকাশ দেখার...	যার যা হারিয়ে গেছে	১৭৬
এক যে ছিল দোকানদার	দোকানদারের নাতনী	আ চৈ আ চৈ চৈ চৈ	৩২২
এক যে ছিল পাথর,	বিন্দু বিন্দু	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	২৫
এক লাফে বোম্বাই পাঁচ...	কায়দাটা শিখে নেবে?	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩১০
একজন অসাবধানী নারী...	বারান্দার নীচে	যার যা হারিয়ে গেছে	১৮৬
একজন ফুলচাষী এখন...	দুঃখ	যার যা হারিয়ে গেছে	১৬৫
একটা দেশ ছিল, মা...	সহসা ফিরে দেখা	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৪৭
একটা নদী হারিয়ে গেল	বৈশাখের পয়লা...	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩২৪
একটা পেঁচা রেগে আগুন...	নামকরণ	সংযোজন: ছড়া	৩৬০
একটা মেল ট্রেনের হঠাৎ...	শিল্প ও ছন্দপতন	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	১৬
একটা লেখা, আরও...	লেখা আর ঘুম	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৩৪
একটি গাছ ফুলের বদলে...	দুটি গাছ	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৩৯
একটি গ্রাম্য কিশোর...	কোহিমার যুদ্ধ	মনে পড়ে সেই দিন	৩৪৩
একটি মানুষ কালো...	রাজ-যোটক	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩২৬
একটু আগে কী বলছিলে?	শুধু একটি ঝলক	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৩৮
একটু একটু ভয়ের রাত,...	ছোট আর বড়	মনে পড়ে সেই দিন	৩৪৩
একদিন কেউ এসে বলবে,...	দেখা	যার যা হারিয়ে গেছে	১৫৭
একদিন কেউ তোমাকে,...	লুপুসুংশান	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩৩১
একদিন গাছেরা মানুষের...	সেই একদিন	যার যা হারিয়ে গেছে	১৮৯
একদিন ঘোর বর্ষার দিনে...	সাত-পাঁচ ভাবনা	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩০৭
একদিন যারা খুব...	আচমকা চোখে জল	বাংলা চার অক্ষর	১৬১
একবুক জলের মধ্যে...	পাখির চোখে দেখা ১	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২২৯
একলা একলা বসেছিলুম...	নদীর ধারে একা	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩১১
এখন অনেকের সঙ্গে দেখা...	জানলার কাছে...	শ্যামবাজারের মোড়ের...	১৯৫

প্রথম পঙ্ক্তি	কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থ	পৃষ্ঠা
এখন আকছার খুব...	নাভি কাব্য	যার যা হারিয়ে গেছে	১৬৯
এখানে ওখানে জ্বলছে...	কথা দেওয়া আছে	বাংলা চার অক্ষর	৯০
এত পলিউশন খাচ্ছি...	এই রাত শেষ হতে	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৩৮
এদিকে মা, ওদিকে মেয়ে	একশো হাজার ঢেউ	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২২৮
এমন বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি...	বিন্দু বিন্দু	যার যা হারিয়ে গেছে	১৮৭
এরপর অর্জুন বললেন,...	অর্জুনের সংশয়	যার যা হারিয়ে গেছে	১৩৮
এসো	শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত	যার যা হারিয়ে গেছে	১৫৪
এসো, এবার সবাই...	নিতান্তই একজন...	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	২০
ওকে অন্য একটা সেঞ্চুরি...	বাংলা চার অক্ষর	বাংলা চার অক্ষর	৯৪
ওদের একটু চুপ করতে...	স্থির মুহূর্ত	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৩৪
ওভার ব্রিজের রেলিং...	চাঁদমালা	যার যা হারিয়ে গেছে	১৩৯
ওরা একটা বোমা...	ওরা	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৪৯
ওরা জঙ্গলে থাকে, কিন্তু...	জানতে ইচ্ছে করে	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৪৬
কতকগুলো সদ্যযুবা...	শ্যামবাজারের মোড়ের	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২২৩
কবি, এবারে সত্যি করে...	প্রেম বিষয়ক কিছু...	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৪২
কবিতা লেখার আগে চুপ...	মনে পড়ে...	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২০৮
কবে যে আমি বড়ো হব	কবে যে আমি বড়ো...	সংযোজন: ছড়া	৩৬৪
কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার...	আলাদা আয়না	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৪৪
কাছাকাছি সব কিছুর মধ্যে...	কল্পান্তের আগে	বাংলা চার অক্ষর	১০৯
কাল সারা রাত ধরে...	মায়ের চিঠি	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৪৫
কী মুস্কিল, একটা ঠিকানা...	ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৪৫
কুমারী মেয়েরা...	কুমারী মেয়েরা...	বাংলা চার অক্ষর	৮৬
কেন সেই দিনটির...	আয়নার মানুষ...	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৫০
কোথাও একটা হুড়মুড়িয়ে...	হিমালয়কেও দেখা...	বাংলা চার অক্ষর	১১৬
কোন ঘাটে যাবি রাধা...	রাধা	বাংলা চার অক্ষর	১১৮
খবরের কাগজের পৃথিবী...	হে মরুভূমির পথিক	যার যা হারিয়ে গেছে	১৪৭
খাবার টেবিল, পাঁচটি মুখ,...	নীরব সংসার	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৫৪
খুব ইচ্ছে করে আমি...	উপমা ও উপমেয়	যার যা হারিয়ে গেছে	১৫৯
খেলাচ্ছলে খেলা তো নয়	খেলাচ্ছলে খেলা...	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩০৯
খেলার নাম ধুন্ধুমার	খেলার নাম	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩১৮

প্রথম পঙ্‌ক্তি	কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থ	পৃষ্ঠা
গোড়ালি-ডোবা কাদার...	বহুরূপীর গীতা	বাংলা চার অক্ষর	৯১
ঘরের জন্য মানুষ, না...	দূর থেকে দেখা	সংযোজন: ছড়া	৩৬২
ঘুরতে ঘুরতে রাস্তার...	শিবঠাকুরের আপন...	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩১৭
চড়াই পাখিরা গাছে...	চড়াই পাখিরা...	যার যা হারিয়ে গেছে	১৫০
চলো যাই চলো যাই...	সে তো শুধু রূপকথা	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৫০
চাকরি পাবে মোহনকুমার...	প্রশ্ন ও উত্তর	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩২৯
চাকরির দরখাস্ত হাতে...	রাজকুমারী ও এক...	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	২৪
চালতাতলায় ঝাঁকড়া...	কানা শালিকের গান	সংযোজন: ছড়া	৩৬৩
চিঠিতে তোমাকে...	সম্বোধনে মরীচিকা	বাংলা চার অক্ষর	৯৯
চুম্বন শুধু অধরে ওষ্ঠে...	চোখ এবং হাত,...	যার যা হারিয়ে গেছে	১৪৪
ছন্দে লিখতে চাইনি,...	ছন্দ-মিলের বন্দনা	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২০২
ছন্নছাড়া বিকেল একটা...	চক্ষে গোলকধাঁধা	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৪০
ছায়া সিনেমার মঞ্চে...	কবির উপহার	বাংলা চার অক্ষর	১২০
ছায়ার পায়ে পায়ে...	কলম অসহায়	বাংলা চার অক্ষর	৮৮
ছেলেবেলার নদীর ধার...	আমার প্রিয় জামা	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৩১
ছোট ছোট আয়নাগুলো...	আমার বয়েস বাড়ছে	বাংলা চার অক্ষর	৮৯
জঙ্গল ক্রমশ কমে আসছে,...	তবু একটা গভীর...	বাংলা চার অক্ষর	১১১
জীবন প্রবাহের এক পাশে...	এক জীবনের মর্ম	যার যা হারিয়ে গেছে	১৭৩
ঝড় উঠবার আগেই...	কুয়াশার মায়াপাশ	বাংলা চার অক্ষর	১০৭
ঝড়ের যেমন একটা...	অলীক দেখা	বাংলা চার অক্ষর	৮২
টাইটান উপগ্রহে কি...	বৈজ্ঞানিকের বাজি	যার যা হারিয়ে গেছে	১৯১
টেবিলটার মাঝখান দিয়ে...	জ্যোৎস্না, রাত...	যার যা হারিয়ে গেছে	১৮১
ট্রামটা যখনই চারমাথা...	মন্দির-কাহিনী	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৩৬
ট্রেনের টিকিট কাটা...	সত্যি থেমে গেছে	যার যা হারিয়ে গেছে	১৫৭
ঠিক যে-রকম চাঁদ আমি...	একার চেয়েও একা	যার যা হারিয়ে গেছে	১৬৩
ডিংডা ডিডাং ডিং ডাং	ঘুমের ছড়া	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩১৬

প্রথম পঙ্‌ক্তি	কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থ	পৃষ্ঠা
তারপর ধর্ম বক বললেন,...	তিনটি প্রশ্ন	যার যা হারিয়ে গেছে	১৩৩
তিন আঙুলের একটা...	এই অনিত্যে এমন...	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	২৩
তিনটে কোকিল সন্ধেবেলা...	তিনটে কোকিল	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩২১
তিনতলার ওই রঙিন...	অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৪৮
তিনদিন শুয়ে আছো,...	জ্বর অতি চমৎকার,...	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	১৮
তুতুর তুয়া তুতুর তুয়া...	ছড়রা	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩২৭
তুমি কি ফুলের পাশে...	অধৈর্য	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৩৯
তুমি যে-ই মাথা নিচু...	একটু দাঁড়াও	বাংলা চার অক্ষর	৮৩
তুম্বুনিতে সেই রাত্রি,...	তুম্বুনিতে সেই রাত্রি	বাংলা চার অক্ষর	১০২
তোমরা কি দেখেছ সেই...	ডাকঘরের অমল	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩২৫
তোমার আমার খিদে...	খাদ্যাখাদ্য	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩১২
দরজার কাছে এসে কে...	দরজার কাছে এসে	বাংলা চার অক্ষর	১০৩
দশটা সতেরো, দরজা বন্ধ,...	এই স্বপ্নের ঘোর	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৩৭
দিনের বেলায় ছিল...	কাকে যে বলি	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৫৭
দুধের বরণ হাতির শুঁড়ে...	পেন্নাম	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩৩১
দুপুরবেলায় পাখা ঘুরলেও...	গ্রীষ্মের জয়	মনে পড়ে সেই দিন	৩৪১
দুর্গা ঠাকুর পুজোর সময়...	সিংহ-কাহিনি	সংযোজন: ছড়া	৩৫৮
দূর যাত্রিণীর হাতে একটি...	দুপুরের বর্ণ	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২১৭
দেখতে দেখতে জানতে...	এক জন্মের অভিমান	বাংলা চার অক্ষর	৭৮
ধড়াম করে দ্রুত দরজাটা...	ভুল বোঝাবুঝি	বাংলা চার অক্ষর	৯৩
ধোঁয়া লাঞ্ছিত শহুরে...	সময় তখন খেলার...	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৫৫
নতুন কী লিখছেন,...	নতুন লেখা	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৪১
নদী যদি হতে চায় দূরের...	খোকার ভাবনা	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩২৩
নদীটি শুকিয়ে গেছে,...	সুন্দরের স্বপ্ন ভাঙে	বাংলা চার অক্ষর	৯৬
নদীতে ঢেউ, শরীরে ঢেউ...	মনোহরণ	যার যা হারিয়ে গেছে	১৪২
নদীর কোন্ পারে তুমি...	নদীর কোন পারে...	যার যা হারিয়ে গেছে	১৬৭
নদীর ঘাট, উনিশ, পাতলা...	উনিশ বড়...	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২২১
নদীর ধারে ভুতুড়ে পোড়ো...	নতুন মানুষদের গল্প	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২১৫
নরকে খুব ভিড় জমেছে,...	নতুন নতুন নরক	যার যা হারিয়ে গেছে	১৬৪
নাম জিজ্ঞেস করলে বলে,...	অন্য ভাষায় কথা বলে	মনে পড়ে সেই দিন	৩৪৪

প্রথম পঙ্‌ক্তি	কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থ	পৃষ্ঠা
নীরা, তুমি আধো অন্ধকার...	দাঁড়িয়ে রয়েছ একা,...	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৫৫
নীরার অভিমান আমাকে...	নীরার কৌতুক	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৪৪
নীরার হাত-চিঠি এল...	বারবার প্রথম দেখা	যার যা হারিয়ে গেছে	১৮৮
পঁয়তিরিশ সেকেন্ডের...	আয়ু	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২২২
পাঁচ মাত্রায় হেসে চলে...	জয়জয়ন্তী	বাংলা চার অক্ষর	৮২
পায়ে চলা পথ, ঝিরিঝিরি...	অর্ধরতি	বাংলা চার অক্ষর	৭৮
পাহাড়ের ঢালে এক পা...	জন্মদিনের ভাবনা	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৫০
পৃথিবী কি জানে তার ডাক...	সময় জানে না	যার যা হারিয়ে গেছে	১৮৪
পৃথিবীর পেট ছিঁড়ে ছিঁড়ে...	অমৃত শিশুরা	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৩৫
পেটে বোমা বেঁধে যে...	জীবন মাত্র একবার	যার যা হারিয়ে গেছে	১৭৭
প্রতিবার দেখা, কিছু...	প্রথম দেখার মতো	বাংলা চার অক্ষর	১১৮
প্রথম বাঁকে একটা...	চতুর্থ বাঁকের পর	শ্যামবাজারের মোড়ের...	১৯৯
প্রৌঢ়টির চোখের পর্দায়...	কাঁচপোকার চোখের...	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	১৫
ফিসফাস শব্দ শুনি।...	টান মারে দোলাচল	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২২৪
ফুটবলে ছিল বাঙালির...	ফুটবল	মনে পড়ে সেই দিন	৩৩৯
ফুলের বাগানে গভীর...	নদীর ধারে নির্জন...	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২১০
বইখানির ওপর মাথা...	সবচেয়ে হালকা অস্ত্র	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৪১
বগুড়া রোড, বাঁকের মুখে...	কবির বাড়ি	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৫৯
বর্ষার ঝাপটে ঘুম ভাঙল...	বর্ষার গান	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	২৫
বহুদিন পর দুই উরুর...	উপমা	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৪৫
বাইরে যখন ফর্সা আকাশ...	অন্য জীবন	বাংলা চার অক্ষর	৮৫
বাচ্চা বয়েসে লিখেছিলাম,...	আগুন দেখেছি শুধু	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৪৯
বাবাও নাকি ছোট্ট ছিলেন	বাবা আর মা	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩১৬
বাবামশাই সিমলা যাবেন	সিমলা যাত্রা	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩০৫
বারবারই সে আঁচল	মফস্‌সলের মেয়ে	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৪৮
বিকেল পাঁচটায় তুমি...	বকুলতলায়	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৩১
বিকেলগুলো হলুদরঙা...	বিকেল	সংযোজন: ছড়া	৩৫৫
বিবাহ বাসরে বিরোচন...	বিরোচনের বিয়ে	যার যা হারিয়ে গেছে	১৪৮
বৃষ্টিধারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে হেঁটে...	বৃষ্টিধারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে	যার যা হারিয়ে গেছে	১৭০
বেশ রাত ছাড়া কবিতা...	রাত্রির কবিতা	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২১২
ব্যাডমিন্টন শিখিয়েছিল...	আমার খেলা	মনে পড়ে সেই দিন	৩৩৮

প্রথম পঙ্‌ক্তি	কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থ	পৃষ্ঠা
ভালোবাসা ছিন্ন করে...	অ-প্রেম	বাংলা চার অক্ষর	১১০
ভালোবাসার নদীতে...	পড়ে থাকবে একটি...	যার যা হারিয়ে গেছে	১৭৭
ভীমসেন যোশীর...	মেঘমল্লার	বাংলা চার অক্ষর	৮৪
ভুরুর মতন নদীর বাঁক,...	পাখির চোখে দেখা ২	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৩৫
ভোরবেলা পার্কের...	পায়রাদের ওড়াউড়ি	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২১৬
মঙ্গলগ্রহে আছে	মঙ্গলগ্রহে	মনে পড়ে সেই দিন	৩৩৯
মণিকর্ণিকার ঘাটে গাঁজা...	মণিকর্ণিকার ঘাটে	যার যা হারিয়ে গেছে	১৫১
মধ্য দিনমানে ঈষৎ কম...	মধ্য দিনমানে	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	১৩
মধ্য পুকুরে ডুব দিয়ে মাটি...	তুচ্ছ ছন্দ মিলে	বাংলা চার অক্ষর	৮৭
মনে করো, এই রাত্তিরে...	এক মুঠো ভবিষ্যৎ	যার যা হারিয়ে গেছে	১৭১
মনে পড়ে সেইদিন...	মনে পড়ে সেইদিন	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩৩৩
মল্লিকা বলেছে,...	কেউ কেউ ক্ষমাপ্রার্থী	যার যা হারিয়ে গেছে	১৪৩
মহাশয়, ঘণ্টিকীর	ঘণ্টায় ঘণ্টায়	যার যা হারিয়ে গেছে	১৯০
মাউজ মানে আর ইঁদুর...	তোমার জয়জয়কার	সংযোজন: ছড়া	৩৫৫
মাঠের মধ্যে নামল বৃষ্টি...	মাঠের মধ্যে	মনে পড়ে সেই দিন	৩৫১
মাদারিহাটের চা-বাগানের...	কুসুমের গল্প	বাংলা চার অক্ষর	১২৪
মানুষ হারিয়ে যায়,...	মানুষ হারিয়ে যায়	বাংলা চার অক্ষর	১১৯
মানুষের শিশু দুধ খায়...	তিনটি প্রশ্ন	মনে পড়ে সেই দিন	৩৪৮
মামা লিখেছেন, নতুন...	মামার বাড়ি যে...	মনে পড়ে সেই দিন	৩৩৭
মুরারই গ্রামে আজ দেখি...	মুরারই গ্রামে আজ	সংযোজন: ছড়া	৩৫৬
মৃত্যু নিয়ে দার্শনিকতাটা,...	মৃত্যু নিয়ে	যার যা হারিয়ে গেছে	১৮৪
মেঘের মুলুকে আজ কি...	বৃষ্টির রূপকথা	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩১৫
যখন মধ্যপ্রাচ্যে একটি...	সাবধান কলম	যার যা হারিয়ে গেছে	১৮২
যদি ভাবতে পারতাম,...	বাঁধানো ছবি	যার যা হারিয়ে গেছে	১৫৫
যাকে ভালোবাসি তার...	খণ্ডকাব্য	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৩৩
যারা কুকুর পোষে তারা...	বাঘের মাসি	মনে পড়ে সেই দিন	৩৪২
যে আমি এককালে...	দেশ কাল মানুষ	বাংলা চার অক্ষর	১৫৮
যে নদীতে সাঁতার...	অলীক জন্মকাহিনী	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৩২
যে-মুহূর্তে তোমার পায়ে...	হাওয়ায় উড়ছে	বাংলা চার অক্ষর	৭৭
যে যেমন জীবন কাটায়	চোখ ঢেকে	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২১১
যে রাস্তাখানি ছুটতে ছুটতে...	ফুলের বদলে	যার যা হারিয়ে গেছে	১৫৩

প্রথম পঙ্‌ক্তি	কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থ	পৃষ্ঠা
যেই এক পলক ফেললাম,…	এক পলক	বাংলা চার অক্ষর	৭৯
রঞ্জন গল্প শোনাচ্ছে…	গল্প	বাংলা চার অক্ষর	১১৫
রাজমোহন্‌স ওয়াইফ…	ভোরবেলার স্বপ্ন	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৫৯
রাজ্জাক হাওলাদার,…	মেঘলা দিন, মিহিন…	শ্যামবাজারের মোড়ের…	২২৬
রামচন্দ্র ছিলেন…	সীতার অগ্নিপরীক্ষা	বাংলা চার অক্ষর	৮০
রুমুনা: আমাদের সোনা…	দুই বোন	মনে পড়ে সেই দিন	৩৪৫
রেললাইনের পাশে একটা…	পাখির চোখে দেখা ৩	শ্যামবাজারের মোড়ের…	২৪২
লঙ্কা গাছে বেগুন ফলে	উল্টোপাল্টা	মনে পড়ে সেই দিন	৩৪০
লাইনের আগে তিনটে…	আমার কৈশোরের মা	যার যা হারিয়ে গেছে	১৫৬
শায়ার ওপর পুরুষ-জামা,…	সাত সকালে নীরা	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	১৪
শীত এলই না, বইতে…	এত প্রশ্ন, এত প্রশ্ন	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৫১
শীর্ণ নদী দেখলেই…	ব্রিজের ওপরে ও…	যার যা হারিয়ে গেছে	১৭৯
শুধু বৈশাখ মাসে	উল্টোপাল্টা	সংযোজন: ছড়া	৩৬২
শূন্যের আড়াল থেকে…	সত্যের যমজ	যার যা হারিয়ে গেছে	১৮০
শেখ সুলতান একটা…	ব্যর্থতার কথা	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৫৮
শেখ সুলেমান একটা চড়…	প্রকৃতির প্রতিশোধ	বাংলা চার অক্ষর	৯৭
সত্যি কথা বলছি তোকে…	মুন্নির বেড়াল	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩১৪
সবাই অনেক কিছু জেনে…	রাশি রাশি শুকনো…	বাংলা চার অক্ষর	১০৪
সভ্যতার সঙ্কটের পাতা…	আগমনী কান্না	বাংলা চার অক্ষর	১০৮
সমস্ত ব্যস্ততা ও হুল্লোড়ের…	তিরতিরে স্রোত	শ্যামবাজারের মোড়ের…	২৪৬
সাত পা এক সঙ্গে…	স্বপ্ন	বাংলা চার অক্ষর	১১২
সারাদিন ছুটি আজ…	‘সারাদিন ছুটি আজ…’	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৩৭
সারি সারি নারকোল…	অকতাভিও…	ভালোবাসা খণ্ডকাব্য	৬৪
সিঁড়িতে কে বসে আছে…	সিঁড়িতে কে বসে…	বাংলা চার অক্ষর	৯৫
সীতানাথ বন্দ্যো’র এক…	সত্যি কি রবি ঘোষ…	সংযোজন: ছড়া	৩৫৮
সুদীর্ঘ সরল একটা…	সুড়ঙ্গের ওপাশে	শ্যামবাজারের মোড়ের…	২১৩
সুপর্ণ বেরিয়ে যায় কাঁটায়…	কে তুমি? কে তুমি?	বাংলা চার অক্ষর	১২১
সুষুপ্তির মধ্যে একটা দরজা…	অরণ্য গভীরে	যার যা হারিয়ে গেছে	১৮৩
সে চলে গিয়েছে…	সে ও আমি	যার যা হারিয়ে গেছে	১৬০

প্রথম পঙ্‌ক্তি	কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থ	পৃষ্ঠা
সেই দিনটিতে ছিল বর্ষার...	শিল্পের বন্দিনী	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২২০
সেই দূরত্বের দুর্গ ভাঙার...	কল্পান্ত	যার যা হারিয়ে গেছে	১৫২
সেই যে একদিন এক...	যার যা হারিয়ে গেছে	যার যা হারিয়ে গেছে	১৩৩
সেপাই এসে যেই দাঁড়াল,	রাজা আর সেপাই	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩০৬
স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে...	স্থির চিত্র	যার যা হারিয়ে গেছে	১৬৮
স্তব্ধতার ভাষা নিয়ে কেউ...	পর্তুগিজ ভূত	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৪৮
স্নান করতে দেরি হয়ে...	বাজের শব্দ	বাংলা চার অক্ষর	১১৬
হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া,...	রেলস্টেশনে নীরা	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২৪৩
হলদিয়া কি সন্দেশ,...	আজব নগর	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩২৯
হলুদ রঙের ডুবো-তরী,...	রিঙ্কু রঞ্জনের বাড়ির...	বাংলা চার অক্ষর	১১৪
হাওয়ায় কীসের যেন সুর...	থমকে দাঁড়াবার...	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২০৭
হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে,...	এক জন্মের সমস্ত...	শ্যামবাজারের মোড়ের...	২২৫
হায়রে শহর, প্রাণের শহর	বাইশে শ্রাবণের আগে	সংযোজন: ছড়া	৩৫৭
হে রাত্রি, পাথর-ভাঙা,...	হে রাত্রি, পাথর-ভাঙা	বাংলা চার অক্ষর	১১৭
হ্যালির কমেট হ্যালির...	হ্যালির কমেট...	আ চৈ আ চৈ চৈ	৩১৩

For More Books

Visit

www.BDeBooks.Com